সাধন-মন্দির।

নদের নিমাই, সতী-প্রতিভা, বামাক্ষেপা, শক্তি-সাধনা, মোহনমালা, উপন্যাস গ্রন্থাবলী, দরাফ খাঁ, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, বর্ণাশ্রম, সংসার-চক্র, সতী-কাহিনী, বন্ধনমুক্তি, পীরের আস্তানা, পঞ্চরত্ন, নষ্টচরিত্র, সতীর চিতা, অভাগিনী, মায়ার-খেলা, প্রভৃতি

গ্রন্থ প্রণেতা—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—

শ্রীনরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মেসার্স বোস দত্ত এণ্ড কোম্পানী,

১৭নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩৩৩

[মূল্য [illegible]]

PRINTED BY
NORENDRA MOHAN GONGOPADHAYA
AT BOSE DUTT & CO.'S PRESS,
17, WESTON STREET, CALCUTTA.

উৎসর্গ পত্র।

বাঁকুড়া-কৃষ্ণনগরের প্রাচীনতম প্রাতঃস্মরণীয় ভট্টাচার্য্য-বংশাবতংশ পরম শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাশয় সমীপেষু—

৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাত্মন্! সবিনয় নিবেদন—

আপনার সরলতা, অমায়িকতা এবং ধর্ম্মের প্রতি একান্ত আন্তরিকতা এ দরিদ্র গ্রন্থকারকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছে। নানা প্রকার বিষয় কর্ম্মের মধ্যে অনবরত লিপ্ত থাকিয়াও আপনি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে যারপরনাই অনুরক্ত; সামান্য মাত্র অবসর পাইলে সেই সকল গ্রন্থ পাঠে আপনার সাতিশয় রতি-মতি দেখিয়া আজ আমার ধর্ম্মমূলক পারিবারিক উপন্যাস "সাধন-মন্দির" আপনার করকমলে সাদরে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। ইহা পাঠে আপনি সামান্য মাত্র তৃপ্তি অনুভব করিলে লেখনী ধারণ সার্থক বিবেচনা করিব। কিমধিকমিতি—

দক্ষিণ ব্যাটরা,
'দুর্গাদাস লাইব্রেরী
১০৫নং পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
১৭-৬-৩১

বশংবদ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ধর্ম্মের সংসারে যদি অধর্ম্মের সূত্রপাত হয়, একান্নবর্ত্তী সংসারে যদি পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারে—ভাই যদি ভাইয়ের প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং সেই ধূমাইত অগ্নিতে যদি গৃহিণীর দুষ্পরামর্শরূপ ইন্ধন সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে সংসার কিরূপে ছারখার হয়—বহুদিনের প্রাতঃস্মরণীয় বংশের কিরূপ দুর্গতি-দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া থাকে—ইহাতে তাহাই দেখান হইয়াছে।

বড়ভাই বড়বধূর মতিভ্রম হেতু রায়েদের বহুদিনের সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল কিন্তু সাধুপ্রকৃতি মধ্যম ভ্রাতা ও তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নীর গুণে কেমন করিয়া আবার সেই সংসার ধীরে ধীরে পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইল, জগতে আপনার সুকীর্ত্তি বিঘোষিত করিতে লাগিল—ইহাতে তাহারই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে।

ছোটভাই শিক্ষিত এবং বিদ্যালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইলেও সে বিদ্যার জ্ঞান-বিভব তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই—তাই শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, বড়দাদা কি মেজোদাদার শরণাপন্ন হই, ভাবিয়া ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়া হীনচরিত্রের অতলে ডুবিতেছিল, দেবচরিত্র মেজোদাদা সেই অকুলে কুল দিয়া, ধর্ম্মের তেজে প্রাণ-পণে টানিয়া তুলিয়া আবার তাহাকে স্বপথে, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া মনুষ্যত্বের কুলে তুলিয়া দিয়াছেন, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে নিখিলেন্দ্রের চরিত্র তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

জগতে ভোগে কোনও সুখ নাই—ত্যাগেই পরম সুখ। নিজের জন্য সঞ্চয় না করিয়া যে পরের জন্য সদ্ব্যয় করিতে পারে—সেই যথার্থ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে। নিজের জন্য যাহা সঞ্চয় করি—বাস্তবিক তাহা আমার নয়, পরের জন্য যাহা সদ্ব্যয় করি, তাহা নিশ্চয়ই আমার—মৃত্যুর পরে তাহা আমার সঙ্গে যাইবে—ইহাই হইল—যথার্থ সঞ্চয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঙ্গে যায়, তদনুসারে ভাগ্য গঠন হয়, অতএব পরার্থে সদ্ব্যয়ই যথার্থ সঞ্চয়, সাধু প্রকৃতি অমর তাহাই বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁহার "সাধন-মন্দির" এবং তাঁহার "অমর ভবন" একদিন দরিদ্র নারায়ণগণের জন্য চির উন্মুক্ত থাকিত। সদাব্রত এবং পরোপকারের পরাকাষ্ঠা, কেবল এই সাধন-মন্দিরেই প্রদর্শিত হইয়াছিল, ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিলে সময় ক্রমে যে মানুষ সকল প্রকার বিপদজাল বিমুক্ত হইয়া আপনাকে মেঘ-নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় প্রতিভাত করিতে পারে ইহাতে আগাগোড়া তাহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণ পাঠে আমার পূর্ব্বাপর পুস্তকগুলির মত ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

দক্ষিণ বাঁটরা,
দুর্গাদাস লাইব্রেরী
৩৫ পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
১৭-৬-৩১

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপহার পৃষ্ঠা।

ধন চেয়ে ধর্ম্ম বড় কি সন্দেহ তার।
(তাই) ধর্ম্মমণ্ডিত এ গ্রন্থ দিনু উপহার॥

আমার

সাধন-মন্দির

প্রথম-খণ্ড।

(১)

হুগলী জেলায় বসন্তপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের রায়বংশ অতি প্রাচীন এবং ধার্ম্মিকের বংশ, ইহাদের প্রতি-পত্তিতেই একদিন বসন্তপুর খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই বংশের মহাপ্রাণ জমিদার বামনদাস রায় খুব ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় রায়-বংশ একান্ন-বর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বামনদাস বহু আত্মীয় স্বজনকে অন্নদান করিতেন। ছোট একখানি জমিদারীর আয়ে তিনি বহুলোকের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, পূর্ব্বেকার বাঙ্গলা লেখাপড়ায় তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি এতদূর প্রখর ছিল

যে, এই সামান্ত বিদ্যাতেই তিনি জমিদারীর কার্য্য এত বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত করিতেন, যাহা এখনকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও সেরূপ ভাবে চালাইতে পারে কিনা সন্দেহ।

তিনি মামলা-মোকদ্দমার ধার দিয়াও যাইতেন না। সমস্ত বিষয়ই আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লইতেন, তাহাতে যদি নিজের কিছু ক্ষতি হইত, তাহাতেও তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন না। আজ কয়েক বৎসর হইল—বামনদাস স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিনীও একবৎসর যাইতে না যাইতেই ইহকালের সুখ-সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছেন। এখন আছেন—কেবল তাঁহাদের তিনটী পুত্র, জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র, মধ্যম অমরেন্দ্র, কনিষ্ঠ নিখিলেন্দ্র। তিন জনেই বিবাহিত, জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকা, মধ্যমা সাবিত্রী ও কনিষ্ঠা সরযূ।

নরেন্দ্রই এখন বাড়ীর কর্ত্তা, বিষয়-সম্পত্তি সকলের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। তিনি বাল্যকালে কিছু ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তখনকার কালে প্রবেশিকা অবধি তাঁহার বিদ্যার দৌড়, কাজেই তিনি একজন মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি, তখন ইংরাজী লেখাপড়া তত কেহ শিখিত না; আচার ভ্রষ্ট হইবে—হিন্দুয়ানী ভাঙ্গিবে বলিয়া কেহ ভয়ে ছেলেকে ইংরাজী পড়িতে দিতনা। বামনদাসও ইহাতে নারাজ ছিলেন, তবে দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে দেখিয়া শুনিয়া তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন্দ্রকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলেন। তাই নরেন্দ্র উত্তর কালে বাস্তবিকই একটু সাহেবী ধরণের হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার ন্যায় তাঁহার

প্রকৃতি অমায়িক ভাবে গঠিত হয় নাই, যেন কেমন-কেমন, অল্প বিদ্যা হইলে যাহা হয়, নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। একে অর্থবানের পুত্র, তাহাতে বিদেশীয় বিদ্যা, তাঁহাকে নূতন ভাবে গঠিত করিয়াছিল। পিতা যেমন সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন, আত্মীয় স্বজনকে অন্ন দিতেন, অভাব-অভিযোগে সাহায্য করিতেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়া দুস্থ, অভাবগ্রস্ত আত্মীয়গণের পরিপোষণ করিতেন, নরেন্দ্র তাহার দিক দিয়াও যান না বরং তাহাদের সহিত অহঙ্কারের কথা কন।

আমি সকল বিষয়ে বড়। বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-মানে আমার তুল্য আর কেহ নাই, এ অহংভাব যাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহার আর ভদ্রতা কোথায়? বামনদাস যাহাকে ভয় করিতেন, যাহা করিতে তিনি একান্ত নারাজ ছিলেন, নরেন্দ্র আজ সেই মামলা-মোকদ্দমাকেই জীবনের একটা প্রধান করণীয় কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন, ইহা না হইলে কি বড় লোক বলিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারা যায়? প্রবল বিপক্ষ হুগলীর জমিদারগণের সহিত কোনও প্রকার ত্রুটী হইলে, বামনদাস আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লইতেন, তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবে কাল যাপন করিতেন, নরেন্দ্র কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাহা করিলেন না, তাঁহাদের সহিত সমান ভাবে মামলা-মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র পিতার মত নিরহঙ্কারী এবং সংস্কৃত বিদ্যায় শিক্ষিত। শাস্ত্রাদি পাঠে এবং পূজাজপে কাল কাটাইয়া থাকেন। স্থানে স্থানে পিতার কয়েক ঘর শিষ্য ছিল, তাঁহাদের শিক্ষা

ও দীক্ষা দান করিতেন, পরোপকার এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল। অমরেন্দ্র বড় ভাইকে মান্য করিতেন, তাঁহার কথার বা কার্য্যের কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতেন না। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা," বিশেষতঃ নরেন্দ্র ইংরাজী শিক্ষিত, বিবেচক ও বুদ্ধিমান—তিনি কখনও অন্যায় করিবেন না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নিখিলেন্দ্র বালক-নরেন্দ্র তাহাকে ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য করিবার জন্য কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইতেছেন। যুবক জেলা স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর নরেন্দ্র তাহাকে কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সে আলালের ঘরের দুলালের মত কলিকাতার হোষ্টেলে থাকে আর কলেজে পড়ে, সংসারের কোন ধারই ধারে না। যা করেন—বড়দাদা আর মেজো দাদা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, একটী দরিদ্র বিধবার কন্যার সহিত তাঁহারও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তখন বৃদ্ধাজননী বর্ত্তমান ছিলেন, ছোট ছেলের বউ দেখিয়া মরিতে তাঁহার বড় সাধ বলিয়া, ঐ বিধবার একমাত্র সুন্দরী কন্যা সরযুর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, তাহাকে দায় মুক্ত করিয়াছিলেন।

নিখিলেন্দ্র বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে। সে গত বৎসর এফ, এ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে এবং বি, এ পড়িতেছে। পড়ো ছেলের সংসারের দায়ীত্ব নাই, দাদারা যাহা করেন, নিখিল তাহার কোনও খোঁজ খবর লয় , সেও মেজদাদার মত সরল প্রাণ। মেজ বউ সাবিত্রী ও

ছোট বউ সরযূ দুই জনে একপ্রাণ কিন্তু বড় বউ অম্বিকা, বড় লোকের মেয়ে—বলিয়া বড় দাম্ভিকা, ছোট দুই যায়ের সহিত অসদ্ভাব না থাকিলেও বড়োর মত চালে থাকিতেন, তাহাদের সহিত বড় একটা মিশিতেন না, তা সে বড় ঘরের মেয়ে বলে অহঙ্কারেই হউক, অথবা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্যই হউক, তাহা কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না।

মতিভ্রম দুর্মতীর সহচর। নরেন্দ্র সামান্য একটু ক্ষুদ্র জমিদারীর মালিক হইয়া, প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত ক্ষুদ্র একটা বাঁধের ব্যবধান লইয়া আজ দুইবৎসর মামলা করিয়া হারিয়া গিয়াছেন। এই বাঁধটী ছাড়িয়া দিলেও কোন গোল থাকিত না। কিন্তু প্রতিযোগীতার বশবর্ত্তী হইয়া এবং লজ্জার খাতিরে তিনি কিছুতেই নীচু হইলেন না। হাইকোর্টে মোকদ্দমা তুলিলেন, এইবার হার হইলে যে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, অথচ একটা প্রবল শত্রু পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া, চিরকাল তাঁহাকে জ্বালাইবে, নরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া দুইবৎসর অজস্র অর্থব্যয়ে শেষে দুরদৃষ্টের তাড়নায় হারিয়া গেলেন। মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায়, যাবতীয় খরচার দাবী তাহার উপর পড়িল। বিদ্যাভিমানী নরেন্দ্র নাম এবং অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কি করিতে কি করিয়াছেন, এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। খরচার দায়ে তাঁহার ক্ষুদ্র জমিদারী টুকু নিলাম হইয়া গেল।

মানুষের দশদশা, দাদাকে অতিশয় চিন্তান্বিত দেখিয়া অমর বলিলেন—ভাই! যা হইবার হইয়াছে, তাহার জন্য অনবরত চিন্তা করিয়া শরীর মাটী করিলে কি হইবে? দেহ সুস্থ থাকিলে, অর্থ আবার হইবে, আপনিত আর অশিক্ষিত নহেন, চেষ্টা করুন? নিখিলেন্দ্রও দাদাকে সেইরূপ বুঝাইল, কিন্তু শুধু বুঝাইলে কি হয়, সংসার যে একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারীর আয় আর নাই, এখন কেবল বাস্তবাটী খানি সম্বল, যদিও তাহা অনেক টাকার সম্পত্তি কিন্তু পেটের দায়ে তাহা বিক্রয় করিলে ত গাছতলা সার হইবে? নরেন্দ্র পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন, কলিকাতায় আসিয়া উপায়-উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র নিজেই আপনাকে বড় মনে করেন, কিন্তু পরের নিকট চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যা তাঁহার কোথায়? আর সামান্য চাকুরী হইলেও চিরকাল স্বাধীন ভাবে কাটাইয়া এখন পরাধীন ভাবে কেমন করিয়া প্রভুর মুখনাড়া সহ্য করিবেন? নরেন্দ্র তাহা প্রাণ থাকিতে পারিবেন না, আর তাহাতে যে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, সে আয়ে তাঁহার সংসারও চলিবে না, কাজেই নরেন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি তেজারতী খুলিলেন। দুস্থ কৃষকগণকে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করিলেন। এ কার্য্য তাঁহার স্বভাবের অনুরূপ, কারণ লোকের উপর প্রভুত্ব করা, টাকা আদায়ের সময় মামলা-মোকদ্দমা করা, ইহাতে বেশ

চলিবে। দুই চারি মাস পরে বাস্তবিকই নরেন্দ্রের কার্য্যে বেশ দুইপয়সা উপায়-উপার্জ্জন হইতে লাগিল। তবে তাঁহার হৃদয়ে এতদিন যেটুকু ধর্ম্মভাব ছিল, এই কার্য্য করিয়া অবধি সেটুকু লোপ পাইল। নরেন্দ্র ত নৃসংশ ছিলেনই, এখন তদপেক্ষা আরও অধিক হইলেন, অম্বিকার পরামর্শ তাঁহার হৃদয় হইতে কোমলতার পবিত্র ভাবটুকু ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার স্থানে কঠোরতার বিষবারি ঢালিয়া দিল। সেই বিষ তাঁহার খাতকদের দেহ জর জর করিতে লাগিল, পরে এই বিষময় পরামর্শের বিষক্রিয়া আরও যে কি করিবে, তাহা বলা যায় না। স্ত্রৈণ নরেন্দ্র ভার্য্যার কথামত চিরকালই মরিতেন-বাঁচিতেন, এখন তিনি তাহার কথা বেদবাক্য করিয়া মানিয়া লইলেন। নরেন্দ্র কলেজের খরচের দরুণ নিখিলকে যে টাকা পাঠাইতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। অমর দেখিলেন,—ছোঁড়া না এদিক, না ওদিক হইয়া কাজের বার হইয়া পড়ে, অন্ততঃ তাহাকে বি, এ পাশ করাইয়া আইন পড়াইতে পারিলেও কিছু কাজ হয়। তখন আইন ব্যবসাটা এখনকার মত ছ্যা ছ্যা হয় নাই, অথবা আইন পাশ করিলে অমর বড় বড় শিষ্যের দ্বারা ভ্রাতাকে একটা হাকিমীও দেওয়াইতে পারিবেন।

তিনি নিখিলের মনক্ষুণ্ণ করিলেন না। ভবিষ্যতের আশার প্রতি তাকাইয়া অমরেন্দ্র দাদাকে না বলিয়া কনিষ্ঠের উন্নতির জন্য নিজের স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার অকাতরে বিক্রয় করিলেন। কনিষ্ঠকে অভাব-অভিযোগের বিষয় কিছুই জানিতে দিলেন না,

পাছে সে নিরুৎসাহ হইয়া পড়া ছাড়িয়া দেয়, এই জন্য তাহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, চাহিবামাত্র অমরেন্দ্র ঠিক পূর্ব্বের মতই পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ছোটবউ সরযুর একখানি গহনায়ও হাত দেন নাই, ছোটবউটী একটু সাজিয়া গুজিয়া থাকিলে তাঁহাদেরইত দেখিতে ভাল ?

এদিকে সংসারে কষ্টের একশেষ হইয়াছে, নরেন্দ্র আর তত কিছু দেখিতে পারেন না। লোকে বলে—তিনি এখন বেশ উপায় করিতেছেন, পূর্ব্বের কিছু সঞ্চিত স্ত্রীধনও তাঁহার ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র যেরূপ ভাবে সংসার চালাইতেছেন, তাহা যেন দীনভিখারীরও বেহদ্দ, তেল থাকিতে নুন নাই, নুন থাকিতে তেল নাই। ইহাতে মেজবউ বা ছোটবউ একদিনের জন্য কোন প্রকার দুঃখ বোধ করেন নাই, হাসি মুখে সমস্তই সহ্য করিতেছেন, অমরেন্দ্রেরত কথাই নাই, তিনি শাস্ত্রপাঠী ধার্ম্মিক, তিনিত জানেনই অদৃষ্ট চক্রের মত পরিবর্ত্তনশীল। কাজেই তিনি সুখেও যেমন ছিলেন, এখন দুঃখের আতিশয্যেও তাঁহার প্রকৃতির কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই।

সাবিত্রী ও সরযু অহোরাত্র খাটিয়া সংসারের সংকুলান করিতে চেষ্টা করেন, আর অম্বিকা এততেও তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্টা, সদাই খিটু খিটু করেন। সাবিত্রী ও সরযু তাহাকেও গ্রাহ্য করেন না; স্বামী যখন তাঁহাদের ভক্তি করেন, ভালমন্দ, কিছুরই প্রতিবাদ করেন না, তখন তাঁহারা কি অভক্তি, অমান্য করিতে পারেন ? বড় যে, সে সকল বিষয়েই বড়; দুই চারিটী

কথা বলিবেন, ভাল না হইলে শিখাইয়া দিবেন, ইহাতে রাগ কিসের? স্বামীর নিকট তাঁহারা এই ভাবেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কাজেই সাবিত্রী ও সরযূ অম্বিকাকে মায়ের মত মান্য করিতেন, তাই তাঁহার বাক্যবাণ অসহ্য হইলেও সহ্য করিতেন—স্বামীর নিকট কোনও কথা তুলিতেন না।

তবে সহ্যগুণেরও একটা সীমা আছে। ভেক অতি নিরীহ জন্তু, অনেক খোঁচাখুঁচী সহ্য করিতে পারে কিন্তু সীমা অতিক্রম করিলে, খোঁচাখুঁচী একান্ত অসহ্য হইলে, সেও যখন সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রহারকের গায়ে লাফাইয়া পড়ে, তখন মানুষ যে পড়িবে, অসহ্য হইলে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে—ইহার আর বিচিত্র কি?

(২)

একদিন নিদাঘ মধ্যাহ্নে বসন্তপুরের রায়েদের কালিন্দী-পুকুরের কালো জল আলো করিয়া দুইটী পদ্মফুল ফুটিয়াছে, বাঁধাঘাটে দুইটী যুবতী বাসন মাজিতেছে। একটীর বয়স প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর, যৌবনতেজে পরিপূর্ণা, ভাদ্রের ভরা নদীর মত কুলে কুলে পূর্ণ হইলেও তাহাতে তরঙ্গ-চাঞ্চল্য নাই, ধীর—স্থির—গম্ভীর। আর একটী কুড়িরও কম, ফুটিবার পূর্ব্বে কোরক যেমন সতেজে আপনার ভবিষ্যৎ প্রকাশ করে, যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, এটীও ঠিক সেইরূপ। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা বলিয়া নয়, দুইটীই রূপসী, ভদ্রগৃহের মত নিখুঁত সুন্দরী, এবং স্বাস্থ্য বেশ ভাল, সহরের মত জরাজীর্ণ—অসার বিলাসিতাপূর্ণ নহে।

বাসন মাজা শেষ করিয়া দুইজনে জলে নামিয়া গাত্রধৌত করিতে করিতে বড়টী ছোটটীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—দেখ্ ছোট্‌কী, আরত ভাই সহ্য হয় না, সংসারের এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, তার উপর বড়গিন্নীর বাক্যজ্বালা আর সহিতে পারিনা। স্বামী নিমুরুদে বলে কি এতই ফেল্‌না হয়েছি, এইজন্যে মনে করেছি, কিছু দিনের জন্য একবার বাপের বাড়ী যাব, এর একটা বিলিব্যবস্থা না হলে আর আস্‌ছিনা।

ছোটবৌ।—মেজ্‌দি! তবে আমার কি হবে, আমি কেমন করে বড়দির কাছে থাক্‌বো? তুমি আছ, তাই পর্ব্বতের আড়ালে আছি, যত ঝড়-ঝাপ্‌টা সব তোমার উপর দিয়েই যায়, তুমি চলে গেলে আমার উপায়, আমার কে আছে দিদি? বলিয়া ছল্ ছল্ চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

মেজোবৌ।—"সাট্ সাট্ ওকি কথালো ছোট্‌কী! যার বাড়া মেয়েমানুষের আর কিছুই নেই—সেই স্বামী রয়েছে? আমি ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে এনে তোর বিলিব্যবস্থা করে তবে যাব, তোর ভয় কি? সে ত আর তোর মেজ ভাসুরের মত নিমুরুদে নয়? সে কিছু করে না, তবুও ২৫৲ টাকা জলপানি পায়, তোর মেজ ভাসুর বলে—আর দুইতিন বৎসর পরে নিখিল মানুষ হয়ে উঠলে আর ভাবনা কি, তুই কাঁদিস্‌নে বোন্ কাঁদিস্‌নে," ? এই বলিয়া সে সিক্ত বস্ত্রে তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিল।

কালিন্দী পুকুরের বাঁধাঘাটে সাবিত্রী ও সরযূ বাসন মাজিতেছে।
অম্বিকা সন্দেহ করিয়া অন্তরাল হইতে বলিল—হ্যাঁলা মেজগিন্নী, দুধের

পাঠককে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই দুইটী যুবতী রায়েদের মেজো ও ছোট বউ, বড়গিন্নীর দ্বারা বিষম ভাবে নির্জ্জিতা সাবিত্রী ও সরযূ।

ছোটবউ।—"মেজদি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেওনা, তা' হ'লে আমি একদণ্ডও এখানে টেক্‌তে পারবো না।"

মেজোবৌ।—আচ্ছা তাই হবে, তুই আর কাঁদিস্‌নি, এখনি "রায়বাঘিনী" দেখলে রক্ষে রাখ্‌বে না, এখন চল, বাড়ীতে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে, ঠাকুরপোকে একখানা চিঠি লিখ্‌বি। আমি যে রকম বল্‌বো, সেই রকম লিখ্‌লে সে আর না এসে থাক্‌তে পারবে না।

ছোটবৌ।—"না দিদি, আমি কিছু লিখ্‌তে পারবো না, তুমি বরং আসিবার জন্য পত্র লিখো।"

মেজোবউ।—দুর ছুঁড়ী, আমি লিখ্‌লে সে তত গ্রাহ্য কর্ব্বেনা—আস্‌বেও না বরং তুই আরও লিখেদে যে, মেজদি এখানে নাই, বাপের বাড়ী চলে গেছে, আমায় দেখ্‌বার কেউ নাই, বড়দি দিনান্তে একটীবারও আমার খোঁজ নেয় না।

সাবিত্রী ও সরযূ নিজেদের সুখ দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাপড় কাচিয়া উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় ঘাটের অপর পার্শ্বের অন্তরাল হইতে কে বলিল—বলি হ্যালা মেজ গিন্নী, দুধের বাছাকে কি মন্তর দিচ্ছিস্‌! ভাতার ত ঘরের খেয়ে পরের খাটুতে যাচ্ছে; ঘুরে ফিরে কার মড়া বেরোয় না, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, কার ছেলের দুধ নেই, তার জন্য ভিক্ষে

করা, কার বাড়ীর কর্ত্তার পেলাউঠা হয়েছে, তাকে বাক্স থেকে ওষুধ দিচ্ছে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া-পরা চল্‌ছে, তাই নবাবী কত, নিজে ত মুকুন্দের চোদ্দপো, এক পয়সা উপায়ের নাম নেই, কালে ভদ্রে যদি শিষ্যেরা কিছু দেয়—তবেই ; কেবল বড় ভেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দল বেঁধে বেড়াচ্ছেন, আর তুই এদিকে থালা মাজ্‌বার নাম করে, ঘাটে এসে, ঐ দুধের বাছাটার কাণে কি গুজ গুজ, ফুস্ ফুস্ করে মন ভাঙ্গাচ্ছিস্? আজ ক্ষিরীকে বাসন মাজ্‌তে না দিয়ে, ঘাটে এসে বুঝি এই হচ্ছে? এই বলিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বলিলেন—দেওরকে কি চিঠি লেখা হবেলো হতভাগী?

মেজো বউ সাবিত্রী কখনও উচ্চ কথা কহিতে জানেন না, মন্দ উপদেশ দিয়ে কাহার মন গরম করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, তবে সত্যকে গোপন করিতে তিনি পারেন না, তাই যাহা পরাপর কথা, ছোট যাকে তাই উপদেশ দিতেছিলেন। এক্ষণে কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—বড়দি! তুমি অন্যায় ঝগড়া করছো কেন, আমি ছোট বউকে কোন মন্দ কথা শেখাই নাই—বরং ওকে জিজ্ঞেস কর? বড় বউ অম্বিকা ক্ষীরোদা ঝিয়ের মুখে ইহাদের ঘাটে আসার কথা শুনিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে আড়ি পাতিয়া ছিলেন। ক্ষীরোদা বড় বউয়ের পিয়ারের দাসী ; মেজো ও ছোটকে সে দেখিতে পারে না ; কারণ তাহাদেরত এখন পয়সা নাই ; এইজন্য বড় বউয়ের কাছে প্রিয় হইবার জন্য ক্ষীরোদা কোনও একটী ছোট কথা মস্তটী করিয়া লাগাইয়া দিত। তাই আজ অম্বিকা

এতদূর আসিয়াছেন, নতুবা তিনি এই দারুণ রৌদ্রে দ্বিতলের সুখময় প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া কালিন্দীর বাঁধা ঘাটে আসতেন না। অম্বিকা বলিলেন—আমি ত আর কচি খুকী নই—যে বুঝতে পারবো না, ওকে যেরূপ ভজন-সজন দেওয়া হচ্ছে, তা আমি সব শুনেছি। স্বকর্ণে শুনে, পরের মুখে ঝাল্ খাবো কেন ?

মেজ বউ তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সাবিত্রী চিরকাল সহ্য করিয়া আসিতেছে ; বড় যাকে কখনও কোন কথা বলে নাই—আজও না ; তবে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিলেন—ইহাতে যদি এত গালাগালি শুনিতে হইবে, তবে আর সহ্য হয় কই ? শুধু তাহাকে গালা-গালি দিলেও সাবিত্রী কোন কথা বলিতেন না, দুই ঠোঁট আলাদা করিতেন না—কিন্তু এ যে তার মাথার মণি পূজনীয় স্বামীর অপমান সূচক গালাগালি, তার স্বামী পরম ধার্ম্মিক, সংসারের সাতেও নাই, পাচেও নাই। এই যে এত বড় জমিদারীটা ভাসুর নষ্ট করিলেন—তার জন্য তিনি একদিন একটা কথাও মুখে আনেন নাই ; এ হেন অমায়িক লোককে গালাগালি, মেয়ে মানুষ হয়ে, পুরুষের মত ব্যবহার, তাই সাবিত্রী আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—“না বলেও যদি বলে থাকি, তা বেশ করেছি, তুমি যা কর্ত্তে পারো করো।” তখন ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে বড় বউ অম্বিকা বলিলেন—এত তেজ, আচ্ছা, ছোট্কীকে তোর সঙ্গ ছাড়াবো, তবে আমার কাজ, নইলে ও ছুঁড়ীটারও মাথা খাবে

দেখছি ; ছোট্ ঠাকুরপোকে আমি শীগ্‌গির এনে, এর একটা হেস্তনেস্ত কর্ব্বোই কর্ব্বো। তারপর সাপের মত গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে তিনি অন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সাবিত্রী ছোট বউকে বলিল—দেখ্‌লিলো ছুটকী, তোর বড় দিদির রাগের বহরটা একবার ? বলুক না মেজদি, আমরা কোন দোষে না থাক্‌লেই হলো, ধর্ম্মের কাছে খাঁটী থাক্‌লে কেউ কিছু কর্ত্তে পারবে না। এই বলিয়া তাঁহারাও দুই জনে কাপড় কাচিয়া লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

(৩)

আজ শনিবার, জনকোলাহল পূর্ণ কলিকাতা সহর চিরদিনই লোকজনাকীর্ণ। বিশেষতঃ শনিবার দিন সন্ধ্যার পর ইহা আরও একটু বিশেষ ভাবে সরগরম হইয়া উঠে, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিবার জন্য এইদিন লোকে নিরত হইয়া পড়ে, কলেজ-হোষ্টেলে বা মেসে এইদিন আমোদ প্রমোদ পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে, সহরের অলি গলিতেও এইদিন যুবকগণের চলা ফেরা খুববেশী মাত্রায় দেখা যায়। রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন কলের ট্রাম হয় নাই, তাই ঘোড়াযুক্ত গাড়ীর চালক ফুরফুরে বাঁশী বাজাইয়া পথিকদিগকে সতর্ক করিতেছে। এদিন এতরাত্রে অফিস গাড়ী কদাচিৎ দুইএকখানি দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশই বাবুদের বুকে বহন করিয়া এতক্ষণ আস্তাবলে ধৌত হইতেছে, অশ্বগণ টহল দিতেছে। ফিটনে করিয়া স্বাধীনতার

অবতার সাহেব বিবি, যুগলে যুগলে পূর্ণানন্দে হাস্য কৌতুকে রাজপথ মুখরিত করিতে করিতে বায়ুসেবনের পর গড়ের মাঠ, ইডেন বাগান হইতে বাড়ী ফিরিতেছে।

তখনও কলুটোলার দ্বিতলস্থ মেসে বসিয়া একটী যুবক করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে একটী সতীর্থ হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে মোলায়েম চপেটাঘাত করতঃ বলিল—কিহে নিখিল, তোমাকে যে আমরা হোষ্টেল থেকে মেসে আনিয়া দিলাম—এই কর্ত্তে কি? সেখানে খরচ বেশী বলে, এখানে এসেও কয়দিন বেশ ছিলে, আজ আবার এত চিন্তা কিসের! তুমি যেরূপ চিন্তাশীল হচ্ছো, তাতে দেখছি তুমি সার আইজাক্ নিউটনের পদটাই বা নাও। তা যাইহোক, এখন আজকের মত চিন্তা ছাড়, দুটো খাওয়া দাওয়া করে এস, ষ্টারে "হারা-নিধি" শুনে আসি, বেলবাবু আর মিস্ বিনোদিনীর প্লে, বাস্তবিক দেখবার জিনিষ, নাও উঠ উঠ, এই বলিয়া আগন্তুক তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। ঈষৎ বিরক্ত হইয়া নিখিল বলিল—আরে যাও নবীন, আমায় বিরক্ত করোনা, আজ আমার শরীর ভাল নয়—আমি যাবনা, তোমরা যাও।

নবীন বলিল—বারে বা! তাও কি হয়, আমরা সকলে একত্র যাব, সব ঠিক হয়ে আছে, আর এখন তুমি বল্‌ছো যাবনা, বিশেষ প্রমথবাবু আজ আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এতে তোমার আপত্তি করা ভাল দেখায় কি?

নিখিল। ভাই, আজ তোমরা যাও, আমার শরীরটা ত খারাপ আছেই, মনটাও ভাল নেই, আজকের মত তোমরা যাও, আমাকে অনুরোধ করোনা।

অগত্যা নবীন ফিরিয়া গিয়া সঙ্গীগণকে নিখিলের কথা শুনাইল, নিখিল কলেজের একজন ভাল ছেলে, সে যাইবে না শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—কেন, কেন, কি হয়েছে তার?

নবীন বলিল—আমি অনেক অনুরোধ করলাম, সে বলিল—আমার শরীর ভাল নয়, মনও অত্যন্ত খারাপ, আজ আমি রাত্রি জাগরণ করিব না।

তখন আটদশ জন ছাত্র সহ মেসের অধ্যক্ষ প্রমথবাবু নিখিলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—কি হয়েছে হে নিখিল, তুমি যাবেনা কেন?

নিখিল প্রমথবাবুকে বিনয় সহকারে বলিলেন—মশায়! আজ আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে, মনও ভাল নয়, তারপর বাড়ীর কোন সংবাদ না পেয়ে, মনটা অত্যন্ত খারাপ, সেইজন্য আজ মাপ করুন, অন্যদিন যাওয়া যাবে। নিখিলের চিন্তা-ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া আর তাহাকে অনুরোধ না করিয়া সকলে চলিয়া গেল।

প্রকৃতই আজ নিখিলের প্রাণমন চিন্তাসাগরে ভাসিতেছে। মেজদাদার পত্রে তাঁহাদের পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া এবং বড়দাদা আর টাকা দিতে পারিবেন না, মেজদাদা অতিকষ্টে

কিছু কিছু খরচ দিবেন জানিয়া তিনি বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। আর পড়া উচিত কিনা, সংসারে যখন এত অনাটন, তখন কেমন করিয়াই বা পড়া হইবে, আর মেজো-দাদাই বা তাহার খরচ যোগাইতে টাকা কোথায় পাইবেন? যদিও তিনি সাহস দিয়াছেন, পড়া ছাড়িতে বারণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি টাকা কোথায় পাইবেন? তিনি ত উপায়-উপার্জ্জন করেন না, মেজোবউদির গায়ের গহনা কয়খানি ত তাঁহার সম্বল। হায়! ভ্রাতৃস্নেহে, ছোট ভায়ের উন্নতি কল্পে, তিনি সেগুলিও অকাতরে খরচ করিতে রাজি হইয়াছেন। মরি মরি, ইহাই না ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা, নিঃস্বার্থ ভালবাসার ইহাই না প্রধান নিদর্শন!

বড়দাদা কিছু দিবেন না, তবে তাঁহাকে ত সংসার চালাইতে হইবে, সমস্ত বিষয় নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে বড়দাদার দোষ কি? মানুষত অদৃষ্টের দাস, যখন যাহা হইবার তাহা হইবেই, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। বড়দাদা আমাদের ভালোর জন্য মকদ্দমা করিয়াছেন, নতুবা হাল্‌দাররা সমস্তই কাড়িয়া লইত। এই মকদ্দমা হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তাহাতে দাদার দোষ কি? অমরেন্দ্র ও নিখিলেন্দ্র বড় ভাইকে দেবতার মত মান্য করেন, তাই তাঁহারা দেবচরিত্রে কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না, অমরেন্দ্রত শাস্ত্রপাঠী ধার্ম্মিক, এ পাপ চিন্তাত তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইতেই পারে না, নিখিলেরও এমন মতিভ্রম হয় নাই, ইংরাজী শিক্ষায় তাঁহার মস্তিষ্ক ও মনের বিকৃতি হয় নাই। ধার্ম্মিক পিতা-

মাতার রক্ত-প্রবাহ এখনও তাঁহার শরীরের ভিতর সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে, কাজেই সরল বিশ্বাসে তাঁহারা বড়দাদার গুণ ভিন্ন দোষ দেখিতে পাইলেন না, অদৃষ্টবাদী হিন্দুসন্তান আর অন্য কিছু না ভাবিয়া কেবল অদৃষ্টের বিড়ম্বনাই মনে করিলেন। দেবচরিত্র কলুষিত হইতে পারে—ইহা মনের কোণে স্থান দিতেও তাঁহাদের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। নিখিল সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়া বহুক্ষণ বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। তারপর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবী তখন তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। মর জগতের অনন্ত সুখ-দুঃখ ভুলিয়া তিনি এক স্বপ্ন রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, স্বপ্ন সুন্দরী তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া মৃদু পবন সন্তাড়িত এক শৈল শিখরস্থ কুসুম কাননে লইয়া গেলেন। নিখিল সেই অমর নিসেবিত নন্দনে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। উদ্যান জন-মানব-বিহীন হইলেও দূর-শ্রুত রমণী-কণ্ঠের মোহন সঙ্গীতে তাঁহার কর্ণকুহর পবিত্র হইতে লাগিল। এমন মনোহর স্বর-লহরী তিনি পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই। —অহো, একি অপ্সরা-কণ্ঠ বিনিস্থত! নিখিল গায়িকার স্বরূপ দেখিবার জন্য আবেগ-উৎকণ্ঠায় স্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার দৃষ্টি এক বকুল বৃক্ষতলে নিবদ্ধ হইল। নিখিল দেখিলেন—অদূরে একটী অনুপমা সুন্দরী,

গীত গাহিতে গাহিতে মালা গাঁথিতেছে। তিনি আরও অগ্রসর হইলেন—নির্জ্জনে সুন্দরী-সম্মিলনের আগ্রহ কোন্ যুবকের না হইয়া থাকে? বিশেষতঃ সঙ্গীত স্বরলহরী যে সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে, নিখিল আরও দুই এক পা অগ্রসর হইয়াছেন—এমন সময় এক ভীমকায় পুরুষ পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। তিনি ভয়ে থত মত খাইতেছিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিতেছিল কিন্তু ভীমকায় পুরুষ বলিলেন—যুবক! ভয় নাই—এস, অদূরে আমাদের কুটীর, ওটী আমার কন্যা, এখনও অবিবাহিতা। এখন উহার নিকট তোমাকে যাইতে দিব না—যদি তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও, তাহা হইলে ঐ কামকান্তার সহিত তোমার বিবাহ দিব। সঙ্গীত-স্বর-মুগ্ধ-চিত্ত নিখিল সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—কি করিতে হইবে? ভীমকায় পুরুষ বলিল—দেখ, চিত্ত দৃঢ় কর, নতুবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—অন্ধকারময় কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইবে। নিখিল তখন সেই সুন্দরীর রূপে আত্মহারা, তিনি বলিলেন—কি করিতে হইবে বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

ভীমকায় পুরুষ বলিল—আমি পাপ; আমার একার দ্বারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব, তাই ঐ কামকান্তার সাহায্যে তোমার মত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। যে আমার কথামত কার্য্য করিতে পারে, তাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিই—নতুবা সারা জীবন অন্ধকারময় কূপে ফেলিয়া কষ্ট দিয়া থাকি। এখন ঘোর কলি উপস্থিত, তাই আমার ঐ সুন্দরী

কন্যার লোভ দেখাইয়া—উহার গানে মুগ্ধ করিয়া, তোমার মত কত যুবককে সহচর করিয়া চারিদিকে আমার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছি। বৃদ্ধেরা সহজে মজে না—তাই তাহাদের বংশধর-গণের সাহায্য-জন্য ঐ কুমারীর মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছি।

পথিপার্শ্বে সর্প দেখিলে পথিক যেমন শিহরিয়া উঠে, নিখিল তদ্রূপ শিহরিয়া ভীত-চকিত-নেত্রে পিছাইয়া পড়িলেন—পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া পড়িল—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল! পাপের প্রথম দংশন অসহ্য বোধে তিনি চারি-দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিখিল ভয়-ভাবনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলেন—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই, যখন চৈতন্য হইল, দেখিলেন—একজন তপ-প্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতেছেন—পিপাসার বারি প্রদান করিতেছেন। সেবা শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিখিল উঠিয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ চরণে প্রণাম করত বলিলেন—আমার জীবন দাতা, আপনি কে প্রভু!

ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া অতি স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—বৎস! আমি তোমার পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম, পাপের হাতে পড়িয়াছিলে—তাই তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম—এক্ষণে উঠ, আমার সাহায্যে নিজ স্থানে যাইতে পারিবে—চল, তোমার পথ

দেখাইয়া দিই, কিন্তু সাবধান—বিবেক বুদ্ধি পরিচালিত না হইয়া জগতে একপদও অগ্রসর হইও না, মোহবশে কোনও কাজ করিও না। নিখিলের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, স্বপ্ন-ঘোর কাটিয়া গেল—তিনি এই স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সুশীতল বায়ু স্পর্শে সুষুপ্তি-ক্রোড়ে গাঢ়তর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন নিশার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে—খোলা জানালা দিয়া উত্তরের বাতাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এটা ওটা নাড়িয়া, বইয়ের পাতা গুলি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া খেলা করিতেছে। মেসের ঝি, চাকর উঠিয়া কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ বালার্ক কিরণ উঁকী ঝুঁকী মারিয়া নিখিলের মুখে-বুকে পড়িয়া তাঁহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল—কিন্তু তিনি এই সবে মাত্র নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে শায়িত—সে সুখ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। অপরাপর সকলে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছেন—এমন সময় একজন টেলিগ্রাফ পিয়ন নিখিলের ১৮নং গৃহে আসিয়া ডাকিল—বাবু টেলিগ্রাফ আছে। কিন্তু নিখিলের সাড়া নাই—বহু ডাকাডাকির পর তিনি উঠিয়া গৃহের অর্গল মোচন করিলেন এবং চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে টেলিগ্রাফ খানি খুলিয়া পড়িলেন—"Elder brother seriously ill, come sharp, Baraboudi," বড় বউদি লিখিয়াছেন—বড় ভ্রাতা ভয়ানক রূপে পীড়িত, সত্বর গৃহে আইস।

পাঠ শেষ করিয়া তিনি মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিলেন—পিয়ন তখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া

নিখিল তাহাকে কয়েক গণ্ডা পয়সা বক্‌সিস্ দিলে—সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

নিখিল ঘোর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। হঠাৎ বড়দার এমন কি পীড়া হইল? সেদিন ত মেজো দাদার চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে ত দাদার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল—লিখিয়াছেন, তবে হঠাৎ এ কি হইল? আর বড় বউই বা টেলিগ্রাফ করিলেন কেন, মেজদা ত আছেন? তবে তাঁর টেলিগ্রাফ করিবার কারণ কি? মেজদা লিখিয়াছিলেন—সংসারের অবস্থা ভাল নহে, বড়বউ খুব প্রখর হইয়াছেন, আমরা সকলেই যেন তাঁহার চক্ষুশূল হইয়াছি, তবে বড়দার মুখে কখনও কোন কথা শুনি নাই, তিনি সদাই ম্রিয়মান থাকেন। মুখে হাসি নাই—যেন বিষাদ মাখা। এক্ষণে তুমি বৎসর খানেকের মধ্যে কিছু উপায় করিতে না পারিলে সংসার থাকিবে না, আমি শীঘ্র শিষ্য বাড়ী যাইয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিব, তোমাকে আজ ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। তবে কি মেজদা শিষ্য বাড়ী গিয়াছেন আর হঠাৎ বড়দার কোন ভয়ানক অসুখ করিয়াছে? হইতে পারে, বিষয় আশয় নষ্ট হওয়ার বিষম চিন্তায় স্বাস্থ্য কখনও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। দাদাঅন্ত প্রাণ নিখিলেন্দ্রের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—ঠাকুর! দাদাকে আমার ভাল রেখো, বাড়ী গিয়া যেন সকলের হাসি মুখ দেখিতে পাই।

যুবক তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া লইলেন। মেসের দুই একটী বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল,

তিনি টেলিগ্রাফ দেখাইয়া বলিলেন—ভাই! বাড়ী থেকে জরুরী টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, বড়দার বড় ব্যারাম! আজ ঠাকুরকে আমার আহারাদি প্রস্তুত করিতে বারণ করো, আমি বাড়ী যাইতেছি। এই বলিয়া নিখিল পথের আবশ্যকীয় দ্রব্য একটী ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং বরাবর হাওড়া ষ্টেশনে আসিলেন।

(৪)

আমাদের দেশে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" একটা প্রবাদ বাক্য বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে কিন্তু এই "ঠাঁই ঠাঁই"য়ের মধ্যে আমরা বউয়েদের একটা প্রবল হিংসা, কঠোর তাড়নার গুপ্ত কষাঘাত দেখিতে পাই। যাহাতে রক্তে-রক্তে গাঁথা, প্রাণে-প্রাণে আঁটা বিমল সহোদর-প্রীতিও তিলেকের মধ্যে টুটিয়া বিষম অপ্রীতির সৃষ্টি করে। তাহাতে আবাব পুরুষ যদি বিবেক বুদ্ধি-হীন ও স্ত্রৈণ হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতি হঠাৎ ভীষণ কলহের সৃষ্টি করিয়া সোণার সংসার ছারক্ষার করিয়া দেয়, জন কোলাহল পরিপূর্ণ শান্তির রাজত্ব, অশান্তির অনল-প্রবাহে জ্বলিয়া উঠিয়া দুইদিনে শ্মশান-ভস্মে পরিণত করে। নতুবা জনকজননীর পবিত্র শোণিত-শুক্রে গঠিত ভাই-ভাইয়ের দেহে এত ভেদনীতির প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রাণকে এরূপ কলুষিত করিতে পারে না।

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বড়বউ অম্বিকার প্রাণেও সেই-রূপ দারুণ হিংসার সজাগ সাড়া পড়িয়া, বেচারা নরেন্দ্রের কর্ণে

তাহা গুরুমন্ত্র রূপে অনবরত উচ্চারিত হইতে লাগিল। স্ত্রৈণ নরেন্দ্র ভ্রান্তিবশে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহা কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে গাঁথিয়া লইলেন। সকলে বসিয়া খাইবে, আর তুমি খাটিয়া মরিবে, উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ সকলের শোর পেটে গুঁজিবে, এক পয়সাও স্থিতি করিবে না? তখন বিষয় ছিল, যা হইত—হইত, এখন রক্ত উঠা ধন এমন করিয়া অপব্যয় করিলে চলিবে কেন? তোমার এমন সোণার চাঁদের মুখ দেখিয়াও কি আক্কেল হয় না, মতি ফেরে না?

পাঠককে বলিতে ভুলিয়াছি—অম্বিকা অনেকগুলি পুত্র কন্যার জননী হইয়া একটীকেও দুইতিন মাসের বেশী কোলে করিতে পান নাই। কি জানি, কোন কর্ম্মদোষে দুধের শিশু, দুইতিন মাস মাতৃক্রোড় অলঙ্কত করিয়া, কি গুপ্ত বেদনায় কঠোররূপে আক্রান্ত হইয়া, পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করত কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়, কি পাপে যে পিতামাতার এ দুর্ভাগ্য—তাহা একান্ত অজানিত। কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, তাহার চিকিৎসা করে, কত দৈবজ্ঞ তাহার প্রতিবিধানে তৎপর হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, ভাগ্য বিধাতার কঠোর হস্তের এ কুলিশ পতন কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

এবার একটী দেবশিশু পিতামাতার অঙ্ক শোভা করিয়া দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে প্রায় একবৎসর জীবিত আছে। পূর্ব্বে পাঁচ ছয় মাস যাইতে না যাইতে শিশু কাল কবলিত হইত,—গর্ভ হইতে তাহাদের পীড়ার সূত্রপাত হইয়া ভূমিষ্ট

হইবার ছয় মাস পুর্ণ হইতে না হইতে তাহার তিরোধানে সকলেই মনে করিয়াছিল—নরেন্দ্রর বংশ থাকিবে না কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অমরেন্দ্র পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া, অনবরত আটমাস মনে প্রাণে ইষ্ট পূজায় রত থাকিয়া অম্বিকার মৃতবৎসা দোষ খণ্ডন করিয়াছেন, তাই শিশুটী পূর্ণিমার শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নীরোগ শরীরে একবৎসর উত্তীর্ণ করিয়াছে, রাহুর প্রকোপ দৃষ্টি এখনও তাহার উপর পতিত হয় নাই।

মায়ের মরা-হাজা সন্তান বলিয়া সকলেই শিশুকে পাঁচকড়ি নামে অভিহিত করিত, এই পাঁচকড়ি ওরফে পাঁচু পিতামাতার ত নয়নেব মণি হইয়াছিলই, অমরেন্দ্রও এই প্রাণের পুতলি অনিন্দ্যসুন্দর শিশুটীকে তিলেকের জন্য না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। নিখিলেশ প্রতি পত্রে খোকার কুশল সংবাদ না লইয়া থাকিতে পারিতেন না, সাবিত্রী ও সরযূ পাঁচুকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, কিন্তু দাম্ভিকা অম্বিকা তাহাদের সে ভাল-বাসায় সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং দেবর অমরের গ্রহযাগে যে তাঁহার মৃতবৎসা দোষ খণ্ডন হইয়াছে, একদিনের জন্যও সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। বড় লোকের মেয়ে সমভাবে অহঙ্কারের তীব্র দৃষ্টিতে, সতেজ গর্ব্বের নীচ ব্যবহারে চিরদিন তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। নরেন্দ্র তাহার জন্য স্ত্রীকে কিছু বলিতেন না, ভাই ভাজের প্রতি এরূপ রূঢ় ব্যবহারের জন্য একদিনও প্রতিবাদ করিতেন না। ফলকথা অম্বিকা তাঁহাদের অপেক্ষা খুব বড় ঘরের কন্যা বলিয়া কিছু

বলিতে সাহস করিতেন না। যখন সময় ভাল ছিল—যখন জমিদার বলিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, তখনি যখন কোন কথা বলিতে পারেন নাই, সদাই আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় অবনত মস্তকে তাঁহার সমস্ত আব্দার, সমস্ত অন্যায় সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, আর এখন ত তাঁহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে, তিনি স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত পত্নীর নিকট কিরূপ বশম্বদ হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়; তবে তিনি নিজে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াদের উপর কখন কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেন নাই, কেবল অম্বিকার জন্যই তাঁহারা একপ্রকার অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষত সেইদিন হইতে, সেই কালীন্দির ঘাটে সাবিত্রী ও সরযূর কথোপকথন হইতে তিনি একেবারে দেবর ও বধূদের উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছেন। ক্ষীরোদা আসিয়া তাহাদের বিপক্ষে নানা কুৎসা রটনা করিলে, সেই যে তিনি ধূণার গন্ধে মনসা-নাচার মত হইয়াছেন, সে ভাব আর কিছুতেই যাই-তেছে না, বরং দিন দিন বিষম কলহের সূত্রপাত হইয়া সংসারে ভীষণ অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। সাবিত্রী অমরেন্দ্রকে দুই একদিন বড় জায়ের অসহ্য গালি গালাজের কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু অমরেন্দ্র তাহা কাণে করেন নাই, বরং থাবাড়ী দিয়া বলিয়া-ছিলেন—সংসারে একজন যদি পাগল হয়, তাহা হইলে সকলকেই কি তাহার সহিত পাগল হইতে হইবে, দাদা ত আর কিছু বলেন নাই? পতিগত প্রাণা ধার্ম্মিকা সাবিত্রী বুঝিলেন—বাস্তবিকই ত, বড়ঠাকুর ত আর কিছু বলেন নাই, তবে দিদির কথা গ্রাহ্য করে কে? গালাগালি দিলে নিজেরই মুখ ব্যথা হইবে, আমরা কোনও

দোষে না থাকলে আর দেবতার স্থানে পতিত হইতে হইবে না। হিন্দু স্ত্রীর এত সহ্যগুণ না থাকিলে কি তাঁহারা দেবীপদ বাচ্য হইয়া ভারতের ইতিহাসে এত মান-মর্য্যাদা সম্পন্ন হইতে পারেন? অম্বিকা যতই তাঁহার স্বামীদেবতার উপর গালি বর্ষণ করুন, যতই মৃত্যু কামনা করুন, নিমুরুদে বলিয়া যতই হেয় জ্ঞান করিতে থাকুন, সাবিত্রী ও সরযূ আর সে কথায় দু ঠোঁট এক করেন না, বরং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এ সমস্ত আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথা পাতিয়া লন।

ক্ষীরোদা পিছনে লাগিয়াই আছে; সাবিত্রী ও সরযূ একটী ভাল কথা বলিলেও সে চারিটী মন্দ করিয়া বড় বউয়ের কাণে তুলিয়া দেয়। বড় বউ তাহাতেই জ্বলিয়া উঠেন, অমরেন্দ্রের উপর তাঁহার ভীষণ আক্রোশ, বসিয়া বসিয়া খাইলে রাজার রাজত্বও নষ্ট হয়, এই জন্য তাঁহাদের সমস্ত জমিদারী নষ্ট হইল, একজন খাটিবে আর সকলে পায়ের উপর পা দিয়া খাইবে, কালে ভদ্রে না হয় শিষ্য বাটী যাইয়া ধান্‌টে চাল্‌টে, কলাটা মুলাটা, কাপড়টা চোপড়টা, আর না হয় দুই একশ টাকা প্রণামী আনিয়া কি তিন চারটে পেট বসে খাইলে চলে?

অম্বিকা এইবার উঠিয়া পড়িয়া তাহাদের বিরুদ্ধে স্বামীর কর্ণে মন্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। দিন নাই, রাত নাই, কেবল মন্ত্রণা—দেখ, তুমি মুখ ফুটিয়া বল, তাহারা পৃথক হউক, নতুবা এত খরচ আমরা যোগাইতে পারিব না। মেজোটাকে সরাইয়া দাও, আর ছোট-টাকে হাত কত্তে চেষ্টা করো, দুই একবৎসর পরে সে খুব রোজগেরে হবে কিনা, খুব লেখা পড়া শিখেছে, একটা

বড় চাকুরী কর্ব্বেই ; মেজো এখন তাকে সমস্ত খরচ পত্র দিচ্ছে, এইবার তার পড়া শেষ হবে, তুমি তাকে বেহাত করো না, কেবল ঐ অকর্ম্মা কুড়েটাকে প্রশ্রয় দিবে না, উহার সংশ্রবে কিছুতেই থাকিবে না, তাহলে আমাদের সব উড়ে-পুড়ে যাবে। এক পয়সার মুরদ নাই, ভাতার কেবল বসে বসে অন্নধ্বংস করছেন—আর পাড়ায় পাড়ায় মড়া বয়ে বেড়াচ্ছেন, চোকবুজে, নাক টিপে সমস্ত দিন ঠাকুরঘরে বসে আছেন, আর তার মাগের কত লম্বা চওড়া কথা, কত তেজ গর্ব্ব-দেখনা ?"

প্রতিদিন বড়বউ মেজোকে পৃথক করিয়া দিয়া ছোট বউকে ঘরে আনিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে কত অনুরোধ করেন। নরেন্দ্র বড় বউয়ের কাছে স্বীকার করেন—আজ অমরকে নিশ্চয়ই বলিব কিন্তু দেখা হইলে কিছুতেই বলিতে পারেন না, যেন কে আসিয়া তাঁহার বাক্য রোধ করিয়া দেয়। ধার্ম্মিক নিরীহ অমরেন্দ্রকে পৃথক করিয়া দিতে তাঁহার শক্তি-সামার্থ্যে কুলায় না। তিনিইত তাহাদের পথের ভিখারী করিয়াছেন, নিজের মদ গর্ব্বে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উড়াইয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, স্ত্রীর মন্ত্রণায় তাহাও আত্মসাৎ করিয়াছেন। অশেষ ভ্রাতৃভক্ত ধার্ম্মিক অমর একদিনের জন্য বাপের বিষয়ের কোন প্রকার হিসাব চান নাই— "বা কেন এমন করিলে" তাহার প্রতিবাদ ও করেন নাই। এমন সোণার ভাইকে কেমন করিয়া এমন মর্ম্মঘাতী বাণী বলিব—কেমন করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দিয়া লোকালয়ে মুখ দেখাইব ? নরেন্দ্র বলি বলি করিয়া বলিতে পারেন না, পৃথক করিয়া দিই

দিই করিয়া তাঁহার ক্ষমতায় কুলায় না, অথচ স্ত্রীর নিকট প্রতিদিন অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন।

(৫)

একদিন রাত্রে বড়বউ স্বামীকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বলিল,—কাল যদি তুমি উহাকে পৃথক করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি আফিং খাইয়া মরিব, না হয় গলায় দড়ি দিব। স্ত্রীর শেষ উক্তি শুনিয়া নরেন্দ্রের প্রাণ শুখাইয়া গেল।

পাঠকের হয়ত মনে হইতেছে—মেজো দেবর ও মেজো বউয়ের উপর বড়বউয়ের এত জাতক্রোধ কেন ? এ উত্তরে আমরা বলি—কারণ তেমন কিছুই নাই, তবে "যাকে না দেখ্‌তে পারি—তার চলনই বাঁকা," এই প্রবাদ বাক্যটী বড় বউয়ের চরিত্রে প্রয়োগ করাই উচিত ; নতুবা যে দেবর অনন্যস্মরণ, দাদা ও বউদির আজ্ঞাকারী, তাহার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ কি ধর্ম্মে সহ্য হয় ? এইজন্য অজস্র গুপ্তধন সংগ্রহ করিয়া, সোণা-দানায় এরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়া, এমন দেবশিশুকে কোলে পাইয়া তাহার প্রাণে একদিনের জন্য শান্তি নাই, অহরহঃ কেবল হিংসানলে পুড়িয়া মরিতেছে।

অধর্ম্মের নিকট ধর্ম্ম বরং থাকিতে পারে, পাপের নিকট পুণ্য বরং অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কিন্তু অধর্ম্ম বা পাপ কখনও পুণ্য বা ধর্ম্মের নিকট আপনার গৌরব বিস্তার করিতে পারে না, সর্ব্বদা মনমরা দিশাহারা হইয়া, অতি-

সঙ্কোচ ভাবে অবস্থান করে। ধর্ম্ম ও পুণ্যের আদর সকলেই করে, অধর্ম্ম বা পাপের আদর কেহ করে না, সকলেই একবাক্যে বলে —রায়েদের মেজো কর্ত্তা ও মেজো গিন্নি যেন সাক্ষাৎ দেবদেবী, যেমনি রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি গঠন পারিপাট্য; দেখিলে যেন চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না, অনবরতই যেন ঐ দুটী মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে রাখিতে ইচ্ছা করে—ছোট বউটীও সাবিত্রীর সঙ্গে থেকে, উহার শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে যেন উহাদের মত রূপগুণ যুক্ত হইতেছে, ছুঁড়ীর গায়েও যেন প্রতিমার মত রঙ ফলেছে! আর "রায় বাঘিনী" বড়বয়ের রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া চুপে চুপে সকলে বলে—আবাগী যেন "পোড়া কাঠ্‌খানা" যেমনি রূপ তেমনি গুণ, তবে বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ—এই যা বলো! তা—কাজ নি মা অমন বড়লোকে, আর অমন রূপ গুণে" সাতজন্ম ছেলের বিয়ে না হয়—সেও ভাল।

পাড়ার কর্ত্রীদের এইরূপ গুপ্ত সমালোচনা অম্বিকা না শুনিলেও ক্ষীরী গোপনে শুনিয়া আসিয়া তাহাকে লাগাইয়া দিত। পাড়ার লোক তাহার একচালায় বাস করে না, কাজেই তাহার প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া বড়গিন্নি মরমে মরিয়া যাইত, শেষে সেই সমস্ত মর্ম্ম-যাতনা গিয়া পড়িত—নিরহঙ্কারী, ধর্ম্মপ্রাণ মেজো দেবর ও মেজোবউ সাবিত্রীর উপর; এবং সেই আক্রোশ-বাণ আজ এতদূর অবধি গড়াইয়া উহাদিগকে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। মেজো বউয়ের ধর্ম্ম-তেজো-দৃপ্ত পবিত্র বদন সুষমা অম্বিকার প্রাণে বিষের বাতি জ্বালিয়া দিত—

হিংসায় সে ফাটিয়া মরিত। বিষ খাইয়া মরিবে বলিয়া সেদিন অম্বিকা যে ভয় দেখাইয়াছে, তাহাতে নরেন্দ্রের ভয় পাইবারই কথা ;—কারণস্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, কি করিতে কি করিবে তাহার ত স্থিরতা নাই ? সেত পরামর্শ শুনিবার মেয়ে নয় ? যা গোঁ ধরে তা না করিয়া ছাড়ে না। এত টাকা কড়ি, এত সোণা দানা দিয়াও তাহার মন পাওয়া যায় না—সে স্বামীর কথা শুনে না। আমরা বলি—এত সোণার অলঙ্কার যাহার আছে, সে কথা শুনিবে কেন ? ধনগর্ব্বই যে মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে, অর্থই যে অনর্থের মূল, বিশেষতঃ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের হাতে তাহা পড়িলে কি আর রক্ষা আছে ?

গোড়ায় গলদ করিয়া, পায়ের জিনিষ মাথায় তুলিয়া এখন নরেন্দ্র হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। কাল সমস্ত দিন অতিষ্ঠি আর
হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সকলেরই মনটা দিবার যো
রহিয়াছে। তাই আজ অমরেন্দ্র সকাল সকাল পূজা
রাদির পর বাহির বাটীর রোয়াকে বসিয়া একটু হইয়া থাকিলে
ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সদাই প্রফুল্ল, সাংসারিক ঈশ্বর নির্ভরশীল
সে দৃঢ় হৃদয়কে কখন বিচলিত করিতে পারে ন, তখন তাহার
পর একটী মাদুর ও বালিশ লইয়া বিশ্রাম কাকলে তাঁহার
খান্‌সামা একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছে চ্ছেদ হইলে
সেবন করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া গুণ গুণ স্বরে একেবারে
বিভোর, এমন সময় বড় দাদা তথায় আসিয়া উপস্থিত পাশের
অমরেন্দ্র তটস্থ হইয়া হুক কালিকা ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। পা

নরেন্দ্রের মুখ আজ গম্ভীর! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন—অমর! ক্রমে ক্রমে সংসারে যেরূপ অশান্তি হচ্ছে, তাতে ত আর এক সঙ্গে থাকা চলে না, রোজ রোজ এ রকম কলহ কিচ্‌কিচিতে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়—এর নিবৃত্তি ত কিছুতেই হচ্ছে না? এই জন্য বলি—তুমি কিছুদিনের জন্য মেজোবউ মাকে নিয়ে বড় বাড়ীতে থাক্‌লে ভাল হয় না? তার পর নিখিল রোজগার-পাতী করলে, অর্থের সচ্ছলতা হলে, আবার এক সঙ্গে মিশ্‌লেই চল্‌বে, টাকা-কড়ির টানাটানিই এ ঝগড়ার কারণ দেখছি, ছোট বউমাকে পুষতে না পার, তিনি আমার কাছে থাকুন। তুমি কি বল, এত ঝগ্‌ড়াঝাটীর চেয়ে এরূপ ভাল নয় কি?

হঠাৎ বড় দাদার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া অমরেন্দ্রের মাথায় বলো বজ্রাঘাত হইল, তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন— 'গুরে" সাতজআপনার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইল কেন? আমি

পাড়ার ক করিয়াছি? টাকার অনাটন ত আছেই, তা বলিয়া শুনিলেও ক্ষীরী য়া আলাদা হইতে হইবে—এ কিরূপ কথা? যেরূপ পাড়ার লোক তা কসঙ্গে থাকিয়া আমোদ-আহ্লাদে তাহাই খাইব, প্রতিশোধ লইতে তাহাতেও ক্ষতি নাই—তা বলে এতদিনের পাতা সেই সমস্ত ম। ফেলিবেন কেন?

মেজো দেবর লেন—না ভাই! এতদিন চলিয়াছে, আর চলিবে আক্রোশ-বা মার মুখ যেরূপ দুরন্ত হচ্ছে, তাহাতে আর একত্র দিতে হবে না। এতাদন তিনি ছেলে মানুষ ছিলেন, বড় পবি কথাবার্ত্তা কইতেন না, এখন যেরূপ কথা কইতে শিখেছেন,

তাহাতে রক্ত মাংসের শরীরে কেহ সহ্য করিতে পারে না। বড়-বউয়ের সহ্যগুণ নাকি খুব বেশী, তাই এতদিন চলেছে, এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, আর চলিবে না।

অমরেন্দ্র নিজের স্ত্রীর গুণ জানিতেন, সাবিত্রী যে অতি নিরীহ প্রকৃতির স্ত্রীলোক, সে যে বড়বউকে অপমান করিতে পারে—তাহা তাহার বিশ্বাস হইল না। তথাপি তিনি বলিলেন—আচ্ছা, দাদা! আমি আজ তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিব, দেখি সে কিরূপ মুখরা হয়েছে, তথাপি বাপ মায়ের এমন সোণার সংসারটাকে হঠাৎ এমন ছারখার হতে দিব না।

নরেন্দ্র বলিলেন—না ভাই! ও সকল ওজর আপত্য আর টিক্‌বে না, বউয়ে বউয়ে আর মিল হবে না, যেরূপ দেখ্‌ছি, তাহাতে আর এক সংসারে থাকা হবে না। মন ভাঙ্গিলে আর গড়া যায় না, এযে কাঁচের বাসনের মত, যোড়া দিবার যো নাই!

অমরেন্দ্রের মুখও খুলিয়া গিয়াছে। আলাদা হইয়া থাকিলে যে খাইতে পাইবে না, সে চিন্তা তাঁহার নাই। ঈশ্বর নির্ভরশীল অমরেন্দ্র জানেন—ভগবান যখন জীব দিয়াছেন, তখন আহার দিবেনই—তবে সুখে আর দুঃখে, ধর্ম্মপথে থাকিলে তাঁহার রাজত্বে উপবাসী থাকিতে হইবে না। তবে গৃহ-বিচ্ছেদ হইলে তাঁহাদের এতদিনের প্রাতঃস্মরণীয় বংশের মান সম্ভ্রম একেবারে নষ্ট হইবে; যে একান্নবর্ত্তীতা তাঁহার পিতা মাতার প্রাণের উপদেশ ছিল—যাহাকে তাঁহারা মহাধর্ম্ম এবং মহা সম্পদ বলিয়া

করিয়া দিলেন। এবং রাত্রের মধ্যে নরেন্দ্র অমরকে পৃথক হইয়া খাইতে বলিলেন, সরযূ কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না, কপালে যাহা আছে—তাহাই হইবে, সে মেজ্‌দির সহিত পুরাতন বাড়ীতেই চলিয়া গেল। নরেন্দ্র ও অম্বিকা অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন কিন্তু সে তাহা শুনিল না। যাহার সহিত প্রাণের টান হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া কি থাকিতে পারা যায়? ক্ষীরোদা টিট্‌কারী দিয়া বলিল—যাচ্ছ যাও কিন্তু এমন ভীরকুটী আর কোথাও হবে না। ছোটবউ বাগ মানিল না, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া মেজ-যায়ের কাছে চলিয়া গেল, ইহা অম্বিকার প্রাণে সহ্য হইল না। ছোটবউ হাত ছাড়া হইলেই ত মুস্কিল, নিখিল যে বৎসর খানেক পরেই মোটা টাকা উপায় করিবে, মেজোর কাছে সরযূ থাকিলে সুবিধা হইবে না, তাহা হইলে সাবিত্রী ও অমরেন্দ্রকে পূর্ণ মাত্রায় জব্দ করা হইল কই? এই জন্য তিনি মনে মনে আরও কিছু নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কর্ত্তার ভয়ানক পীড়া বলিয়া টেলিগ্রাফ ত করিলেনই, ছোট কর্ত্তা দুই এক দিনের মধ্যে আসিবে, তাহাকে সেই পন্থা দেখাইয়া নিজে খুব ভাল এবং মেজোই যত নষ্টের গোড়া, তাহাই প্রমাণ করাইয়া দিবেন।

(৬)

অমরেন্দ্রের সংসারাসক্তি খুব কম ছিল। অহোরাত্র তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজা-হোম, শাস্ত্রপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন করিয়া দিন কাটাই-

তেন, পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, ইহাকেই তিনি মানব জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, এই জন্য তিনি কাহারও দুঃখ দেখিতে পারিতেন না। নিজে না খাইয়াও পরকে খাওয়াইতেন, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া আর্ত্তের সেবা, পীড়িতের ঔষধ দান করিতেন। স্বামী যেমন প্রকৃতির, স্ত্রীও যে তাঁর সেই রূপ হইবে, ইহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কেহ খাইতে পায় নাই, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বারে আসিয়াছে, সাবিত্রী নিজের মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়া নিজে সামান্য মাত্র জলযোগে দিন কাটাইয়া দিয়া সুখী হইতেন। দিদির কাছে কাছে থাকিয়া, তাঁহার আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া, সরযুও এ সকল কাজে ইহারই মধ্যে বেশ অভ্যস্থা হইয়া পড়িয়াছিল।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়া, সাজান সংসার ভাঙ্গিয়া দেওয়া— মহাপাপ, ইহাতে কোন পক্ষেই শ্রেয় লাভ নাই, কেবল একটা মনোকষ্ট, আর শুধু একটা অশান্তি বাড়ান মাত্র। এই জন্য অমর জ্যেষ্ঠকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনুনয়-বিনয় করিয়া এ পাপের আগুন জ্বালিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু স্ত্রীর বশীভূত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র তাহা বুঝিল না, কাজেই তিনি কি করিবেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সাধন-মন্দির হরিসভার দ্বারে আসিয়া বসিলেন। হরিসভা কালিন্দী পুষ্করিণীর পরপারে, তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত অতি মনোরম স্থান, চারিদিকে তুলসী কানন-বায়ুভরে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে ; নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ ফুলভরে নত হইয়া দেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে,

মানের লাঘব করি নাই; তবে তাঁহারা যে আমাকে পায়ে ঠেলিয়া নানা প্রকারে দোষী করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন—ইহার মধ্যে যে তোমার কি অভিনব লীলা খেলা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, অধম আমি তাহা বুঝিতে পারি না, যাহা হউক মঙ্গলময়! তুমি তাঁহাদের মঙ্গল করিও, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এ দাসানুদাসকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করো। অমরেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিলেন না, প্রবলতর ভক্তিপ্রবাহে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, প্রেমাশ্রু পতিত হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিল। অমরেন্দ্রের বাহজ্ঞান নাই, এমন সময় প্রতিবাসী বন্ধু শ্যামসুন্দর গোস্বামী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল - অমরেন্দ্রদা, তুমি আজ এমন অসময়ে এখানে এসেছ কেন? বাড়ীতে কিছু হইয়াছে নাকি? বউদি কি কিছু বলেছেন?

অমরেন্দ্র বলিলেন—ভাই! সে কিছু বলিলে আর ভাবনার কি কারণ আছে? সে কথা না শুনিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায় কিন্তু আজ এ বিষম কথায় আমার হৃৎপিণ্ড যে বিদীর্ণ হইতেছে?

শ্যামসুন্দর বলিলেন—কে এমন পাষণ্ড যে তোমার মত ভক্ত প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া পাপভাগী হইয়াছে?

অমরেন্দ্র।—ভাই! দাদা আজ আমাকে বিষম কথা বলিয়াছেন; আমাদের এত দিনের একান্নবর্ত্তী সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি আমাকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

শ্যাম।—ওঃ এর জন্য এত ভাবনা; আমি বলি—আরও কি

হয়েছে ? তোমার বড়দাদা ভাই, বউয়ের কথায় মরে বাঁচে ; বউ শয্যাগুরু কি না, তাই বোধ হয়—সেখানে কোন পরামর্শ পেয়েছেন। তা তার জন্য আর তোমার এত ভাবনা কি, কান্নাই বা কেন ?

অমরেন্দ্র। ভাই, আমি অন্য কিছুর জন্য ভাবছিনা, ভাবছি কেবল এত দিনের সংসারটা, বাবার এমন নামডাকটা, এতদিনে নষ্ট হতে চল্‌লো !

শ্যাম। অমরদা ! সে বিষয় তুমি মনের কোনেও স্থান দিওনা, বামনদাস জেঠার নাম সহজে লুপ্ত হবে না, বিশেষতঃ তুমি থাকৃতে ; যে যতই করুক, জেঠার কীর্ত্তি কিছুতেই যাবে না, তুমি সে জন্য ভেবোনা। এখন আগামী সপ্তাহে মোল্লা পাড়ার যে পীরের মেলা বসিবে, তার জন্য কি করেছ, অন্যান্য বারের মত এবারেও ত তার তদ্বির কর্ত্তে হবে ?

মেলার কথা শুনিয়া অমরেন্দ্র সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—নিশ্চয়ই কর্ত্তে হবে, সে মেলায় তোমরা সকলে আমরাই না হইলে কি চল্‌বে ? এ কয় বৎসর তোমরা সকলে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর বলেই বেশী লোকজন মারা যায় না, ভাই ! সে মেলা কি এবার এত শীঘ্র হবে ?

শ্যাম। শীগ্‌গীর কি দাদা ! বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসর ত হলো, সে দিন মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি ২।১ দিনের মধ্যেই তোমার কাছে আস্‌বেন।

বর্ষাকালে সমস্ত মাঠটি সাত আট মাস জলে ডুবিয়া থাকে, পীরের পুষ্করিণীটীও বাদ যায় না। এই কয় মাস সমস্ত আবর্জ্জনা পচিয়া থাকে, তাহার উপর এই সময় জল কমিবার কালে যাত্রীদের আগমন হয়—তাহাদের পদ ধৌত এবং মলমূত্র নিক্ষেপে জল বিষবৎ হইয়া থাকে, তাহা ব্যবহার করিলে যে সদ্যসদ্যই মৃত্যু হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি ?

বিগত তিন বৎসর হইতে বসন্তপুরের প্রাতঃস্মরণীয় রায়-বংশের মেজোবাবু শ্রীমান্ অমরেন্দ্র নাথ এই মেলার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই গোশকটে করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ জালা জল স্থানান্তর হইতে আনাইয়া মেলাস্থ লোকের পিপাসা নিবারণ করত অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, স্থানে স্থানে দু এক খানি হোগ্‌লার আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এবারেও অমরেন্দ্র তাহা বিশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, এবং হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বিরহিত হইয়া এবারেও তাহাতে প্রাণপণ করিতেছেন কিন্তু তথাপি রোগ যে একেবারে হয় নাই—তাহা নহে।

পশ্চিম দিকে শব্দ হইল—এ্যা এ্যা, ওয়াক ওয়াক—ওঃ ছাতি ফেটে যায়—জল জল ! অমরেন্দ্র দৌড়িয়া আসিলেন, দেখিলেন—একজন বমি করিতেছে, তাহাকে কোলে করিয়া আট্‌চালায় আনিলেন—দুইহাতে তাহার বমি পরিষ্কার করিয়া দিলেন,—পাছে অপরিষ্কারে তাহার কষ্ট হয় এবং রোগ বাড়িয়া যায়। অমরেন্দ্র বাক্স সমেত ঔষধ আনিয়াছিলেন, প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু

কিছুতেই কিছু হইল না। দেখিতে দেখিতে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এদিকে বমি, ওদিকে মান্‌কে কাপড়ে চোপড়ে অসামাল্ হইয়া পড়িয়াছে, তার পর একবার ভেদ; বন্ধুগণ ডাকিল— মাণিক! ও মাণিক, অমরেন্দ্র ঔষধ প্রয়োগ করিতে না করিতেই আর একবার ভেদ ও একবার বমিতেই তাহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল, সে শমন সদনের অতিথি হইল। দুরন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মেলাস্থ সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। সকলেই আপন আপন পাত্‌তাড়ি গুটাইয়া স্বস্থানে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এরূপ দুই একজনের হইতে হইতেই বহু লোক আক্রান্ত হইবে, কলেরা সংক্রামক রোগ, ইহার বিষ চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়িতেছে, কাজেই মেলা আরম্ভ হইতে না হইতেই লোক পালাইতে আরম্ভ করিল।

মেলার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। বৎসরান্তের এই উপায়ে মৌলবী সাহেবের বৃহৎ সংসার পরিচালিত হয়, কাজে কাজেই মাণ্‌কে মরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও প্রাণে ভবিষ্যতের আতঙ্ক উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি কেবল টাকা সংগ্রহ করিতেই জানেন, প্রতিবৎসর এত টাকা আয়ের একটা মেলার জন্য কিছু খরচ করা, তাঁহার ক্ষমতায় কুলায় না, পাছে পুঁজি ফুরাইয়া যায়। পীরের যাবতীয় উৎসবাদি নির্ব্বাহ জন্য প্রায় পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর জমী তিনি ভোগ দখল করেন এবং মেলার সমস্ত আয় তাঁহারই গৃহে গুদামযাৎ হয় কিন্তু কিছু খরচ করিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে তিনি অদ্যাবধি পারিলেন না।

বলিলেন—দুঃখ কিসের বোন্! তোর মেজো ঠাকুর ত রাঁড়ে-মদে উড়াতে থাড়ু দুগাছি নিয়ে গেলেন না—ঐ টাকায় পাঁচজন গরীবে খাবে, এ কি সৌভাগ্য নয়?—আর তুই যে সঞ্চয়ের কথা বলিস্, কষ্টের সময়ের জন্য রাখ্‌তে বলিস্, তাওত করছি, ছোট ঠাকুরপোর জন্য খরচ হচ্ছে, ওকি সঞ্চয় নয়? বৎসর খানেক বাদে ওযে আমাদের সাহায্য কর্ব্বে। সরযূ এই গুণে মেজদির সঙ্গ ছাড়ে নাই, সে গদগদ চিত্তে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। সাবিত্রী ছোট বোন্‌টিকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বুকভরা স্নেহে এমন একটি চুম্বন করিলেন—যাহাতে সরযূ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

(৮)

নিখিলেন্দ্র মেস্ হইতে বাহির হইয়া একটী বন্ধুর বাটিতে গেলেন। এবং বাটী যাইবার কথা বলিয়া বরাবর ষ্টেসনে আসিলেন, তখনও গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে। নিখিল ষ্টেসনের ঘাটে স্নান করিয়া লইলেন, পূর্ব্বদিন রাত্রে বড় কিছু খাওয়া হয় নাই। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করত যৎ সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন। যদি দাদার পীড়া বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আজ এই পর্য্যন্তই, তাহার ত বাড়ী যাইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইবে। ষ্টেসনে নামিয়া ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে, যান-বাহনাদি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। নিখিল গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে গাড়ী আসিল, যাত্রীগণ তাড়াতাড়ি করিয়া কামরা অধিকার করিবার জন্য ছুটিল, মোটবাহক সকল মোট লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল। লোকের কলরবে, ঠেলা গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে কাণ পাতা যায় না, তাহার উপর প্রতি গাড়ীর দ্বারে দ্বারে—বাবু বই চাই, কেতাব চাই, পান চুরুট চাই ;—বলিয়া ফেরিওয়ালারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার যাহা আবশ্যক দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কিনিতেছে। কেহ বা ফেরিওয়ালার নিকটখাবার খাইয়া—পানী পাঁড়ে, পানী পাঁড়ে বলিয়া জলের জন্য হাঁক দিতেছে।

ক্রমশঃ গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল, এক দুই তিন করিয়া ঘণ্টা বাজিল ; তার পর অসংখ্য যাত্রী উদরস্থ করিয়া বাষ্পীয় শকট ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতে করিতে ষ্টেসন ছাড়িল। নিখিল একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বিষাদ ভারাক্রান্ত চিত্তে বসিয়া গবাক্ষ পথে অনন্ত নীলাকাশ পানে বিভোরভাবে চাহিয়া রহিলেন, মাঠে মাঠে কৃষকগণ কাজ করিতেছে। তখন ধান কাটিবার সময়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চড়ুই বাবুই প্রভৃতি পক্ষীগণ ধানের শীস্ হইতে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ জন্য ছোট ছোট ঠোঁটে দুই চারিটী করিয়া শস্য গ্রহণ করতঃ সীমাহীন আকাশতলে উড়িয়া বেড়িয়া তাহাদের বাসায় গোলাযাত করিতেছে। কৃষক বালকগণ স্থানে স্থানে গোচারণ করিতেছে। গাড়ী এক ষ্টেসনের পর অপর, তার পর অপর করিয়া বেলা একটার সময় হুগলী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিখিল তাড়াতাড়ি ব্যাগটি হাতে করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ গাড়ী হইতে নামিলেন এবং গেটের ধারে এক ব্যক্তির হস্তে টিকিট খানি প্রদান করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার হাতে যৎসামান্য পয়সা ছিল; রোগীর পথ্যাদি ক্রয় করিয়া কিছু বাঁচিয়াছিল; নিখিল ইচ্ছা করিলে গোযান করিয়া বাড়ী যাইতে পারিতেন কিন্তু তাহা করিলেন না। গোযানে যাইতে হইলে বিলম্ব ত হইবেই, তাহার উপর দাদার পীড়া—অর্থের অভাব, যাহাতে বেশী খরচ না হয়—তাহারই চেষ্টা।

তিনি ট্রেন হইতে নামিয়া বসন্তপুরের পথ ধরিলেন। এই রৌদ্রে প্রায় ছয় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে হইবে, নিখিল এতদিন কলিকাতায় থাকিয়া পথ অতিবাহনে কথঞ্চিৎ অনভ্যস্ত হইলেও এবং সম্মুখে কয়েকটী পাল্কীর বেহারা তাঁহাকে আরোহণের জন্য সাধাসাধি করিলেও নিখিল পাল্কী চড়িতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ পীড়িত আর কনিষ্ঠ পাল্কী চড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবে—ইহা তখনকার সমাজের ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে। বহু দূর পদব্রজে যাইতে হইবে, মাঠের হাওয়ায় ছাতি মাথায় দিয়া পথ চলা সুবিধা জনক নহে। তিনি গামছা খানি পুষ্করিণীর জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া হন হন করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। নিখিল আজ দুই বৎসর পথ হাঁটে নাই—এরূপ বহুদূর পথ অতিক্রম করার অভ্যাস পূর্ব্বে থাকিলেও এখন তাহা অনভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার দুই ঘণ্টা লাগিল। গ্রামের মাঠে শীতের আমেজ থাকিলেও তিনি ঘামিয়া

ত্রিখণ্ডী হইয়া পড়িলেন। দুই খানি মাঠ পার হইতেই তাঁহার প্রায় পাঁচটা বাজিল. চিত্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত—একবার বড় দাদাকে সুস্থ না দেখিলে তাহার স্থিরতা হইবে না, ভগবান দাদাকে নিরাময় করুন বলিয়া যুবক একান্ত মনে চলিয়াছেন। পথে পরিচিত কাহার সহিত দেখা হইবার ভয়ে তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়াছেন, পাছে গ্রামের কাহারও সহিত দেখা হইয়া কোন অশুভ সংবাদ শ্রবণে চিত্তের উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হয়।

নিখিল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও এখন শিক্ষার প্রভাব তাঁহাকে তত প্রভাবিত করিতে পারে নাই। এখনও বিমল ভ্রাতৃস্নেহ তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে, একদিন এই ভ্রাতৃ-ভাবেই জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতে ইহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাঁই হইবার নিয়ম বা চিহ্ন মাত্র আমাদের দেশে বর্ত্তমান ছিল না। তাই উচ্চ শিক্ষিত নিখিল এত কষ্টেও ভ্রাতৃ-ভক্তিতে বিভোর হইয়া বাড়ী পানে ছুটিয়াছেন।

সেদিন পূর্ণিমা, সন্ধ্যার পরই পূর্ণচন্দ্র আপন সুস্নিগ্ধ কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কাজেই গ্রাম্যপথে অন্ধকারের গাঢ়তা বিস্তৃত হইয়া পথিকের নয়নে ধাঁধাঁ প্রদান করিতেছে না। নিখিল ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বহুদিনের পর গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি আজন্ম পল্লী-জননীর কোলে প্রতিপালিত নিখিলের সে পরিবর্ত্তনে কোন বাধা ঠেকিল না, তিনি জ্যোৎস্না প্লাবিত পথে অগ্রসর হইয়া

বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বহু বিস্তৃত বাস্তুর সে সুন্দর দৃশ্য আর নাই; তাঁহাদের সেই বহু বিস্তৃত ধান্য ক্ষেত্রও এখন পরের হইয়াছে, বড়দাদা মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়া তাহা নষ্ট করিয়াছেন। কেবল বসত বাটীখানি এখনও তাঁহাদের নিজের আছে, কিন্তু সে শ্রীসৌন্দর্য্য আর নাই, রুগ্নদেহ ব্যক্তি যেমন ঔষধ ও পথ্য অভাবে কঙ্কালসার হইয়া বহু কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকে, বামনদাসের সে সুন্দর অট্টালিকাও সেইরূপ মেরামত অভাবে পড়ি পাড় করিয়াও দাঁড়াইয়া আছে, বুঝি অর্থ-সামর্থ কিছুই চিরস্থায়ী নহে—দেখাইবার জন্য এখনও অপারক ভাবে দণ্ডায়মান।

সে দৃশ্য দেখিয়া নিখিলের চক্ষে জল আসিল। কালিন্দী পুষ্করিণী, যাহা গ্রামের বিখ্যাত জলাশয়, তাহাতে হদ নামিয়াছে, জঙ্গলে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে, তাহার অবস্থাও শোচনীয়। গৃহ-দেবতা দামোদর, সন্ধ্যাকালে যাঁহার আরতির বাদ্যধ্বনি বসন্তপুর প্রতিধ্বনিত করিত, কত লোকে যাহা দেখিতে আসিত, আজ তাহা নীরবে একপ্রকার অতি কষ্টে সমাহিত হয়। হায়রে অবস্থা! নিখিল ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, দেখিলেন সদর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের আবাস গৃহ দুই মহল, পল্লীগ্রামে একজন বড় জমিদার যে ভাবে বাস করেন, একদিন তাঁহারাও সেই ভাবে বাস করিতেন। সম্মুখের মহলটি পূজার দালান ও বৈঠকখানা বাটী, অপর পার্শ্বে দ্বারবানদের বাসস্থানের জন্য কতকগুলি গৃহ। ভিতরের মহলটি অন্তঃপুর,

উপরে নীচে প্রায় কুড়িটি কক্ষ, উপরের কক্ষগুলি নিজেদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, আর নীচের গুলি দাসদাসীদের ব্যবহারের জন্য এবং অন্য কয়েকটি ঘর রন্ধন ও ভাণ্ডার গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। হায়, তাহারও অবস্থা অতীব শোচনীয়, পশ্চাতে কালিন্দীর অবস্থা, তাহার সুপেয় জলের অবস্থা এখন যেরূপ হইয়াছে—তাহা দেখিলে দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়, চারিধারের উদ্যানের অবস্থাও তথৈবচ, মালীর অভাবে সংস্কার হয় না, কাজেই তাহা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর উত্তর ধারে গৃহদেবতা দামোদরের মন্দিরের কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দির সংলগ্ন বাস-ভবন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বামনদাস কখনও অট্টালিকায় বাস করিতেন না, সস্ত্রীক গৃহদেবতার পদপ্রান্তে এই সুখের মৃৎকুটিরেই বাস করিতেন। তাহার সময় এই সকল গৃহের শোভা-সৌন্দর্য্য খুব ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল, এখন তাঁহার মধ্যম পুত্র অমরেন্দ্র ঠিক সেইরূপ না হইলেও কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান রাখিয়াছেন। তাঁহার হরিসভায় প্রত্যহ সংকীর্ত্তন হয়, হরিবাসরে এখনও বৈষ্ণব সেবার ত্রুটী হয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত গৃহে আলো জ্বালিবার লোক নাই, অথবা অবস্থাও সে বিষয়ে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। কি করিবেন—নিখিল অন্ধকারে আস্তে আস্তে দ্বিতলের সোপান সম্মুখে আসিলেন। সিঁড়িতে পা দিয়াই তাঁহার বুক দুর দুর করিতে লাগিল, বাম চক্ষু অতি চঞ্চল ভাবে একবার নৃত্য করিয়া উঠিল, দারুণ উৎকণ্ঠায়

দ্বিতলে উঠিয়া জ্যেষ্ঠের শয়ন কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন—বাঃ একি! তবে কি কোন দুষ্টলোক মিথ্যা করিয়া এরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছিল? তিনি দেখিলেন—মেঝের উপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ননীর পুতলী পাঁচুকে লইয়া খেলা করিতেছেন, শরীর বেশ সুস্থ; সম্মুখে মাতৃসমা বড়বধূ ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া পুত্রের কৌতুক দেখিয়া মৃদু-মন্দ হাস্য করিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথ পদশব্দ শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিবা মাত্রই কনিষ্ঠকে দেখিয়া সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং শশব্যস্তে তাহাকে লইয়া শয্যার উপর বসাইয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। নিখিল প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে দাদা ও বউদির পদধুলী লইলেন এবং প্রাণের পাঁচুকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করত শয্যায় বসিয়া বলিলেন—দাদা! টেলিগ্রামে হঠাৎ এমন ভয়নাক সংবাদ পাঠাইবার কারণ কি? আপনাকে ত সেরূপ কিছু অসুস্থ দেখিতেছি না? কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ত্রীর পূর্ব্ব শিক্ষা মত নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—ভাই! আশ্চর্য্য হইবারই কথা, তবে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তোমার আসাটা নিতান্ত দরকার কিন্তু তুমি যে রকম পড়ার পাগল, লেখা পড়ায় তুমি যে রকম নিবিষ্টচিত্ত, তাহাতে সহজে আসিবে না বলিয়াই ঐরূপ করিতে হইয়াছে, এখন খাওয়া-দাওয়া করে কিছু সুস্থ হও, তার পর সব কথা বলছি।

পার্শ্বে বড় বউ অম্বিকা দাঁড়াইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতার

কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি উপরপড়া হইয়া বলিলেন—শুনেই বা কি কর্ব্বে বল! তুমি বাড়ীর কর্ত্তা, তোমায় যদি কেউ না মানে, ত কে কি কর্ব্বে বলত ঠাকুর পো! এখন তুমি আগে চাট্টি খাওয়া-দাওয়া কর, সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই, রাত অনেক হয়েছে, অসুক কর্ব্বে, তারপর তোমার দাদার মানের গোড়ায় জল ঢেলো!

নিখিল। কি ব্যাপার হয়েছে বউদি, আগে বল, তার পর খাওয়া হবে, মেজদা ও মেজোবউ কোথায়?

বড়বউ। কি আর বল্‌বো ভাই, আমার যেমন কপাল, এত ক'রেও সকলের মন পাই না, পান থেকে চূণ খস্‌লেই মুস্কিল, যে যার গণ্ডা বুঝে নিতে চায়?

নিখিল। বড় বিপদে ফেল্‌লে দেখছি, কি হয়েছে তাই বল না?

বড়বউ। এখন না শুন্‌লেই হতো, তবে একান্তই যদি শুন্‌বে ত শুন—মেজোবউ, ছোটবউ, আর মেজোকর্ত্তা এরা সব এক হয়ে, আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে, আজ কিছু দিন হলো ভেন্ন হয়ে খাচ্ছে। এইজন্য তোমাকে এত জরুরী আস্‌তে বলেছিলাম, যে এসে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে নাও, এর পর ফাঁকি পড়লাম বলে আমাদের কোন দোষ দিতে না পার?

নিখিল। এতদুর শ্রাদ্ধ গড়িয়েছে, তা ঝগ্‌ড়া হলো কি জন্যে?

বড়বউ। এক সঙ্গে ঘর কর্ত্তে গেলে, অন্যায় দেখলে দুই একটা কথা না বলে থাকতে পারা যায় না, এতে কি কোন দোষ আছে, তুমিই বল না?

নিখিল। এতে আর দোষ কি, বিশেষতঃ তুমি বড় যা, অন্যায় দেখ্‌লে নিশ্চয়ই শিক্ষার ছলে দুই একটা কথা বল্‌বে বৈ কি? তা কি হয়েছিলো?

বড়বউ। সেদিন দুপুর বেলা তোমার বড় দাদা, কেওড়পাড়া থেকে একটা বড় মাছ এনেছিলেন, তা ভাই, সেই মাছের ঝোল হয়, সে দিন মেজোবউই রাঁধে, আর পরিবেশনও সে করেছিল, ওদের দুই ভেয়ের খাওয়া হয়ে যাবার পর, ক্ষিরী খোকাকে খাওয়াচ্ছিল, কাঁটা লাগ্‌বে বলে তাকে একটুও মাছ দেয় নাই, সে বায়না ধরলে, ক্ষিরী বল্লে—মেজো মা! একটু কোলাটের মাছ দাও না, বাছাকে খাইয়ে দিই, বায়না ধরেছে কিন্তু তার কথা না শুনে দুখানা আলু দিয়ে বল্লে— এখান গলায় লাগ্‌বে, তুই সাম্‌লাবি কি করে? আর মাছ নেই, তুই খোকাকে তুলে নিয়ে যা!

নিখিল। বংশের দুলাল খোকার সঙ্গে এত আড়াআড়ি, ও আর কত খেতো? আর ওকে না দিয়ে অপরের মুখে উঠ্‌বেই বা কি করে?

বড়বউ। বল্‌তো ভাই! লেখা পড়া না শিখ্‌লে ও বুদ্ধি মাথায় আস্‌বে কেন? আমার সে দিন শরীর ভাল ছিল না, ভাত খাই নি, তোমার ভেয়েদের খাবার সময় আমি সেইখানে বসেই পান সাজ্‌ছিলাম। দেখ্‌লুম বড়কর্ত্তার পাতে মোটে দুখানা মাছ আর মেজো কর্ত্তার পাতে চার পাঁচ খানা, তাতেও আমি কিছু বলিনি, তবে ছেলেটাকে একটু দিলে না দেখে আমি

বল্‌লুম—মেজোবউ, আমি খেলেও ত একটু পেতুম, তা আমার ভাগের টুকু খোকাকে দিলেই হতো ; এই যাই বলা আর যায় কোথা, রেগে হাঁড়ি শুদ্ধ মাছ গুলো নিয়ে এসে বল্‌লে—অত ভাগ করে কুটা হয় নি, এই যা আছে নাও সব, বলেই ভাই আমার সাম্‌নে হাঁড়িটা ঢপ করে বসিয়ে দিলে ?

নিখিল। সত্যি নাকি বউদি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, সামন্যতে এত রাগ ?

বড়বউ। এই ঘর দেবী মা সাক্ষী, আর তুমি ছোট ভেয়ের মত, একটা কথাও যদি এর মধ্যে মিথ্যে বলে থাকি, তা হলে আমার মুখ পুড়বে না, তবে লক্ষ্মীবারে ভোর দুপুরে হাঁড়িটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে বলে, ভাই দু চারটে শিক্ষার কথা আমি বলেছিলাম। এই আর কি, খাবার পর বাসন মাজতে গিয়ে দুইজনে কালিন্দীর ঘাট ফাটাতে লাগ্‌লো আর আমাকে গালাগালি দিয়ে ছোট বউকে শিখাতে লাগলো যে তুমি আজি ঠাকুরপোকে চিঠি লেখ যে, বড়দি আমাকে দেখ্‌তে পারে না, কষ্ট দেয়, এই সব যুক্তি করছে ! আর পোড়াকপালী আমিও কি সেই সময় খোকার দুধের বাটী ধুতে ঘাটে গেছি—ঐ সব অন্যায় কথা শুনে বল্‌লুম—মেজবউ, ঘাটের ধারে বসে ঐ ছোট কচি বউটাকে নিয়ে কি এমন করে হেঁকে ডেকে শিখাতে আছে, লোকে বল্‌বে কি ? যা বল্‌তে হয়, ঘরে গিয়ে বলোনা। যেমন এইকথা বল্‌লুম, তার উপর অমনি কত কথা শুনিয়ে দিলে, আমি দুঠোঁট এক করিনি, তোমার দাদাকে এসে বল্লুম, তিনি বল্লেন—নিখিলকে

আস্‌তে টেলিগ্রাম কর, নতুবা ছোট বউমার মাথা খাওয়া যাবে, যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে ঐরূপ শিক্ষা এখন থেকে পেলে আর রক্ষা থাক্‌বেনা। পাছে তুমি না আসো এই জন্য ঐরূপ টেলিগ্রাম করেছি; আর সেইদিন হইতেই ওরা তোমার দাদাকে অগ্রাহ্য করে, চাল্‌ডাল্‌ নিয়ে পৃথক হয়ে পুরাতন বাটীতে রান্না করে খাচ্ছে!

নিখিল। মেজবউ যেন খেলে, তুমি ছোটবউকে এদিকে রাখ্‌লে না কেন?

বড়বউ। ভাই! সে কথা তোমায় বল্‌তে হবে না; আমি ঢের বুঝিয়েছি, তোমার দাদাও বুঝিয়েছেন, কিন্তু সে কিছুতেই মেজোবউয়ের সঙ্গ ছাড়লো না; এখন তুমি এসেছ, তোমার মানুষ—যা ভাল হয় করো, আমি বলে খালাস্‌ হলুম!

নিখিল। খিচুড়ী খুব ভাল করেই পেকেছে দেখ্‌ছি, যাই হোক, কাল হবে, এখন তুমি চারটী খেতে দাও, বড় খিদে পেয়েছে?

বড়বউ দেবরকে ভাল রূপ কাণ ভারি করিয়া দিয়া, রান্নাঘরে গেলেন। নিখিল লেখা পড়াই শিখিয়াছেন কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিত তাঁহার কিছু নাই; তিনি একতরফা বক্তৃতা শুনিয়াই—মেজো ও ছোটবউকে দোষী সাবস্থ্য করিলেন। বড়বউমার মত, তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার, মেজো দাদাই বা এ সকল সহ্য করলেন কি করে? করবেনি না কেন, তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেই পাগল, হয়ত ঘটনার সময় বাড়ী ছিলেন না। তারপর

মেজোবউ যেমন লাগাইয়াছে, সেইরূপ হয়েছে, মেজবউদির কথায় যে তিনি মরেন বাঁচেন? তাই তাঁর কথা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, আর দাদা যে একটা পূজনীয় লোক, তাঁকে ত একবার জিজ্ঞেসাও কর্ত্তে হয়, তা হুজুরের অনুমতি পান্‌নি, কেমন করে কোর্‌বেন, শিক্ষা না পাওয়ার এই দোষ আর কি?

নিখিল ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হইয়া সংস্কৃত-পড়া মেজোদাদার শিক্ষার দোষ দিলেন, তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি নিতান্তই কম বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, এক পক্ষের আর্জ্জি-পাঠ শুনিয়া মোকর্দ্দমার ডিক্রি-ডিস্‌মিস্‌ করা বিচারকের উচিত নয়। নিখিল! তুমি যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ বড় হইতে বসিয়াছ—তার মূলে মেজোদাদার আন্তরিক ত্যাগ স্বীকার না থাকিলে, গুপ্তভাবে মেজোবউয়ের সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া টাকা প্রদান না করিলে, তোমার এম, এ পাশ করা কোথায় ঘুচিয়া যাইত—তাহা কি তুমি জান? বড়দাদা ও বড়বউদির চাটুবাক্যে ভুলিয়া দেবকল্প মেজোদাদার দোষ দিতেছ, তাঁহার বুদ্ধি নাই—তিনি স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করিতেছ, কিন্তু মেজোদাদার ধর্ম্মমূলক উপদেশ বাক্য শুনিয়া যদি তোমার বড়দাদা কাজ করিতেন, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা এত মন্দ হইত না এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ এত গরলময় হইয়া সোনার সংসারটাকে এমন করিয়া ছারক্ষার করিত না। তোষামোদের ক্ষমতা বেশী, তাই নিখিল সমস্ত দোষ মেজোদাদা ও মেজোবউদির ঘাড়ে

চাপাইয়া দিল, এবং ছোটবউ তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছে বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল।

অত্যন্ত রাগের বশবর্ত্তী হইয়া নিখিল আর পরমোপকারী মেজোদাদাও মেজোবউদির সহিত দেখা করিতে গেলেন না; সমস্ত দিনের পর আহারাদি করিয়া বড়ই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, ইহার উপর উত্তেজনা বৃদ্ধি হইলে হয়ত নিদ্রা হইবে না, শরীর খারাপ হইবে, এইজন্য তিনি আর রাত্রে এসকল বিষয় তোলাপাড়া না করিয়া ভোজনান্তে পার্শ্বের কক্ষে শয়ন করিয়া অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

(৯)

অমরেন্দ্র আজ একসপ্তাহ হইল—বাড়ী নাই। কোনও সুদূর পল্লীগ্রামে ভীষণ বিসূচিকা রোগে গ্রামবাসী মারা যাইতেছে, সেবা করিবার বা ঔষধ দিবার লোক নাই, পরদুঃখকাতর অমর লোক মুখে শুনিয়াই তথায় দৌড়িয়াছিলেন। হাতে একটী পয়সাও নাই, তথাপি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করতঃ দুই চারিজন কর্ম্মঠ বন্ধু লইয়া গিয়াছেন। ঔষধের বাক্স ত সঙ্গেই আছে।

পর সেবায় অমর নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াও কার্য্য করেন, পরের জন্য তিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। নিজের প্রাণ গেলেও কাহার নিকট এক পয়সা চাহিতে পারেন না কিন্তু পরের জন্য অজস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া

সময়ে সময়ে এমন এক একটী মহৎ কার্য্য সমাধা করেন—যাহা খুব সম্ভ্রান্তলোক চেষ্টা করিলেও পারিবেনা। অমরের উপর সকলের বিশ্বাস ছিল যে তিনি যাহার জন্য টাকা গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতেই সমস্ত ব্যয় করিবেন—এক কপর্দ্দকও নড়চড় হইবে না, এই জন্য সকলেই বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে টাকা প্রদান করিত।

অমর যজমান রক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাই যথেষ্ট মনে করিতেন, আপনার অবস্থার প্রতি তিনি কখন অসন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি জানিতেন—আমি যেমন উপযুক্ত, ভগবান আমাকে সেইরূপ দিতেছেন, ইহার অতিরিক্ত আশা করিলে, পাইব কোথায়? যখন অতিরিক্ত আবশ্যক হইবে, যিনি দিবার মালিক, তিনিই দিবেন, বৃথা হৈ হৈ করিয়া লোক ঠকাইলে কি হইবে? কাজ করিয়া যাই, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করি, তারপর ঈশ্বর আছেন—তিনিই দেখিবেন। ভগবানে নির্ভরশীল যুবকের এইজন্য একদিনের জন্য ও অভাব হইত না, যখন যাহা মনে করিতেন, যখন যে কর্ম্ম সমাধা করিব বলিয়া চেষ্টা করিতেন, ঈশ্বর কৃপায় তখনই তাহা সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া যাইত। এবারেও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তথায় যাইয়া অতি উত্তমরূপ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। আজ সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার বাটী ফিরিবার কথা, তাই পতিগত প্রাণা সাবিত্রী রন্ধনাদি করিয়া সমস্ত দিন অনাহারে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

সমস্ত দিবাভাগ উত্তীর্ণ হইল, কই তিনি ত আসিলেন না, বোধ হয়—কার্য্য গতিকে বিলম্ব হইতেছে, রাত্রেও ত আসিতে পারেন?

সাবিত্রী ছোট বউ সরযুকে খাওয়াইয়া আপনি উপবাস করিয়া রহিলেন। দেবতার আগমন হইবে—নিশ্চয়ই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তবে কি তাঁহার আগে আহার কখন সম্ভব? তাই ছোট ভগ্নী সদৃশা সরযুকে খাওয়াইয়া আপনি অনাহারে রহিলেন। সরযু খাইতে চায় নাই, পূজনীয় ভাসুর মহাশয় আসিবেন, তিনিও অনাহারে অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু সমস্ত দিন ভোজন না করিয়া কচি ঢল্ ঢলে মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, সাবিত্রী তাহা দেখিতে পারিলেন না, বলিলেন—ছোটবউ! তুই ভাত খা, তোর বড় আমি যখন রহিলাম—তখন দোষ কি, দুইজনেই যদি উপবাস থাকি, তা হলে সংসারে কাজ কর্ব্বে কে? মেজোযায়ের অনেক অনুরোধে সরযু রাত্রে ভোজন সমাধা করিয়া দিদির কাছে রামায়ণ লইয়া অশোকবনে সীতার কাহিনী পাঠ করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় বারটা অবধি পাঠ করিয়া সরযু দিদির পায়ের তলায় ঘুমাইয়া পড়িল। সাবিত্রীর নিদ্রা নাই—স্বামীর আসিবার কথা, তিনি আজ এক সপ্তাহ পরবাসে কষ্ট পাইতেছেন—আর সাবিত্রী ঘরে বসিয়া কয়েক ঘণ্টা আহার-নিদ্রার কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন না—ইহা যে অসম্ভব?

গ্রাম যখন নিশুতী, প্রগাঢ় নিদ্রার কোলে অচেতন—তখন

ও বাড়ীর ক্ষীরোদা ঝি কালিন্দীর ঘাটে আসিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে—ছোট বাবু কল্‌কেতা থেকে এসেছেন; খাবার আয়োজন কর্ত্তে এতদেরী, কত রকম খাওয়া তার কি ঠিক আছে? বড় বউ যাহউক দেওরকে ভাল বাসে বটে, মায়েও ছেলেকে এত ভালবাসে না। ছোঁড়াও তেমনি মান্য করে; কর্ত্তা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শুতে গেলেন, এইবার আমাদেরও কাজ শেষ হলো"। ক্ষীরোদা শুনাইয়া শুনাইয়া ঘাটে আসিয়া এই সকল কথা বলিতেছিল। পুষ্করিণীর অপর পারে পুরাতন মহলে সাবিত্রী ও সরযূ বোধ হয় এতক্ষণ নিদ্রা যায় নাই, তাহাদের না বলিলে হইবে কেন? ছোট বাবু তাহাদের কাছে গেল না, ইহা তাহাদের পক্ষে একটা অপমানের বিষয়, না বলিলে শত্রুতা সাধন করা হয় কই?

সাবিত্রী স্বামীর ভাবনায় তন্ময় ছিলেন, ক্ষীরোদার কথা এতক্ষণ তাঁহার কর্ণে যায় নাই। যখন বেশী বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিল, গলা যখন সপ্তমে উঠিল, তখন সাবিত্রীর কর্ণে সে কথা পৌঁছিল,—ছোট কর্ত্তা যে ওবাড়ীতে আসিয়া আহারাদি করিয়াছে, তাহাদের দেখিতে আসে নাই, এমন কি এতদিন পরে আসিয়া তাহার নিজের স্ত্রীরও কোন খোঁজ লয় নাই, শুনিয়া কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। নিখিল বড়বউয়ের কথায় তাহাদের প্রতি এইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলেও সাবিত্রী তাহা মনের কোণে স্থান দিতে পারেন নাই যে সে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছেন—সমস্ত

দিন পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে, পথশ্রান্তির পর আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কাল প্রাতঃকালে নিজেই আসিবে। সাবিত্রী একবার উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া ঘাটের দিকে দেখিলেন, অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, পরন্তু ক্ষীরোদা তখন ঘরে চলিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী আবার যথা স্থানে আসিয়া বসিলেন।

এমন সময় বহির দ্বারে আঘাত হইল—"দ্বার খুলিয়া দাও" স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাবিত্রী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া ঔষধের বাক্সটি স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—যেখানে গিয়াছিলে—সেথাকার খপর ভাল, তোমার শরীর ভাল আছে? অমর বলিলেন—হাঁ, সেখানকার অবস্থা এখন ভগবান একরূপ ফিরাইয়া দিয়াছেন, মৃত্যু সংখ্যাও খুব কম, নাই বলিলেই হয়, আমার শরীর খারাপ হয় নাই, তবে প্রথম প্রথম দেখিয়া শুনিয়া মন বড খারাপ হয়ে ছিল, তার পর ভগবানের আশীর্ব্বাদে রোগীদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হোইলে প্রাণে খুব আহ্লাদ হয়েছে। সাবিত্রী, এ কয় দিন তোমাদের কোন কষ্ট হয় নাই?

সাবিত্রী। স্বামী যার পরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে, তার স্ত্রীর সামান্য কষ্টে কষ্ট হইবার ত কথা নয়? আর ঘরে থাকিয়া, শয্যায় শুইয়া, সময়ে আহার করিয়া, কার আবার কষ্ট হয়ে থাকে? তোমার আশীর্ব্বাদে এখানে কোন কষ্টই স্থান পায় নাই!

অমর। ঠাকুরের পূজাদির কিছু গোল হয় নাই, যজমানের বাটীর কোন কাজ-কর্ম্ম পণ্ড হয় নাই?

সাবিত্রী। না, রাধানাথ ঠিক সময়ে দামোদরের পূজা করিতেছে, ঘোষালদের বাটী একটা ষষ্ঠী পূজা ছিল, সে তাহাও করিয়া আসিয়াছে, জমীদার বাটীর নিত্য পূজাও সারিয়া আসিতেছে—কোন গোল হয় নাই।

সাংসারিক কোনও প্রকার গোলমাল এবং গৃহ দেবতার পূজার কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই শুনিয়া অমর আহারে বসিলেন। আসিবার সময় নদীতীরে সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া আসিয়াছিলেন, আহার করিতে করিতে বলিলেন—পাঁচুর কোন অসুখ করে নাই—ভাল আছে ত ?

সাবিত্রী। একদিন মাত্র তাকে ঘাটের ধারে পাইয়া কোলে করিয়াছিলাম, তার পর বড়দি আর তাকে ছাড়ে নাই—পাছে সে এদিকে আসে। ছেলে কিন্তু কেঁদে কেঁদে প্রাণ বার কচ্ছে, আমাদের কাছে আস্‌বার জন্য ধস্তাধস্তি করে, ক্ষীরী পোড়ারমুখী তাকে আস্‌তে দেয় না, আস্‌লেও দিদিকে গিয়ে বলে দেয়, দিদি তার শোধ ছেলেটার উপর দিয়েই তুলেন। এই দেখে শুনে প্রাণটা খারাপ হলেও আমি আর তাকে আন্‌তে যাই নাই, আহা দুধের বাছার উপর মায়ের এত পীড়ন !

অমর। দেখ সাবিত্রী, বড়বউয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, শুধু তোমাকে নয়, বড়দাকেও সময়ে সময়ে কত কটু কথা শুনিয়ে দেয়, আমাকে ত কথাই নাই, সেদিন পাচুকে আন্‌তে গিয়ে ঝাঁটা খেয়েছিলুম আর কি—ভাগ্যে দৌড়ে পালিয়ে এলুম, তাই রক্ষে, নতুবা এলো-পেলো ভেঙ্গে দিত।

সাবিত্রী। কাল আমাকেত তাই করেছিলেন, পাঁচু ঘাটের ওপারে দাঁড়িয়ে "কাকী যাব কাকী যাব" বলিয়া চেঁচাতে ছিল, আমি তার কান্না দেখে এদিক দিয়ে দৌড়িয়া গিয়া দেখি "রায় বাঘিনী" আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে দেখে আর যায় কোথা, উঠি পড়ি করিয়া ছেলেকে লইয়া দৌড় দিল, আমি শুষ্ক মুখে ফিরে এলাম।

অমর। যাহউক, মার খাই আর যাই খাই, পাঁচুকে কোলে করা বন্ধ কর্ত্তে পারবো না, বংশের দুলাল, ওর সঙ্গে বাদাবাদি কি? তবে দাদার শরীর কেমন আছে, কিছু শুনেচ?

সাবিত্রী। সে এক মজা, শরীর অত্যন্ত খারাপ বলে ছোট ভাইকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, ছোট ভাই এসে দেখে সে কিছুই নয়, বোধ হয় আমাদের দোষ দিয়ে তার কাছে কত কথাই লাগিয়েছে, তাই ঠাকুরপো এসে অবধি আমাদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসেনি।

ছোট ভাই বহু দিনের পর ঘরে আসিয়াছে শুনিয়া অমরেন্দ্র বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং সরল প্রাণে বলিলেন—সাবিত্রী, তা মনে করো না, নিখিল সে রকম ছেলে নয়, হাজার হউক লেখা পড়া শিখেছে, সে কি যা তা কর্ত্তে পারে? তবে সমস্ত দিন কষ্ট করে এসেছে, তাই খাওয়া দাওয়া করে হয়ত বিশ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে, এত পথ হাঁটা ত আর এখন তার অভ্যাস নাই, অপমানই হউক আর যাই হউক, তুমি কোন্ একবার তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলে?

সাবিত্রী। আমি কি জানি, এই রাত দুপুরে ক্ষীরী এসে ঘাটে চেঁচাচ্ছিল—তাই শুনলাম, যে ঠাকুরপো এসেছে!

যাই হউক, আজ ত রাত অনেক হয়েছে, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আর বিরক্ত করে কাজ নাই, কাল সকালে তখন দেখা কর্ব্বো, ছোট ভাইয়ের যদি অভিমানই হয়ে থাকে, তা বলে কি আমাদের দেখা কর্ত্তে হবেনা? এই বলিয়া অমর আহারাদি শেষ করিয়া আচমন করিলেন এবং সেদিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, সত্বর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

(১০)

সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। অন্ধকার ধরণীর শ্যাম অঞ্চল ছাড়িয়া সবে মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব তখনও উদয় হন নাই, তবে পাখা পক্ষীগণ তাঁহার আগমন জানাইবার জন্য নিজ নিজ কুলায় বসিয়া কলরব করত গ্রামবাসীর নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে।

অমরেন্দ্র অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিখিলের সহিত দেখা করিবার জন্য দাদার বাড়ীতে গমন করিলেন। বহুদিনের পর প্রাণের কনিষ্ঠ সোদরকে আলিঙ্গন করিবেন, নিখিল মানুষ হইয়াছে, এইবার তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, লুপ্ত প্রায় বংশের মান-মর্য্যাদা তাহার দ্বারা আবার বজায় হইবে, ভাবিয়া অমর আনন্দে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন।

নরেন্দ্র তখন ও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই, নিখিল পূর্ব্বদিনের দুরন্ত পরিশ্রমে তখনও সুখনিদ্রায় নিদ্রিত। কেবল বড়বউ অম্বিকা পুত্র কোলে লইয়া সেইমাত্র জাগিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন, তাঁহার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই। পাঁচু কিন্তু প্রভাতের শীতল সমীরে বারন্দায় খেলা করিতেছে, কখনও মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, "বজ্জাৎ ছেলে রসোত" বলিয়া অম্বিকা তাড়না করিতে যাইতেছেন, ক্ষুদ্র শিশু অমনি টলিতে টলিতে বারান্দার অন্য প্রান্তে উঠি-পড়ি করিয়া পলায়ন করিতেছে। এমন সময় অমর আসিয়া ডাকিল—"পাঁচু বাবু" শিশু কাকাকে দেখিয়া যেন আনন্দে গলিয়া গেল, "কাকা যাব, কাকা যাব" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

অমরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অম্বিকার অবসাদ ঘুচিল। পোড়ার মুখো আবার এতদুর আসিতেছে কেন, তবে কি ছোট ভাইকে কোন ভজন-সজন দিয়া লইয়া যাইবে? তাহার প্রাণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সময় কেহ কোথাও নাই; একটা কাণ্ড বাধাইলে ভাল হয়, মনে করিয়া তিনি মনে মনে অমরকে অপ্রস্তুত করিয়া একটা বিষম দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইবার জন্য ফাঁদ পাতিলেন। অমর যখনই বাটীর বাহির হইতেন—তখনই তাঁহার হাতে একটা বাঁশের লাটী থাকিত, বিনা যষ্টী হস্তে তিনি বাটীর বাহির হইতেন না।

আজও তিনি দাদার বড়ীতে সেইরূপে কনিষ্ঠ নিখিলের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। অতবড় জমীদার বাটীর সমস্তই

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উপরে যে ছুই একখানি গৃহ অবশিষ্ট আছে; নরেন্দ্র তাহাতেই সস্ত্রীক বাস করেন। সিঁড়ির উপরে নরেন্দ্রের বাস গৃহ, অমর সিঁড়ি বাহিয়া যেমন উপরে আসিয়াছেন—ক্রূর স্বভাবা অম্বিকা অমনি "মেরে ফেল্লে গো, মেরে ফেল্লে গো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পাচু কাকার অপেক্ষায় আনন্দ করিতেছিল, জননীকে ভূতলে পড়িয়া সেইরূপ ছট্ ফট্ করিতে দেখিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইল। ইত্যবসরে অম্বিকা মাথা ঠুকিয়া কিছু রক্তপাত করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিল, অমর সিঁড়িতে উঠিয়াই অবাক হইয়া গেলেন—বড়বধূর মনের ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সহিত বহুদিন হইতেই বড়বধূর শত্রুতা—কথাবার্ত্তা নাই, এরূপ চিৎকারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মাতা পুত্রের কান্নায় নরেন্দ্র ও নিখিলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, প্রাতঃকালে হটাৎ কি বিপদ ঘটিল? তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখেন—অমর সম্মুখে লাঠী হস্তে দাড়াইয়া আছেন এবং বড়বধূ পুত্রকে লইয়া ভূমে লুটাইতেছে। ছুই ভাইয়ে তাড়াতাড়ি বড়বধূর ক্ষত স্থানে জল দিয়া রক্ত ধুইয়া দিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বড়বধূ একটু শান্ত ভাব ধারণ করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?

অম্বিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং শরীরের বসন যথাযথ গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—ও আমায় মেরে ফেলেছিলো গো।

নিখিল।—কে মেরে ফেলেছিল বউদি ?

বড় বউ অমরকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ হতভাগা অনেক দিন থেকে আমাকে শাসাইতেছিল, এতদিন পতনে পায় নাই, আজ গোপনে এসে মাথায় এক লাটী, দেখ্‌লে ঠাকুর পো !—মেজো ভাইয়ের কীর্ত্তিটা, ভাগ্যে তোমরা উঠে পড়লে, না হলে মেরে ফেলেছিলো আর কি ?

নরেন্দ্র ও নিখিলেন্দ্র দুইজনেই অমরের দিকে চাহিলেন—অমর বড়বউয়ের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, মুখে কথা পর্য্যন্ত বাহির হইতেছিল না। নরেন্দ্র কিছু বলিলেন না, পাছে কলহ বাড়িয়া যায়, এইজন্য রাগে গর গর করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। নিখিল মেজদাদার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তিনি অতি ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—মেজ্‌দা ! এসব কি, ছিঃ। অমর ইহার উত্তরে কি বলিবেন—বড়বউর চাতুরী দেখিয়া তিনি সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। মানুষ যে এরূপ চাতুরী করিতে পারে, মানুষ হইয়া মানুষকে যে বিনাদোষে এরূপ অপ্রস্তুত করিতে পারে—ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, তদুপরি কনিষ্ঠের প্রশ্ন—"মেজদা এসব কি ?" তবেত উহার মনেও সন্দেহ হইয়াছে যে সত্য সত্যই আমি বড়বউকে এমনভাবে মারিয়াছি, এরূপস্থলে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কাজেই তিনি মরমে মরিয়া, আর কোনও কথা না কহিয়া, নীচে নামিয়া আসিলেন। বড়বউ মনে মনে হাসিয়া অস্থির হইল।

নিখিল মেজদাদার অত্যাচার দেখিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন এবং ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত, স্ত্রীলোকের গায়ে হস্ত তোলা! বড়বউ নিজের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যে মেজোকর্ত্তার কত অত্যাচার সহ্য করেন, তাহা দেখাইবার জন্য বলিল— ভাই! প্রতিকার আর কি কর্ব্বে, যদি আমার পেটের ছেলেই হতো, ঠাকুর পো! আমিই এই বাড়ীর পাপ হয়েছি, আমার জন্যেই ওরা অমন করে। কোন্ দিন একলা পেয়ে আমাকে মেরে ফেল্‌বে, তার চেয়ে তোমার দাদাকে বলে আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

মধ্যম সহোদরের বিষম ব্যবহারে নিখিল বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। হাজার হউক তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা, বিনা অপরাধে এরূপ ভয়ানক প্রহার করা বড়ই নীচত্বের পরিচায়ক, মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা বধূর অপমানে তিনি যারপর নাই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন। কিন্তু কি করিবেন উভয়দিকই যে তাঁহার সমান; একদিকে মেজো ভাই, অন্যদিকে মাতৃসমা স্নেহ-মমতার আধার বড় বউ। মেজদা যে এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন, গ্রামে থাকিয়া, ছোটলোকের সহবাসে মিশিয়া, নেশা ভাঙ্গ করিয়া, এরূপ চরিত্র নষ্ট করিয়াছেন—তাহা কে জানে? আমি জানিতাম,— তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকেন, অনবরত হরিনাম করেন, ইহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বভাব খুব নির্ম্মল আছে, এখন দেখিতেছি—সবই বিপরীত। বড়দাদার সহ্যগুণ খুব বেশী, তাই কোনও অনর্থ-

পাত করিলেন না, নতুবা এ রাগ কি কেহ চাপিয়া থাকিতে পারে? ধন্য বড়দা, তোমার হৃদয় নিশ্চই দেব-উপাদানে গঠিত, তারপর অম্বিকার প্রতি চাহিয়া অতি বিনীত স্বরে বলিলেন—বউদি! কি কর্ব্বে বল; হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয়?

এতে তোমার কিছু শিক্ষা হলো, এখন উঠ, পাঁচুকে সান্ত্বনা করিয়া কিছু খাবার দাও, ওযে ক্ষুধায় কাতর হয়েছে? এতখানি বেলা হলো দুধের শিশু এখনও কিছু খায় নাই। অম্বিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আর কি হবে ভাই! কপালে যা আছে, তা তো হবেই, এমনি করে মার খেয়ে খেয়েই এক-দিন মারা যেতে হবে দেখছি" বলিয়া অতি কষ্টে পুত্রকে কোলে লইয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নিখিল বুঝিল--মেজদারই সমস্ত দোষ, সে পরম ধার্ম্মিক নিরীহ অমরেন্দ্রকেই সর্ব্বপ্রকারে দোষী সাব্যস্ত করিল। বড় বউয়ের মত অমৃতভাষিনী, সরলতামাখা পুণ্যবতী রমনীর যে কোন দোষ থাকিতে পারে, নিখিল তাহা মনের কোণেও স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে স্বর্গের দেবী মনে করেন, বড় পুণ্য ফলে এমন সর্ব্বংসহা রমনী তাঁহাদের গৃহে প্রাঙ্গন পবিত্র করিতেছেন।

প্রাতঃস্মরণীয় রায়বংশের একান্নবর্ত্তী পবিত্র সংসার ছারখারে দিবার জন্য অম্বিকার এ বিষয় চাতুরী অপরিণামদর্শী সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ যুবক কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নারীজাতি ছল চাতুরী করিয়া; কিরূপ অঘটন ঘটাইতে পারে, কূটবুদ্ধির দ্বারা সোণার সংসার কিরূপে শ্মশানে পরিণত করিতে পারে; ভাই—ভাই ঠাঁই—ঠাই করিয়া যে কিরূপে সুখের সংসারে দুঃখের আগুন জ্বালাইতে পারে—অবোধ, সে দিনকার ছেলে নিখিল, তাহা কিরূপে অবগত হইবে?

নরেন হেন ভ্রাতৃভক্তকে এ বাঘিনী গ্রাস করিয়া বসিয়াছে; উঠিতে বসিতে যখন যাহা করিতে বলিতেছে—তখন তিনি তাহাই করিতেছেন, বামনদাসের মৃত্যুর পর এই সামান্য দিনের মধ্যে এই কালসাপিনী যখন এতদূর করিয়াছে, তখন তাহার অসাধ্য কি আছে? যে নরেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের বিচ্ছেদ এক দণ্ড সহ্য করিতে পারিত না, সেই যখন অম্লানবদনে তাহাদের বিষয়আশয় ফাঁকি দিতে কষ্ট বোধ করিতেছে না, তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর নিখিল হেন চিরপ্রবাসী যুবকই বা এ চতুরতার মর্ম্মভেদ করিবে কিরূপে? সে সম্মুখে যাহা দেখিল—তাহাতে বড়বউকে দেবী না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

আর এক দণ্ডও এ স্থানে থাকা উচিত নয়, যত শীঘ্র হয় দেশ ত্যাগ করা উচিত, যাইবার সময় ছোট বউকে আর এখানে রাখিয়া যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। হয় সে বড়দাদার সংসারে আসিয়া থাকুক; বড় বউদিদির নিকট গৃহিনীপণা শিক্ষা করুক; আর না হয় তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। মেজোদাদা ও মেজবউদিদির ন্যায়

অধার্ম্মিকের সহবাসে থাকিলে সে নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে তাহাদের মত হইবে; কুশিক্ষারগুণে সংসারে একটা ভয়ানক অশান্তি আনিয়া ফেলিলে, ভবিষ্যতে তাহাকে লইয়া সংসার করা দায় হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নিখিল বড়দাদার নিকট গমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ প্রিয় পত্নী অম্বিকার চতুরতার প্রশংসা করিয়া তাহাকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিতেছিল। বাহ্যিক মুখের গম্ভীরতা দেখিলে তাঁহাকে মেজদাদার এই দুর্ব্যবহারে বড়ই দুঃখিত বলিয়া মনে হইবে। নিখিল দাদার নিকট গিয়া বলিল—দাদা! আর বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া কি করিবেন? মেজদাদা যে এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন—তাহা আমি এতদিন জানিতাম না; এক্ষণে আপনি উহার সহবাস ত্যাগ করিয়া বেশ ভালই করিয়াছেন, উহার সহিত আর কোন সংশ্রব রাখা উচিত নয়। আপনি আর উহাকে বাড়ী ঢুকিতে দিবেন না।

নরেন ছোট ভাইয়ের কথায় যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—ভাই! পর চোরকে বরং পারা যায়, ঘর চোরকে কেমন করিয়া পারিয়া উঠিব—হাজার হউক ভাই ত বটে, বাড়ীতে আসিলে কি তাড়াইয়া দেওয়া যায়? আর তোমার বউদি কীল খাইয়া, কীল চুরি করিতে চায়? এখন নয় মারটা একটু বেশী হয়েছে, তাই

চীৎকার করেছিল—সামান্য হলে কোন কথাই বল্‌তো না; অমন হাবাতে বেহুঁস মেয়ে মানুষ কি আর আছে ; অতটা ভাল মানুষ হওয়া ভাল কি ?

নিখিল বলিল—তা বটে কিন্তু কি কর্ব্বে দাদা ! হাতে গড়ে মানুষ করলেই ঐ রকম হয় ? যাহা হউক, আপনি এখন, একটু সাবধানে থাকবেন। আর বল্‌ছিলুম কি, এখনও একমাস হয় নাই—একটা কলেজে চাকুরী লইয়াছি, ইহার মধ্যে কামাই করা ভাল নয়—এইজন্য আজই আমাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে। এখন ছোট বউকে হয়—আপনি এনে রাখুন, আর না হয় আমি আজই সঙ্গে করে নিয়ে যাই—ও সহবাসে আর আমি উহাকে রাখিতে ইচ্ছা করি না; আপনি কি অনুমতি করেন ?

দুইভাইয়ে কথা হইতেছে—এমন সময় অম্বিকা আসিয়া বলিল—ঠাকুর পো, কি বল্‌ছো ?

নরেন ছোট ভ্রাতার অভিপ্রায় সমস্ত স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। অম্বিকা মনে মনে আনন্দিত হইলেও মুখে বলিলেন—তাও কি হয়, কাল এত কষ্ট করে এলে, খাওয়া দাওয়া কিছুই হলো না, আমি ভাল করে রেঁধে দিই, আজ বিশ্রাম করো, কাল তখন যেয়ো ?

নিখিল !—না বউদিদি, তা হবে না, তা হলে নূতন চাকুরীর গোলোযোগ হতে পারে—এখনও এক মাস হয় নাই, এর মধ্যেই কামাই কর্ব্বো।

অম্বিকা। তোমার কি চাকুরী হয়েছে; আহা হোক হোক্, ভগবান করুন—তুমি রাজা হও, ছোটবউ রাণী হোক, —দেখেই সুখ, আমাদের দুখের কপাল ত আর ঘুচবে না, কত মাহিনা হলো ঠাকুর পো?

নিখিল। এখন বেশী নয়, দেড়শ টাকা, কিছু দিন থাকলে আরও বাড়তে পারে!

অম্বিকা। আহা বেশ বেশ, হাজার হোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লেখা পড়া শিখেছো, হবে না কেন? তারপর একটু ন্যাকামীর ভাণ করিয়া ক্রন্দন স্বরে শশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে চখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—আহা! এই সময় যদি ঠাকুর ঠাকুরুণ বেঁচে থাকিতেন, তা. হলে তাঁদের কত আনন্দ! তবে ছোটবউ কি কর্ব্বে?

নিখিল।—তাইত বল্‌ছি বউদি, যদি পার ত তোমার কাছে এনে রাখো, আর না হয় আমি কল্‌কাতায় নিয়ে যাই, তুমি কি বলো?

অম্বিকা। সে আমাদের এখানে থাকবে না, মেজোউবয়ের সহিত তার এক-প্রাণ, এক-জীব; এনে রাখলেও চলে যাবে, কে রোজ রোজ ঝাড়াই ডোমাই ঝগড়া ঝাঁটী কর্ব্বে ভাই! তার চেয়ে তুমি কিছু দিন কাছে নিয়ে রাখো; তার পর না হয় এখানে পাঠিয়ে দিও, তখন মেজোবউয়ের সঙ্গে পিরীত ভেঙ্গে গেলে, এখানে থাকতে পারবে!

নিখিল। যা দেখলুম, তাতে আমি ও সংস্রবে কিছুতেই আর

থাকতে দিব না। মেজদাও যেমন, মেজো বউদিও তেমনি; যেমনি দেব, দেবীও তেমনি; ও সহবাসের শিক্ষা পেলে আমাকে চিরকাল জলতে হবে, আর কাজ নেই বউদি!

অম্বিকা। মরি মরি, লেখা পড়া না শিখলে কি বুদ্ধি-শুদ্ধি পাকা হয়, যা বুঝেছ ভাই—তাই; তাহলে তিনি আবার এক কাটী বাড়া হবেন!

নিখিল বুদ্ধি দোষে অন্ধকারে থাকিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেব সদৃশ মধ্যমভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পবিত্র ছায়া স্পর্শ না করিয়া কেবল পাপিষ্ঠা বড়বধুর কথায় বিশ্বাসকরতঃ তাহাদিগকে বিষ-নয়নে দেখিল, তাহাদিগকে পাপের ও অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিল। হায়! যে মধ্যম-ভ্রাতা নিজের সমস্ত সম্বল, এমন কি সাবিত্রীর সমস্ত অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তাহার এম, এ পাশের খরচ যোগাইল; নরেন্দ্র স্ত্রীর প্ররোচনায় এক কপর্দ্দক প্রদান না করিলেও যিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহার উন্নতির জন্য পথের ভিখারী হইলেন, অবুঝ, অনভিজ্ঞ যুবক! তাহাকেই তুমি ঘৃণা করিলে; পাপী বলিয়া অবহেলায় সে পবিত্র পদে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে না, একবার ভাল করিয়া দেখিলেনা, দোষ কার—গুণ কোথায়? ধিক্ তোমার বিদ্যা শিক্ষায়, এবিদ্যা অপেক্ষা অবিদ্যা যে সহস্র গুণে ভাল? এই অপরিণামদর্শীতা দোষে, এই দেবদেবীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের পাপে, তোমাকে জগতে কিরূপ পাক-চক্রে পড়িতে হইবে, তাহা কি তুমি

একবারও ভাবিলে না, কেবল চতুরার চাতুরীতে; তাহার বাহ্যিক মধুর আলাপে ভুলিয়া ইহপরকাল নষ্ট করিলে?

নিখিল বলিল—বউদিদি! একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ঠিক করিয়া দাও—তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই—কলিকাতায় গিয়া তখন আমার কনিষ্ঠ শ্যালককে পত্র লিখিব। একজন পাকা স্ত্রীলোক না হইলে ত বাসায় থাকা চলিবে না, আমাকে ত কাজ কর্ম্ম করিতে হইবে?

অম্বিকা।—তা ত ঠিক, তার জন্য আর চিন্তা কি; তবে তুমি কি আজ একান্তই যাবে?

নিখিল। হাঁ বউদি, না হলে ক্ষতি হবে, তুমি একজন স্ত্রীলোক দেখ, সে গিন্নীর মত থাকবে, আর ক্ষীরোদাকে দিদা ওবাড়ী থেকে তাকে আনতে বলো; আমি আর ও মুখো হবোনা।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া অম্বিকা পুলকিত চিত্তে বলিল—তোমার জিনিস, তুমি নিয়ে যাবে, তাতে আর দিন ক্ষণ কি? আমি এখনি ছোট বউকে আনিতে ক্ষীরোদকে পাঠাইয়া, আমার মার সন্ধান করছি? বলিয়া বড়বউ গজেন্দ্র গমনে নীচে নামিয়া আসিল।

(১১)

সংসারে কোনরূপ অনর্থপাত হইলে বা কোনরূপ ধাক্কা খাইলে ধর্ম্মভীরু অমর দেবতার শরণাপন্ন হইতেন—ইহা

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। প্রাতঃকালে এমন একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গেল, বিনা দোষে তাহাকে এরূপ একটা মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে হইল দেখিয়া তিনি দামোদরের মন্দিরে গলদশ্রু লোচনে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বড়বধুর স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বলিলেন—প্রভু! বিনা দোষে এ মনস্তাপ, এ অপমান, এপাপের বোঝা কেন আমার মাথায় চাপাইলে ঠাকুর! বড়বউয়ের নিকট ত আমি কোনও অপরাধ করি নাই? বরং তিনি আমাকে কত নির্য্যাতন করিতেছেন, আমায় কত নিন্দা করিতেছেন—সে বিষয়ের জন্য এক দিনও একটি কথা কই নাই, তবে এ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে কেন দিলে প্রভু! ছোট ভাই নিখিল কি মনে করিবে? সে বুঝিবে—সমস্ত দোষই আমার, সে বুঝুক, মনে করুক তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু হৃদয় দেবতা! তুমি সদয় হও, বড়বধূর মতিপরিবর্ত্তন কর, তাঁহাকে সুপথে চালিত কর, আর আমার পাঁচুকে দীর্ঘজীবি কর! অমরের ভয় পাছে মা-বাপের পাপে বংশের দুলাল পাঁচুর কোন অমঙ্গল হয়।

অমর বউদিদির চতুরতায় বিষম ব্যথা পাইয়া গৃহ গমন করেন নাই—বরাবর দেবতার স্থানে আসিয়াছেন। এদিকে ক্ষীরোদা ছোটবাবুর অভিপ্রায় জানাইয়া সরযুকে লইয়া গিয়াছে। সকালের ট্রেনেই তাঁহারা রওনা হইবেন। কাজেই স্বামী গৃহে না থাকিলেও সাবিত্রী ছোট বউকে পাঠাইতে কোন আপত্তি করিলেন না। তবে ঠাকুরপো এত দিনের পর বাড়ীতে আসিল;

সমস্ত রাত্রি ওবাড়ীতে কাটাইল কিন্তু আমাদের সহিত একবার দেখা করিবার অবকাশ ও কি তাহার হইল না, আমরা কি করিয়াছি? মনে ত পড়ে না—ভগবান, আমাদের দ্বারা তাহার কোনও মন্দ কার্য্য হইয়াছে!

তিনি বাড়ী নাই—পাছে গাড়ী ফেল হইয়া যায়, এই জন্য সরযুকে পাঠাইলাম, আর যাহার জিনিষ তাহাকে দিয়াছি—ইহাতে বোধ হয় তিনি আমার কোন দোষ লইবেন না; যদি লয়েন—পায়ে ধরিয়া বুঝাইব। সাবিত্রী ছোটবউকে পাঠাইয়া দিয়া বহুদিনের একত্র সহবাস জন্য হৃদয়ে একটা বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার বিষম কষ্ট অনুভব করত বিরস বদনে দাওয়ায় বসিয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রিয় বিদায়ে চক্ষের জল ফেলাটা দোষের হইলেও তিনি তাহা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় অমর বহির্দরজার অর্গলমুক্ত আবদ্ধ কপাট ঠেলিয়া গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং সাবিত্রীকে ঐরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—একি, তুমি এখনও অমন করে বসে আছ, রন্ধনাদির কোন যোগাড় কর নাই; দেখছি যেন কাঁদ কাঁদ ভাব, ব্যাপার কি, কি হয়েছে? সকালবেলা তোমারও কি আমার মত দশা হয়েছে? সাবিত্রী কাঁদিয়া বলিলেন—ঠাকুপো, ছোট বউকে নিয়ে চলে গিয়েছে!

অমর। তা বেশ হয়েছে, যার জিনিষ সে নিয়ে গিয়েছে, তার জন্য কান্না কেন; সে কি তবে বাড়ীতে এসেছিলো?

সাবিত্রী। না বাড়ীতে আসে নাই; ক্ষীরোদকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং তাহার সহিত সরযুকে পাঠাইয়া দিতে বলেছিল। এই গাড়ীতেই তারা কলিকাতায় রওনা হয়েছে, সেই জন্য তোমার অপেক্ষা কর্ত্তে পারলাম না, পাছে গাড়ী ফেল হয়।

অমর। তা বেশ করেছো। তবে বাবু একবার বাড়ীতেও আস্‌তে পারলেন না। বড়বউ তাকে কাম্‌ড়েছে দেখছি! আমাকেও আজ সকালে এমন কাম্‌ড়েছিল যে এখনও জ্বালা থামেনি, বলিয়া প্রাঃতকালের সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিলেন। সাবিত্রী বড়বউয়ের বিষম চাতুরীর বিষয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বিনা দোষে তাঁহার দেবচরিত্র স্বামীকে অপমান করায় দুঃখে-ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমরেন্দ্র স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—ছোটবউ চলিয়া গেছেন বলে মনে একটু কষ্ট হতে পারে, সেটা বহুদিন একত্র থাক্‌লেই হয়, তা'বলে একবারে অমন করে কান্নাকাটী করা ত ভাল নয়—এতে যে তাদের অকল্যাণ হবে?

সাবিত্রী। তা জানি, তবে কি কর্ব্বো কিছুতেই চক্ষের জল রাখ্‌তে পারছিনা, শুধু ছোটবউ চলে গেছে বলে নয়,—স্ত্রী স্বামীর কাছে গেছে, এর জন্য আর কষ্ট কি বরং আনন্দেরই কথা; আহা, এতদিন ঠাকুরপো পড়ো ছিল, এখন স্ত্রী নিয়ে সংসারী হলো, এ অপেক্ষা সুখ আর কি আছে? তবে সে যে একবার দেখা করতে এলো না, আমরা এত করে মলুম—এই দুঃখ; বামুন দিদি বলেন—তোরা দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছিলি!

অমর জিহ্বা কাটিয়া অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন—মেজবউ, তুমি লোকের কথা শুনে অমন কথা আর মুখে এনো না। মার পেটের ভাইকে লেখাপড়ার খরচ দিয়েছি, এ আর বেশী কথা কি? নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ত করি নাই; কর্ত্তব্য বোধে করেছি, তারপর সে লেখাপড়া শিখেছে—এখন তার কর্ত্তব্য তার কাছে। রোজগার করে সে আমাদের টাকা দেবে, খাওয়াবে পরাবে বলে ত দিই নাই, এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর—তারা সুখী হউক,—আমাদের দিনকটা সুখে-দুঃখে এক রকম করে চলে যাবেই, তার জন্য ভেবো না। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে অনাটন না হইলেই হলো, এই ত আমি বুঝি, তার জন্য যেন পরের মুখ চাইতে না হয়।

সাবিত্রী। তাইত দরকার; পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল, এতে যদি এক সন্ধে যোটে—সেও সুখের!

অমর। তা যদি ভাল, তবে দুঃখ করছো কেন, মানুষের ক্ষমতা কি? যা হয় সমস্ত ভগবানের ইচ্ছায় হয়; আমরা করেছি, তাহাকে লেখাপড়ার খরচ দিয়েছি,—একথা বলাই পাপ, আমাদের ক্ষমতা কি? সমস্তই তাঁর ইচ্ছায়, যা হবে—হয়েছে, এবং হচ্ছে সবেরই কর্ত্তা তিনি, মানুষ নিমিত্ত মাত্র, তার জন্য অহঙ্কার করা ভাল নয়।

সাবিত্রী স্বামীর উপদেশপূর্ণ বাক্য শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—শুন্‌লাম, কোন্ কলেজে ঠাকুরপোর দেড়শত টাকা মাহিনার চাকুরী হয়েছে।

অমর সরল প্রাণে খুব আনন্দের সহিত বলিলেন—আহা, হোক হোক, বড় কষ্টে প্রাণপাত করে লেখাপড়া শিখেছে; ভগবান তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমরাত বংশের মান বাড়াতে পারি নাই, বরং কমিয়ে ফেল্‌ছি, দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে সে এইবার রায়বংশের লুপ্তপ্রায় বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুক—এই প্রার্থনা করি।

স্বামীর হৃদয় কিছুতেই টলে না, মানে-অপমানে সমান ভাব, কিছুতেই রাগের উদ্রেক হয় না। শুধু আজ বলিয়া নয়—এমন কতবার বড়বউ তাঁহাকে ঝাঁটা লইয়া মারিতে আসিয়াছেন—তিনি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে সরিয়া গিয়াছেন—তথাপি বড়বধূকে কখনও কোন অপমান-সূচক কথা বলেন নাই। পাঁচুকে লইয়া কতবার সম্বন্ধ ছাড়া কথা বলিয়াছেন—তথাপি সেই এক ভাব, বলেন—বউদির মাথা খারাপ হয়েছে, পাগল না হলে কি আর অমন কথা বলে? স্বামীর এই অপূর্ব্ব দেবত্বভাব দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, প্রাণপণে তাঁহার চরিত্র অনুকরণ করিতে একদিনও পশ্চাৎ পদ হইতেন না। তবে বড়বউ নাকি একেবারে নির্ম্মম হইয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন—তাই সময়ে সময়ে প্রাণ ফাটা দুঃখে হটাৎ দুইএক কথা বাহির হইয়া পড়ে—হায়! আজ প্রাতঃকালে যে কাণ্ডটী করিলেন, তাহা কি মানুষে করিতে পারে, আমরা তাঁহার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি?

পত্নীকে তখনও সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমর বলিলেন—সাবিত্রী, আর বসে থেকো না, বেলা অনেক হয়েছে,

এখনি অভুক্ত সকলে এসে পড়্‌বে! এ অবস্থাতেও অমর গুপ্ত-ভাবে পাড়ার অনেক গরীব দুঃখীকে প্রতিপালন করেন। "হাঁ, এই যাই" বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া বলিলেন—আজ যেন রান্না খাওয়ায় গা লাগ্‌ছে না?

অমর পত্নীকে আরও উৎসাহ দিয়া বলিলেন—তা ত হতেই পারে, ছোট বউমা তোমার ডান হাত ছিলেন, মা আমার খুব লক্ষ্মী মেয়ে, এখন স্বামীর সংসার উজ্জ্বল করুন—আমাদের দেখে সুখ হবে।

তার পর রন্ধনাদি হইলে, অমর পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া দামোদরের ভোগ দিলেন! অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ অভুক্ত লোকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে, দেখিয়া অমর খুব আনন্দিত হইলেন। পতি পত্নীতে তাহাদের সেবা করিয়া, দরিদ্র নারায়ণে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া নিজেরা আহারাদি সমাপন করিলেন। অমর আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণে হরিসভায় বসিয়া ভাগবৎ পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন—পাঁচু ক্ষীরোদার সহিত ঘাটে আসিয়া "কাকা যাব, কাকী যাব" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ক্ষীরোদা মনে করিয়াছিল—মেজো কর্ত্তা আজ যেরূপ অপমান হইয়েছে, তাহাতে বোধ হয়, আজ আর সাড়া দিবে না, কিন্তু অমর ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া ডাকিলেন—বাবা পাঁচু! এইযে আমি—এসো না। কাকার সেই প্রাণের আহ্বান শুনিয়া পাঁচু উঠি-পড়ি করিয়া পুকুর পাড় দিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কাকার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেবহৃদয় শিশুত

কুটিলতার ধার ধারে না, যেখানে আদর-যত্ন পায়, সেই খানেই সে দৌড়িয়া আসে ; আর সংসারের কুটিলতা শূন্য সরল প্রাণ অমর তাহার বংশ-দুলালকে হৃদয় মধ্যে আকুড়িয়া রাখিতে পারিলেই বাঁচেন। ইহাতে বড়বধূ তাঁকে যতই গালাগালি দিন, তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিবেন। সকাল বেলায় তত অনর্থপাতেও অম্বিকার আশা মিটে নাই; সেই ভয়ানক পাপ করিয়াও তাঁহার প্রাণে একটুও অনুতাপ আসে নাই; এক্ষণে আবার পাঁচুকে কোলে লইবার জন্য অমরকে নানারূপে পুরস্কৃত করিলেন—অমর তথাপি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়িলেন না।

সন্ধ্যার সময় প্রাণের পাঁচুকে বাড়ীর দোর গোড়ায় ক্ষীরোদাকে ডাকিয়া ঢুকাইয়া দিয়া আনন্দে গৃহে ফিরিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলেন। স্ত্রৈণ্য নরেন্দ্র স্ত্রীর জন্য কিছু বলিতে বা করিতে পারিতেন না কিন্তু ভ্রাতার এই সরল স্বভাব দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতেন—অমর মানুষ না দেবতা!

চতুরা অম্বিকা বড় আনন্দিতা। আজ তিনি রণজয়ী হইয়াছেন, মেজো দেবরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছেন, ছোট দেবরকে হস্তগত করিয়া তাহাকে কলের পুতুলের মত চালিত করিয়াছেন; এমন কি ছোট দেবর এত দিনের পর মেজোদের ছায়া স্পর্শ করিল না, অধিকন্তু জোর করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া গেল। বহুদিনের সঙ্গের সাথী, এক বৃন্তে দুইটী ফুল, যাহারা প্রাণে প্রাণে এতদিন আবদ্ধ হইয়া তাহার চক্ষুশূল হইয়াছিল, আজ কৌশলে পৃথক করিয়া দিয়া সাবিত্রীর প্রাণে বিষম

কষ্ট দিতে পারিয়াছেন—সে আজ সমস্তদিন যুথবিহীনা হরিণীর ন্যায় মনমরা হইয়া রহিয়াছে, শুনিয়া অম্বিকার প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। আহারাদির পর শয়নের সময় হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিলেন— দেখ্‌লে কি রকম খেলা খেল্‌লাম, পুরুষের মাথায় কি এ বুদ্ধি আসে? বলিয়া তাহার সমস্ত কৌশল বিবৃত করিয়া বলিলেন— দেখো, অত লেখাপড়াওলা ছোট্‌ঠাকুরপোকেও তাক্‌ লাগাইয়া দিয়াছি, স্বীকার করিতে হইয়াছে—মেজো ঠাকুরপোরই সমস্ত দোষ, আমি নিরপরাধ! এইজন্য ছোটকর্ত্তা তাদের সঙ্গে কথাও কইলে না, মাগ্‌কে নিয়ে চলে গেলো, আর তোমাকে তার অংশ বিক্রয় করিয়া কল্‌কাতা বাস করবার কথা বলে গেলো, এ রকম ভাণ কি সহজ বুদ্ধিতে আসে?

নরেন্দ্র স্ত্রীর চতুরতা দেখিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— বড়বউ কাজ বড় ভাল হলো না, এর পরিণাম বড় খারাপ, আমি তখন বুঝ্‌তে পারি নাই, যে তুমি এক চাল্‌ চেলেছ, তবে সন্দেহ হয়েছিল। অমরের হৃদয়, তার গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্মে মতি ত আমি জানি; তবে মন নয় মতিভ্রম, আর সম্প্রতি গৃহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে বলেই—ভাল বুঝতে পারলেন না, নিখিলও তলাইয়া বুঝিল না, সে অনেক দিন বাড়ী ছাড়া, অমরের ধর্ম্মভাব ত সে এত দিন দেখে নাই; না খাইয়া পরকে খাওয়ায়, আপনারা অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া পরের সেবা করে; স্ত্রীর সমস্ত গহনা নষ্ট করিয়া ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগায়, তাহাও আবার নিজের নাম করিয়া দেন নাই; সমস্ত

টাকা আমার নাম করিয়াই পাঠাইয়াছে। আমার অপমান হবে বলে ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করে নাই, সে বলে— বড়দা থাকিতে আমি কে? তিনি বড়, সকল বিষয় তাঁর নামেই করা উচিত। আহা, এমন ভাই কি হয়? নিখিল তুই একদিন তাহার ব্যবহার দেখিলে আর তোমার চাতুরী বুঝিতে বাকী থাক্‌তো না, তাই বলি—তুমি যা করছো, এর পরিণাম ভাল নয়, আমার ভয় হয়, পাছে এই পাপে পাঁচুর কোনও অমঙ্গল হয়।

অম্বিকা।—অমঙ্গল হবে কেন, সে কার ধার করে খেয়েছে? দেখ, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অমন না করলে চলেনা। যদি আমি তোমার পাছু পাছু অমন করে লেগে না থাক্‌তুম, তাহলে আজ তোমার কি হতো জান? ঐ মেজোকর্ত্তাই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তো, আমার দুধের বাছাকে পথে বসাতো, ছোট কর্ত্তাকে হাত করে, তোমাকে বাসচ্যুত করতো? ওর ঐ বাবা বাবা করে পাঁচুকে কোলে করা, ওসব মৌখিক, ভিতরে ওর বিষের ছুরী তা কি তুমি জান? ও যে খোকাকে কোলে নিয়ে আদর করে— দেখ্‌লে আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়। কখন যে কি কর্ব্বে, আদর করে বাছার আমার মুখে কি দিবে, তার ঠিক কি? তুমি যেমন সরল—জগতের সকলকেই বুঝি সেই রকম মনে কর? এখন যদি ছোটকর্ত্তাকে হাত করে, জমিদারদের সহিত মিছে মামলা-মকর্দ্দমা বিষয় এবং তাহাদের ফাঁকি দিবার কথা সে জান্‌তে পারে, তাহা হইলে কি হবে বল দেখি?

নরেন্দ্র কথা কহিলেন না। তিনি সাপিনীর দংশন বিষে জর জর, মোহ্-মদিরা পানে আত্মহারা, একেবারে চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ; স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনিও পুত্র ক্রোড়ে মনের সুখে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

নিখিলেন্দ্র স্ত্রীকে লইয়া প্রায় এক বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। শ্যামার মা তাঁহাদের গৃহ কর্ত্রীরূপে আজ এক বৎসর কলিকাতাতেই আছে। সরযূ বালিকা, তাই সংসারের যাবতীয় ভার তাহার উপর ন্যস্ত। নিখিলেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া শ্যালক রামধনকে পত্র লিখিয়া দেশ হইতে আনাইয়াছেন। নিখিল তাহাকে কেবল গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন নাই, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন কিন্তু পাড়া-গাঁয়ের যুবক আজব-সহর কলিকাতায় আসিয়া লেখা পড়ায় তত মন দেয় না, স্কুলে নাম মাত্র যায়—পড়া হয় না, বেঞ্চের উপর দাঁড়ায়, শিক্ষকের তাড়না খায়, তথাপি ভাল করিয়া পাঠ অভ্যাস করে না।

ছাত্রকে তাড়না করিবার প্রথা স্কুলে তত না থাকিলেও নিখিলের শ্যালক বলিয়া শিক্ষকগণ একটু আধটু চড়-চাপড় দিতেন,

তাহার প্রতি একটু নেক্ নজরও রাখিতেন, কারণ নিখিল এক সময় তাহাদের বন্ধু ছিল। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া তাহার শ্যালক, যদি মূর্খ হয়, তবে নিখিল কি বলিবে? কিন্তু যে লেখাপড়া শিখিবে না, হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাকে শিখান যায় না, ঔষধ হইলেও না হয় গিলাইয়া দেওয়া যাইত কিন্তু ইহা যে পরিশ্রম বিনা উপার্জ্জন হয় না?

নিখিলেন্দ্রের এমন সময় নাই যে তিনি শ্যালকের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া তাহার শিক্ষার ভার লইবেন। তিনি এখন কলিকাতার মধ্যে একজন গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক, বড় কলেজের অধ্যাপক, তাহার উপর সকালে বিকালে তাঁহাকে দুইটী ছাত্র পড়াইতে হয়, কাজেই তাঁহার সময় নাই বলিলেই হয়। তিনি কোনও বন্ধুকে রামধনের শিক্ষার ভার দিয়াছেন, সকালে বিকালে তাঁহার নিকট যাইলেই তিনি সাদরে তাহাকে শিক্ষাদান করেন কিন্তু সে যায় না। গ্রাম্য বালক কলিকাতার মত এমন শোভা কখনও দেখে নাই। এত গাড়ী ঘোড়া, এত বড় বড় বাড়ী, এমন সুপ্রশস্ত গ্যাসালোক সজ্জিত সুন্দর রাস্তা দেখিয়া তাহার ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলা ঠাকুরমার মুখে সে ইন্দ্রের অমরাপুরীর গল্প শুনিত, এখন ভাবে—ইহাই কি সেই দেশ, আর অট্টালিকা উপরিভাগে দণ্ডায়মানা সুসজ্জিতা রমণীগণই কি স্বর্গ-বিদ্যাধরী? যুবক প্রথম প্রথম জোড়াসাঁকোর মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া অবাক হইয়া এদিক ওদিক দেখিত, কখন বা একদৃষ্টে বারান্দার প্রতি চাহিয়া থাকিত, তাহার চক্ষের পলক

পড়িত না। এইজন্য একদিন তাহাদের বাসার পাশের একজন লোক তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, নতুবা সে সেই দিনই গাড়ী চাপা পড়িয়া চিরজীবনের জন্য দেখার সাধ মিটাইয়া লইত।

রামধন সেই দিন হইতে আর বড় রাস্তায় আসে না, তাহাদের বাস-গৃহের ছাদের উপর হইতেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে। যদি কোনদিন একান্ত বাধা পায়, সুন্দরীদের দেখিতে বা তাহাদের গান শুনিতে না পায়, তাহা হইলে সেদিন বড় রাস্তার উপর আসিয়া কোন দোকানে আশ্রয় লয়। তাহাদের বাড়ীর নিকট বড় রাস্তার ধারে জনৈক হিন্দুস্থানীর সহিত সে খুব মেশামিশি করিয়াছিল, ঠিক রাস্তার উপরেই ঐ হিন্দুস্থানীর পান বিড়ীর দোকান ছিল।

রামধন আহারাদি করিয়া বই লইয়া স্কুলে যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হয় কিন্তু কোন দিন ইচ্ছা হইলে স্কুলে যায়, কোন দিন যায় না, ঐ দোকানে সমস্ত দিন কাটাইয়া ঠিক ছুটীর সময়ে বাড়ী আসে। তাহার দিদি সরযূও ভ্রাতা স্কুল হইতে পড়িয়া আসিল, মার পেটের ভাই, তাহার ত আর কেহ নাই, আদর করিয়া জল খাবার দেয়, কোন আবদার করিলে দুই চারি আনা পয়সা না দিয়াও থাকিতে পারে না। সবে মাত্র ঐ ভাইটী ছাড়া তাহার তিনকুলে আর কেহই নাই; এত দিন জ্ঞাতি খুড়া খুড়ীর নিকট মানুষ হইতেছিল, এখন কাছে রাখিয়া সরযূ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাইটী লেখাপড়াও শিখিতেছে,

প্রত্যহ বই বগলে করিয়া যায় আসে, ইহাতেও কি শিক্ষা হতেছে না? সরযূও গ্রাম্য-বালিকা, লেখাপড়া সম্বন্ধে তাহারও জ্ঞান ঐরূপ, আর যখন তাঁহার বিদ্বান স্বামী তাহাকে দেখিতেছে, তখন তাহার বিদ্যা না হইয়া যায় কি?

রামধনের বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর, গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িত, ইংরাজীর প্রথম পুস্তকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, কলিকাতায় আসিয়া সে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আট নয় বৎসরের বালকগণ পড়িয়া থাকে, অতবড় একটা ধেড়ে ছেলেকে ক্লাসে দেখিয়া সকলেই ঠাট্টা করিত; ধেড়ে শালকী বলিয়া ডাকিত। এই জন্য সে লজ্জায় স্কুলে যাইত না, লেখাপড়া প্রভৃতিতে যে লজ্জা করিতে নাই, তাহা সে বুঝিত না। বয়সও তাহার শিক্ষা বিষয়ে একটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া সে একেবারে হাল্ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তবে যদি সে পরিশ্রম করিত, লজ্জা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার যেরূপ যোগাযোগ ছিল এবং তাহার বোধশক্তি যেরূপ প্রখর ছিল, তাহাতে সে সত্বরই উন্নতি করিতে পারিত। গ্রামে থাকিয়া বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, কোনও প্রকার সাহায্য পায় নাই, তাহাতে আর হইয়াছে কি? কিন্তু সে শিক্ষকগণের এত চেষ্টাতেও বাগ্ মানিল না, স্কুলে যাইতে পারিল না, তবে লেখাপড়া হইবে কিসে? চেষ্টা বা পরিশ্রম বিনা কেহ কি কখন বিদ্বান হইতে পারিয়াছে, দেবী ভারতীর কৃপা লাভ করিয়াছে?

যুবক লেখাপড়া না করিলেও, স্কুলে না যাইয়া দোকানে আড্ডা দিলেও সে ঐ পানওয়ালা ছাড়া আর কাহারও সহিত মিশিত না, কোন প্রকার চরিত্রহীনের কার্য্য করিত না, পাড়া গাঁয়ের যুবক কি না, যার তার সহিত মিশিতে ভয় পাইত, আর পয়সাও তত ছিল না, এই জন্য তাহার চরিত্র সম্বন্ধে দোষ দিবার কোন কারণ নাই।

সরযু এতদিন পরে স্বামীর সোহাগে বেশ মনের সুখে আছে, নিখিল তাহাকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন। নিখিল এতবড় শিক্ষিত এবং তাঁহার স্ত্রী বিদুষী নয় বলিয়া যে একটা ঘৃণার উদ্রেক হওয়া, তাহা তাঁহার হয় নাই। সরযু লেখাপড়া জানিত না, নিখিল তাহাকে একটু একটু করিয়া যতটুকু দরকার লেখাপড়া শিখাইতেছেন,—সরযু মাষ্টার মহাশয়ের নিকট মনোযোগ সহ অধ্যয়ন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছে, সকল বই এখন সে পড়িতে পারে; লিখিতেও আট্‌কায় না, সংসারের যাবতীয় হিসাব পত্র সে নিজেই রাখে—নিজেই দেখে।

শ্যামার মা কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম বেশ আনন্দে ছিল কিন্তু সরযু যে দিন হইতে নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছে—সেই দিন হইতেই তাহার কেমন যেন একটা আড়ু-আড়ু ছাড়ু-ছাড়ু, মনভাঙ্গা ভাব আসিয়াছে। নিখিল তাহাকে খাওয়া-পরা, বার ব্রতের খরচ বাদে প্রণামী স্বরূপ মাসিক দশ টাকা করিয়া দেন। আগে তাহার ইহাতে খুব

আনন্দ ছিল—নিখিল ও সরযুকে দুইবেলা প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিত, বাবা! আমার যেমন স্বামী পুত্তুর নাই—তেমনি তুমি বোধ হয় আমার এককালে পুত্র ছিলে—তাই বিধবাকে বাঁচিয়ে রেখেছো। তখন শ্যামার মার এক দৌহিত্র আসিত—সে কলিকাতায় আসিয়া কখন একমাস, কখন দুইমাস ইহাদের অন্ন ধ্বংস করিত, তারপর বাড়ী যাইবার সময় সরযুর অসাক্ষাতে, টাকাকড়ি ছাড়া বৃহৎ একটী মোট করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। কিন্তু যখন সরযুর চক্ষু ফুটিল—যখন সে স্বামীর কৃপায় সংসারের ভার পাইয়া, খরচের হিসাব নিকাশ করিতে লাগিল—সেইদিন হইতেই শ্যামার মা সুর ধরিল—আর আমি বেশী দিন থাকবো না মা; মেয়েটা নানারোগে জড়িয়ে পড়েছে—ফটকেটাও তেমন চালাক নয় (দৌহিত্রটীর নাম ফটিক) আর কুলীনের ঘরের জামাই ত জান, সে বৎসরান্তে একবার আসে কি না সন্দেহ। তুমি এখন মা বেশ জানাশুনা হয়েছো, ঘর সংসার বুঝতে পেরেছো—আর আমার দরকার কি?

সরযু সব বুঝিতেন—শ্যামার মার মনক্ষুণ্ণের কারণ কি, তাহাও জানিতেন। তথাপি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক—মান্যার্হা, যাহাতে আরও কিছুদিন থাকেন, তাহার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—মাসী মা! তোমার হাতেই আমরা মানুষ হয়েছি, আমাদের তুমি অনেক করেছো—তোমাকে আমরা ছেড়ে দিব না। সরযু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতেন না, দোষ দেখিলেও চুপ করিয়া যাইতেন—নিজে সাবধান হইতেন।

শ্যামার মা পাকা মেয়ে মানুষ। মনোগত ইচ্ছা না হইলেও মুখে সে প্রায়ই না থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, দেশে শ্যামা আমার একলা থাকে, কটুকে কথা শুনে না, কেমন করিয়া থাকি বল মা? ইত্যাদি কত চালাকি করিত, মনে মনে কিন্তু বলিত—আমি এখন যা উপায় কচ্ছি, তা একটা মন্দোর মাহিনা, এ কাজ কি ছাড়া যায়! নিখিলও শ্যামার মাকে সমভাবে মান্য করিতেন—কিছু কিছু চরা করে, স্ত্রীর মুখে শুনিয়াও কোনও কথা বলিতেন না, বরং সরযূকে বলিতেন—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, তুমি একটু সাবধান হয়ে থেকো, তা হলেই আর কিছু কর্ত্তে পারবে না। নিখিল প্রতি বৎসর পূজার সময়—তাহার মেয়ে শ্যামা ও দৌহিত্র কটিককে কাপড় ও পার্ব্বনী দিতেন। এত চুরীতেও নিখিল নিজের কর্ত্তব্য বজায় রাখিতে ত্রুটী করিতেন না,—সরযূও তাহাতে বাধা দিতেন না।

স্বামী সোহাগে সরযূ বেশ সুখে আছে, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার দৈহিক পরিবর্ত্তন খুব বেশী হইয়াছে। পাড়া গাঁয়ের মেয়ে এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে, কলের জল ও বালাম চাউলের অন্ন ভোজনে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরযূ ত সুন্দরী ছিলেনই, তার উপর স্বামীর আদর ভালবাসায়, অবস্থার সচ্ছলতায়, এবং যশোভাগ্যের বাহুল্যতায়, তাহার রুগ্ন শরীর দিন দিন শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মনের স্ফূর্ত্তিই যে স্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায় —যেখানে আনন্দ, সেই খানেই স্বাস্থ্য—সেইখানেই সম্পদ!

এত আনন্দের মধ্যে থাকিয়াও আর কাহার জন্য না হউক, মাতৃসমা মেজ্‌দির জন্য, তাঁহার জীবনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সাবিত্রীর জন্য সময়ে সময়ে সরযুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। যখন সেই দেবীমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়পটে আসিয়া উঁকি মারিত, যখন সাবিত্রীর সেই আপন-করা, সোহাগভরা "ছোট্‌কী" সম্বোধন মনে পড়িত, তখন শোকে দুঃখে সরযু অধীরা হইয়া পড়িত। আজ এক বৎসর হইল, সেই দেবীর পদতল ছাড়িয়া আসিয়াছি. সে প্রাণের দিদিকে আজ একবৎসর দেখি নাই, নাজানি তিনি আমার জন্য কত ভাবনাই ভাব্‌ছেন্। সরযুর চারিদিকেই সুখ—কেবল এই দুঃখটি যেদিন তাঁহার প্রাণকে মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিত, সরযু সেইদিনই স্বামীকে একবার মেজ্‌দির ও মেজো-ঠাকুরের সংবাদ লইতে বলিতেন। বড়দি বা বড় ভাসুরের কোনও কথা বলিতেন না, তবে পাঁচু মেজদির কাছে যায় কি না, বড়দি তাহাকে আটক করে কি না—তাহা জানিবার বড় ইচ্ছা হইত।

সরযু স্বামী সকাশে আসিয়া বড় ভাসুর ও বড় যায়ের গুণা-গুণ সমস্ত বলিয়া দিয়াছেন এবং মেজোবা ও মেজো ভাসুর যে দেবহৃদয়, অমন মানুষ যে আর হয় না, তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অমর যে শিবতুল্য, ধার্ম্মিকের চূড়ামণি এবং সাবিত্রী যে সাক্ষাৎ ভগবতী, তাহা এতদিনে নিখিলের বিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহার যাবতীয় পাঠের খরচ মেজঠাকুর মেজ্‌দির গহনা বিক্রয় করিয়া যোগাইয়াছেন—অথচ

নিজের নাম করেন নাই—দাদার নাম দিয়া মনিঅর্ডার করিয়া-দিয়াছেন। পাছে বড় দাদার মান্যের কোনও ত্রুটী হয়—পাছে লোকে জানিতে পারে যে নরেন্দ্র ছোট ভাইগুলোকে ফাঁকি দিতেছে—বিষয়ের এক পয়সাও দেয় না। তিনি বলেন—দাদার কাজ দাদা করুন; আমার কাজ আমি করি—আহা! এমন হৃদয় কি মানুষের হয়—এত স্বার্থ ত্যাগ কি মানুষ করিতে পারে? সরযু বলিয়াছেন—নিজেরা না খাইয়া পাড়ার মধ্যে গরীব দুঃখীকে কেবল মেজোঠাকুরই খাওয়ান, বড় ঠাকুরের ঘর সারাদিনই বন্ধ থাকে। কোন রোগীকে ঔষধ দেওয়া, সেবা করা, মেজো ঠাকুর প্রাণান্তেও ছাড়েন না। মেজদিও স্বামীর স্ত্রী—এসকল বিষয়ে আদৌ কষ্ট বোধ করেন না। সরযুর কথায় এখন নিখিল নিজের দোষ বুঝিয়াছেন, তাই প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলেন—মরি, মরি! এমন মেজদাকে আমি অগ্রাহ্য করিয়াছি,—ঘৃণায় তাঁহার সহিত দেখা করি নাই! হায় হায়, আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি। সেদিনকার ঘটনা সরযু জানে না, শুনেও নাই। এখন বোধ হইতেছে—সে ঘটনা নিশ্চয়ই বড় বউয়ের কারসাজী, কুটীলার ভীষণ কুটিলতা, চতুরার মহা-চাতুরী। সরল-হৃদয় দেবকল্প মেজদা, সে চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া হতভম্ব হইয়া শুষ্কমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন,—আমি তাঁহারই বদ্‌মায়েসী বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ কত ধিক্কার দিলাম। হায়! যদি তিনি সে দোষে দোষী না হন, তাহা হইলে সে দেবহৃদয়ে কত

আঘাত লাগিয়াছে, আর আমার প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ বিসদৃশ হইয়াছে! ওঃ আমি কি অকৃতজ্ঞ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

নিখিল সময়ে সময়ে এইরূপ ভাবেন্। এখন রাক্ষসী বড় বধূর প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ জন্মিয়াছে—আর তাঁহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন না। এবং দেশে যাইয়া মেজ্দার নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন—তাই লজ্জায় আর দেশে যাইবার কথাও মুখে আনেন না। কলিকাতায় আসিয়া নিজের খরচ বাদ যাহা কিছু বাঁচিত, নিখিল বড় দাদাকে পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু যখন সরযুর মুখে তাঁহাদের গুণের কথা শুনিলেন—আমার মা যখন আব্ছা আব্ছা, না বলি—না বলি করিয়াও যখন তাঁহাদের গুণের কথা নিখিলের কাছে বলিয়া ফেলিল—তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল—বড়বউ কালসাপিনী, তাহার বিষেই তাহাদের এমন সুখের সংসারটা ছারখার হইয়াছে।

বহুদিন হইল—নিখিল বড়দাদাকে টাকা পাঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। একে কলিকাতার খরচ, তায় নিখিল যে কলেজে অধ্যাপনা করিতেন—সেই কলেজের অধ্যক্ষের সহিত ঝগড়া করিয়া অন্য কলেজে যাওয়ায় বেতন কিছু কম হইয়াছে। ইহাতেই নিখিল বাধ্য হইয়া বড় দাদাকে টাকা পাঠান বন্ধ করিয়াছেন, সংসারের সংকুলান না হইলে ত আর টাকা পাঠান যায় না! আগে ত আপনাকে রাখিতে হইবে, তার পর ত আত্মীয়-স্বজন। নিখিল এখন নিজের খরচই চালাইতে

পারিতেছেন না, বড়ই টানাটানি পড়িয়াছে—বুঝি আর মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না।

রামধনের পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে, দাসদাসী রাখাও আর ক্ষমতায় কুলাইতেছে না, কাজেই সরযূ এখন সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন,—বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা প্রভৃতি বাহিরের সমস্ত কাজ সরযূ একাই সমাধা করেন, তাহার জন্য তিনি একদিনের জন্য স্বামীর নিকট কোন অনুযোগ প্রকাশ করেন না। নিখিল বরং বলেন—তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু কি কর্ব্বো, অন্য স্থানে ভাল একটা কাজ যোগাড় কর্ত্তে না পারলে আর এ কষ্ট দূর হচ্ছে না, আমি খুব চেষ্টায় আছি। সরযূ স্বামীকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া বলিতেন—দেখ, তুমি বৃথা দুঃখ কর কেন? তোমার পায়ের তলায় থেকে, একবেলা খেয়ে—একখানা মোটা কাপড় পরে, এওং বজায় রাখ্‌তে পারলে আমি খুব সুখে থাক্‌বো. এখন ত আমি রাণীর মত আছি, তবে তুমি আমার জন্য ভাবছো কেন? আমি কি কখন খেটে খাই নি যে, তুমি তার জন্য কষ্ট বোধ করছো? যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি ভাবে চালাতে হবে। যদি তেমন বোধ কর, তা'হলে শ্যামার মাকেও ছাড়িয়া দাও, আমি একাকীই সমস্ত চালাতে পারবো।

নিখিল। যেরূপ টানাটানি তাতে বোধ হয় তাই কর্ত্তে হবে, কিন্তু শ্যামার মার মুখের উপর আমি সে কথা বল্‌তে পারবো না—আর সেটা বলাও ভাল দেখায় না, তার চেয়ে

তোমাদের সকলকে একবার দেশে পাঠিয়ে দিই, তাহা হইলে শ্যামার মাও যাবে, তারপর পুনরায় আস্‌বার সময় আর তাকে না আন্‌লেই হইবে। এই যুক্তিই ভাল নয় কি ?

বহুদিন হইল দেশে না যাওয়ায় মেজদির সহিত সরযুর দেখা হয় নাই, একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা। তাই বলিলেন—তোমার ও যুক্তি খুব ভাল, আমি তাহাতে খুব রাজি আছি, তবে তোমার খাওয়া পরার কষ্ট হবে বলে, যেতে প্রাণ চায় না !

নিখিল বলিলেন—সে আর কয়দিন, একটা ভাল চাকুরী জুটিলেই পুনরায় লইয়া আসিব ; সেই কয়দিন না হয় একটা ভাল মেসে খাবার বন্দোবস্ত কর্ব্বো।

সরযু। যা ভাল বুঝ তাই করো, কিন্তু খাওয়ার যেন কষ্ট না হয়—তাহা হইলে আমি দেশে যাব না। তুমি না হয় একটা ছোট ঘর ভাড়া করে, খরচ কমিয়ে দাও ?

নিখিল। দেখ, হঠাৎ সেরূপ কর্ত্তে গেলে, সম্ভ্রমের লাঘব হবে, হাজার হউক এখন চারিদিকে নাম হয়েছে, সকলে জানে শুনে,—তোমাকে এখানে রেখে তা কর্ত্তে পারবো না, বরং তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে বল্‌বো—এখন আর বড় বাড়ীর দরকার নাই, তা'হলে সহজে কেহ বুঝ্‌তে পারবে না।

সরযু। তাই ভাল—কিন্তু দেশে গিয়ে আমি কার কাছে থাকবো ?

নিখিল। যেখানে তোমার সুবিধা হবে—খরচ দিব তার আর ভাবনা কি ?

সরযু। বড়দির কাছে সুবিধা হবে না, তাঁর সঙ্গে আমার বনিবে না। যাঁর শীতল ছায়ায় আমি এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি, সেই মেজ্‌দির কাছেই থাক্‌বো।

নিখিল। তবে প্রথমে বড় বউয়ের কাছেই যাও—তারপর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কর্ব্বে, না হলে অনেক কথা হবে--হাজার হউক, তিনি বড় দাদা ত? বড়বউ তাঁকে খারাপ করছে কিন্তু —আমাদের তাঁকে মেনে চলা উচিত, আর বুঝে দেখ্‌তে গেলে বাস্তবিক দাদা ত মন্দ নয়, যত দোষ সেই রাক্ষসীর—তবে দাদা তাকে আঁটিতে পারেন না, কাজেই বুড়ো বয়সে কেলে-ঙ্কারীটা করা কি উচিত? তাই বউ যেদিকে ফেরান সেই দিকেই ফেরেন। কঞ্চিবেলায় বাঁশকে নোয়ান নাই, এখন শক্ত হয়ে গেছে, আর নুইবে কেন? যাহা হউক, আমি আজই দাদাকে চিঠি লিখি—তিনি তোমাদের নিয়ে যান, তারপর সেখানে গিয়ে অবস্থা মত ব্যবস্থা কর্ব্বে। মেজ্‌দা মাটীর মানুষ, তাঁকে ত বেশী বল্‌তে হবে না, কিন্তু এঁকে না বল্‌লে রেগে অস্থির হবেন। আর মেজ্‌দা এ বিষয়ে রাগ করবেন না।

শেষে বড়দাদাকে পত্র লেখাই সাব্যস্থ হইল। তিনি আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইলেই নিখিল কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া খরচ কমাইয়া দিবেন। সরযু মধ্যে মধ্যে মেজ্‌দিকে পত্র লিখিতেন—আজও পত্র লিখিয়া জানাইলেন—মেজদিদি, বড় ঠাকুরকে আমাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য তোমার দেবর পত্র লিখেছেন—মনোগত ইচ্ছা না থাকিলেও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ

না করিলে সকলে আমাদেরই দোষ দিবে, এই জন্য তাঁরই সঙ্গে যাই। তারপর সেখানে যাইয়া অবস্থা মত ব্যবস্থা কর্ব্বো, তোমার দেবরও তাই বলেছেন।

ইতিপূর্ব্বে নিখিল মেজদাদাকে অনেক মিনতি করিয়া সময়ে সময়ে পত্র লিখিয়া তাঁহার দোষের জন্য মাপ চাহিয়াছেন। মেজ-বউয়ের চরণেও শতকোটী প্রণাম জানাইয়া লিখিয়াছেন—মেজ-বউদি! সমস্তই শুনিয়াছি, বহুদিন বিদেশে থাকিয়া বুঝিতে পারি নাই, যে বড়বউয়ের মুখে অমৃত, অন্তরে গরল। যাহা হউক, আসিবার সময় দেখা করিয়া আসি নাই, তজ্জন্য সহস্র অপরাধ হইয়াছে—মার্জ্জনা করিবেন। তবে মার পেটের ভাই বড় দাদাকে মাথার মণি করিয়া রাখিতেই হইবে—তিনি আমাদের সঙ্গে যতই খারাপ ব্যবহার করুন।

অমর ও সাবিত্রী দুইজনে গঙ্গার জল—কিছুমাত্র কুটিলতা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। নিখিলের পত্র পাইয়া তাঁহারা যথা পূর্ব্বং তথা পরং, তাঁহার প্রতি রাগই করেন নাই—বালক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কোন দোষই ধরেন নাই, তা ক্ষমা করিবেন কি? আরও পত্র পাইয়া বুঝিলেন, বড় ভাই চিরকালই বড়, তাঁহার মান আগে রাখাই ত উচিত। ছোট বউমাকে নিয়ে আস্বার জন্য, তাঁকে পত্র লিখে নিখিল ভালই করেছে—আহা! ছোট বউটী অনেক দিন কাছ ছাড়া হয়েছে—এক্ষণে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসুন।

(২)

আজ এক সপ্তাহ হইল, ছোটবউ বসন্তপুরে আসিয়াছেন। নরেন্দ্র তাহাকে নিজ বাটীতেই আনিয়া রাখিয়াছেন। ছোট-বউকে হস্তগত করিয়া রাখিতে পারিলে—ছোট ভাই তাহারই হইবে, তাহারই বশে থাকিবে, উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা তাহারই হাতে পড়িবে, ছোট বউয়ের জন্য কিছু খরচ করিয়া বাকী সমস্তই নিজে পুঁজি করিবেন। এই আশায় সরযুকে নানাবিধ স্তোক বাক্যে, নানাবিধ আশার আশ্বাসে বশে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। বড়বউও এখন আর সেরূপ উগ্রমূর্ত্তি দেখান না, সরযুকে ঠিক ছোট ভগ্নীর মত কাছে কাছে রাখিয়াছেন—অশেষ প্রকারে যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার ভিতরেও যেন কেমন একটা স্বার্থপরতার ভাব জড়িত রহিয়াছে। মেজ্‌দি যেমন প্রাণ খুলিয়া নিস্বার্থভাবে ঠিক আপনার মতটী করিয়া যত্ন করিতেন, এখানে যেন তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

ছোটবধুর সহিত তাহার ভ্রাতা রামধনও এখানে আসিয়াছে —বড়বউ কিন্তু তাহাকে তত দেখিতে পারে না। তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে তাঁহাদের তত ইচ্ছা নাই। তবে দেখা যাক্, নিখিল মাসিক কিরূপ খরচ পাঠায়, তারপর ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা যাইবে।

নিস্বার্থপর মেজোবউয়ের মত স্বার্থপর বড়বউয়ের সহিত ছোট বউয়ের আদৌ সেরূপ বনিবনাও হয় না। আজীবন

যাহার সহিত সাপে-নেউলের মত সদ্ভাব, আজ হঠাৎ এত মাখামাখী করিতে গেলে চলিবে কেন? উপায়ক্ষম স্বামীর পরিবার বলিয়া সরযূ মনের মত কাজ করিতে না পারিলেও অম্বিকা এখন অনেকটা রাগ সামলাইয়া লয়েন। তখন যেমন বিনাদোষে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেন, এখন তেমন করেন না। সরযূ ত তেমন বউ নহেন—খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তবে বড়বউ যে তাহার উপর গালি বর্ষণ করিতেন, সে কেবল স্বভাব গুণে। ছোটবউ তখনও কথা কহিতেন না, এখনও কহেন না। বড় যাকে তিনি চিরকাল বড়র মত দেখেন ও মান্য করেন।

দেশে আসিয়া ছোটবউ মেজ্‌দির কাছে যাইতে ছাড়েন না। অম্বিকার নিষেধ সত্ত্বেও এ স্বভাব তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। পরম ধার্ম্মিকা মেজ্‌দির চরণে যে তাহার মন-প্রাণ বাঁধা; তিনি যে তাঁহাকে দেবীর মত মান্য করেন। যখন তাহার কোনও প্রকার ক্ষমতা ছিল না, নিমুরুদে স্বামীর স্ত্রী ছিলেন, তখনই যখন বড়দির ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন নাই, আর এখন ত তিনি ভগবানের কৃপায় পাঁচ জনের একজন হইয়াছেন—যথার্থ ধর্ম্মকর্ম্ম অবহেলা করিবেন কেন?

একমাস গত হইল, নিখিল পঁচিশ টাকার বেশী পাঠাইতে পারিলেন না। তাঁহার আয় এখন কমিয়া গিয়াছে, নানাদিকে অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই দাদাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া একখানি পত্র ও ঐ পঁচিশটী টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন! বড়বউ শুনিয়া মনে করিল—ঠাকুরপো এখন নিজের গণ্ডা বুঝিয়াছে,

হিসাব করিয়া ঠিক খোরাকীর মত খরচ পাঠাইয়াছে। দেড়শত টাকা মাহিয়ানার মোটে পঁচিশটী টাকা, কেন, ইহা কি হোটেল-খানা যে খোরাকী লইয়া খাওয়াইতে হইবে? আপনার খরচ রাখিয়া সমস্ত টাকা পাঠাইলে আমরা কি নষ্ট করিয়া ফেলিতাম, না তাহাকে ফাঁকি দিতাম? যাহা হউক, আমরা হোটেলের মত খরচ লইয়া দুজনকে খাওয়াইতে পারিব না; ঘরে টাকা পাঠাবার সময়ই যত টানাটানি পড়ে, আর এতদিন রাঁধুনি চাকর রাখিয়া বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া ত বেশ চলিতেছিল, দাদাকে দিবার বেলা বুঝি সমস্ত টানাটানি? অম্বিকা স্বামীকে বলিল—দেখ, তুমি তার ন্যাকাম কথা আর শুন না বা ঐ চিঠির তোষামাদী কথায় ভুলো না। সে এখন নিজের গণ্ডা বুঝিতে পারিয়াছে, এখন আর তোমার হাতে করিয়া মানুষ করিবার কথা তার মনে নাই—এখন সময় ফিরিয়াছে কি না? নরেন্দ্র বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন—না গো না, বাস্তবিক তাহার আয় কমিয়া গিয়াছে, উপায়-উপার্জ্জন সব সময় ত সমান থাকে না, বিশেষতঃ চাকুরীর আয়। দরজার আড়াল হইতে ছোটবউ স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনিতেছিলেন। বড়দিদির কথা শুনিয়া, তাহার সরল স্বভাব স্বামীর প্রতি অযথা দোষারোপ দেখিয়া—তিনি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন।

মেজ্‌দি হইলে কখনই এরূপ অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহার প্রাণে কখনই ছোট ভাইয়ের প্রতি এরূপ অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিত না। তাঁহারা এতদিন এক কপর্দ্দক

না লইয়া, তাহাকে ছোট ভগ্নীর মত না-খাইয়া খাওয়াইয়াছেন, নিজেরা না পরিয়াও ভাল কাপড় দিয়াছেন। আর তার স্বামীর প্রতি যাহা করিয়াছেন তাহা ত অতুলনীয়। সরযূ সেইদিনই মেজদির নিকট চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন—দুটাকা কম পাইয়াছেন বলিয়া অযথা তার স্বামীর নিন্দা করিতেছে, অতএব আর কিছুতেই এখানে থাকা হইবে না।

টাকা পাইবার পর হইতে বাস্তবিকই অম্বিকা সরযূ ও তার ভাইকে তত যত্ন করে না, তত আদর-অভ্যর্থনা আর নাই, থাকে-থাকে, যায়-যায় ভাব দেখিয়া একদিন সরযূ প্রাতঃ-কালে রামধনকে সঙ্গে করিয়া মেজদির নিকট চলিয়া গেল, অম্বিকার মৌখিক আপত্তির প্রতি গ্রাহ্যও করিল না। অমর দরিদ্র হইলেও আত্মীয় ভরণ-পোষণে কখনও কুণ্ঠিত নহেন; কত নিরন্নকে ভগবান তাঁহার দ্বারা প্রতিপালন করাইতেছেন, আব এ নিকটবর্ত্তী আত্মীয়—অবশ্য প্রতিপাল্য, প্রাণের সোদর নিখিলের স্ত্রী! যদি সে এক পয়সাও দিতে না পারে, তবে কি তাহারা ভাসিয়া যাইবে? এতদিন যে নিখিল অক্ষম ছিল—তখন সরযূকে অথবা নিখিলকে কে প্রতিপালন করিয়াছিল? দুঃখে কষ্টে অমরইত তাহাদের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতাসহ ছোটবউকে আসিতে দেখিয়া সাবিত্রী হৃদয় পাতিয়া দিলেন, সাগ্রহে তাঁহার সেই আদরের ডাকে বলিলেন—হাঁ ছোট্কী! বড়দি কি তোদের তাড়াইয়া দিলেন, ঠাকুরপো কি টাকা পাঠায় নাই?

সরযূ। টাকা পাঠাবেন না কেন, তবে বড় টানাটানি, এখন সে চাকুরী নাই কি-না, তাই টাকা কিছু কম দিয়াছেন— এই জন্য বড়দি অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন, বলিলেন—একি হোটেলখানা যে ওজন করিয়া খরচের টাকা লইতে হইবে? বাস্তবিক মেজ্‌দি, তাঁর এখন বড় টানাটানি, সে চাকুরী নাই বলে খরচ কমাবার জন্যই আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড়দি পত্রের কথায় বিশ্বাস না করে, কেবল অযথা কতকগুলো কথা শুনালেন—তা ভাই, দেবতার উপর বৃথা দোষারোপ কখনই সহ্য কর্ত্তে পারবোনা, এতে একবেলা খেয়ে থাকতে হয়, অথবা না খেতে পেয়ে মরতে হয়—তাও স্বীকার। সরযুর সেই ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী ক্ষোভে, অভিমানে জল-ভারাক্রান্ত হইল দেখিয়া ছোটবউ-অন্তপ্রাণ সাবিত্রী শশব্যস্তে তার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন—তা আর হয়েছে কি? এবাড়ী ওবাড়ী সবইত সমান, ওখানে থাকতে ইচ্ছা না হয়, তুই এখানেই থাক্ না, তোর মেজো ভাসুর কি আর তোদের দুবেলা ভাত দিতে পারবে না, টাকা নাই বা দিলে, তুই চুপ কর বোন্ চুপ কর? মায়ের মত বুকে টানিয়া লইয়া সাবিত্রী ছোটবউকে সান্ত্বনা করিলেন। সরযূ মেজ্‌দির স্নেহময় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বড়বউও আপদ গেলো বিবেচনা করিয়া পঁচিশটী টাকা বাক্সে তুলিল।

অম্বিকা যাহা করিবেন, নরেন্দ্রের তাহাতে কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। ভ্রাতাসহ ছোটবউ অমরের সংসারে আশ্রয় লইলেন,

শুনিয়া তিনি তত কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তবে একবার মাত্র বলিয়াছিলেন—টাকা লওয়া হইয়াছে, এ মাসটা খাওয়াইলে ধর্ম্মতঃ ভাল হইত, কিন্তু সে কথা শুনে কে? গৃহিণীর কর্ণে সে কথা আদৌ পৌছিল না।

(৩)

বহু বিবেচনা করিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিয়া যান নাই, তাঁহারা চিরকালই তাহাদিগকে একজনের না একজনের অধীন হইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মর্হতি" ইহা তাঁহাদের সাতিশয় বিচক্ষণতার ফল। বাস্তবিক স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে, স্বামী পুত্রের কথা না শুনিলে, তাহাদের বশীভূত হইয়া না চলিলে, তাহারা যে সর্ব্বনাশ করে, সোণার সংসারকে ছারখারে দেয়, তাহা বঙ্গদেশে আজ নূতন নহে—চক্ষের উপরে কতশত দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান।

হিংসাই এই সর্ব্বনাশের কারণ। হয় ত রূপের হিংসা, না হয় চরিত্রের হিংসা, অথবা অবস্থার হিংসা—ইহাই সর্ব্বনাশের মূল। অম্বিকা খুব বড় লোকের মেয়ে, বামনদাস বড় ঘরে কুটুম্বিতা করিয়া অজস্র অর্থলোভে অম্বিকাকে বধূ করিয়াছিলেন। তাহার রূপত কিছুই ছিল না, অতিশয় কদাকার, তার উপর গুণও তথৈব চ। আর সাবিত্রী ও সরযূ গরীবের মেয়ে হইলেও রূপেগুণে অতুলনীয়া—শরতের পূর্ণশশীকলার ন্যায় যেমনি রূপ, গুণও তাহাদের তেমনি ছিল। পাড়ার সকলেই তাহাদের শতমুখে

প্রশংসা করিত—তাহাদের বিমল স্বভাবে, সম্বন্ধোচিত মধুর বাক্যে সকলেই তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত, অতিবড় শত্রুও তাহাদের মধুর বাক্যে শত্রুতা ভুলিয়া যাইত, অথবা তাহাদের শত্রু বুঝি এজগতে কেহ নাই। আপনি ভাল হইলে জগতে তাহার মন্দ করিবার লোক কোথায়?

আর বড়বউ বড়লোকের মেয়ে, সম্মুখে কেহ কিছু বলিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সকলেই তাহার নিন্দা করিত—অম্বিকার গুণ যে চারিদিকেই সপ্রকাশ। নরেন্দ্র কিন্তু কি জানি কোন্ গুণে পত্নীর অত্যন্ত বশংবদ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে যতই নিন্দা করুক, তিনি তাহাকে সোণার চক্ষে দেখিতেন, বোধ হয় অর্থ ই তাহাকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিল। পিতার অবস্থা খারাপ হইলে, যখনই যাহা আবশ্যক হইত, বড়বউ পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া স্বামীর সে অভাব পুরণ করিতেন।

নরেন্দ্র কোন কাজেরই নায়েক নহেন। না সংস্কৃত, না বাঙলা, তিনি কোন লেখা পড়াই ভাল জানিতেন না, তবে মোটামুটী ইংরাজী জানিতেন—তাহাও সেকালের ধরণের, বড় ভাল নহে। অম্বিকার পিতা কন্যাকে কুৎসিত দেখিয়া একটী পরম সুন্দর পাত্রে অর্পণ করিবার মনস্থ করত বহু অর্থ ব্যয়ে নরেন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র জাত্যাংশে অম্বিকার পিতা অপেক্ষা খুব বড়—তার উপর তিনি ঠিক কার্ত্তিকের ন্যায় যুবা পুরুষ। বামনদাসের পুত্রগুলি অতি সুন্দর, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কন্যা এইরূপ পাত্রে সমর্পিত

হইলে—তাঁহার আশা পূর্ণ হয়। এই জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নরেন্দ্রকে জামাতা করিয়াছিলেন। অম্বিকাও এমন সুন্দর যুবকের হাতে পড়িয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল, নানাপ্রকারে স্বামীকে বশীভূত করিয়া লইল, ইহার মধ্যে অর্থবলই প্রবল ও প্রধান। যখনই অর্থের অভাব হইত—শ্বশুর তখনই তাহা প্রদান করিয়া জামাতার মন যোগাইতেন—ইহাতে নরেন্দ্রের চরিত্রও ঠিক ছিল না। তারপর পিতামাতার স্বর্গগমনের পর নরেন্দ্রের আয় কমিয়া গেল, অথচ অর্থের আবশ্যকতা ঠিক রহিল। তিনি লেখাপড়া ভাল জানেন না, যে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন—চরিত্রও দূষিত, পিতার ন্যায় গুরুগিরীও করিতে পারেন না, কাজেই কষ্টের একশেষ হইল। অবশেষ বিষয়াদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, দেখিয়া অম্বিকা নিজের পিতৃদত্ত বিষয় হইতে স্বামীকে কিছু অর্থ দিয়া তেজারেতী কারবার চালাইতে বলিলেন। ইহাতে দুইদিক রক্ষা হইবে, গ্রামের অভাবগ্রস্ত ইতর-ভদ্র তাহাদের মুঠার মধ্যে থাকিবে, অথচ বেশী সুদে টাকা ধার দিয়া উপার্জ্জনের পথও প্রশস্ত হইবে।

কিছুদিনের মধ্যে নরেন্দ্র এই কারবারে খুব উন্নতি লাভ করিলেন। এইরূপ কারবার তাঁহাদের প্রকৃতির অনুকূল, লোকের সহিত মনোমালিন্য, কলহ, ঝগড়া, মারামারি শেষে আদালত অবধি ইহার শ্রাদ্ধ গড়াইতে লাগিল। উকীল মহলে নরেন্দ্রের খাতিরও খুব বাড়িয়া গেল। যাহাদের সমস্ত দিন

আদালতের গাছতলায় বসিয়া সামান্ত জলযোগের পয়সা পর্য্যন্তও উপায় হইত না, নরেন্দ্রের প্রসাদে এমন দুই একজন উকীলের প্রত্যেহ টাকাটা সিকিটা উপায় হইতে লাগিল। যাহাতে প্রত্যহ দুই এক নম্বর মোকর্দ্দমা রুজু হয়—এই অকর্ম্মা উকীলগণ প্রত্যহ জমীদার নরেন্দ্রবাবুর বাড়ী হাঁটাহাটী করিয়া তাহার যোগাড় করিতে লাগিল। টাকা কর্জ্জ দিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীর রক্ত শোষণ করত নরেন্দ্রের অর্থাকাঙ্ক্ষা মিটিল না, শেষে স্ত্রীর পরামর্শে ভাই দুইজনকে বিষয়-আশয় ফাঁকি দিবার জন্য বাহিরে নানাপ্রকার ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ পুরের জমীদার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় নিলামে বিক্রয় করাইয়া দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী, ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ অমর ও নিখিল এ ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন—নিশ্চয়ই দেনা হইয়াছে, নতুবা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হইয়া বড়দাদা কি সহজে বাপের বিষয় হস্তান্তর করেন?

নরেন্দ্রের তেজারতীতে বেশ আয় হইতে লাগিল, তাহার টাকা স্ত্রীধনরূপে অম্বিকার বাক্সমধ্যে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। বাহিরে কিন্তু দেনায় চুল বিক্রয়ের ভাব; নিত্যানন্দপুরের জমীদার রতনবাবুর পরয়ানা মাঝে মাঝে আসিয়া বাস্তভিটার উপর ঢোল পিটিতে লাগিল কিন্তু তাহা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নাই বলিয়া কিছু করিতে পারেন না, ঢোল সহরৎ করিয়াই ফিরিয়া যান। নরেন্দ্র তাঁহাদিগকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলন। এদিকে

কলিকাতায় নিখিলও উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে আর এক পয়সাও পাঠান না, কি করেন তা ভগবানই জানেন।

এক্ষণে অমরের উপায় সম্বন্ধে পাঠকের মনে নানা কথা উঠিতে পারে। তাঁহার পোষ্য অনেকগুলি—সরযু, রামধন, সাবিত্রী, একজন পরিচারক ও একটী পরিচারিকা, তাহার উপর প্রত্যহ সদাব্রত ত আছেই। এ সকল খরচ সংকুলন হয় কোথা হইতে, অমর ত কোন কাজ কর্ম্মও করেন না?

আমরা বলি—যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তাহার অর্থের অভাব হয় না। অমর যে টাকা উপার্জ্জন একবারেই করেন না—তাহা নহে, যজন-যাজনে তিনিও যথেষ্ট উপায় করেন কিন্তু তাঁহার সঞ্চয় নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয় করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইয়া দেন, পুত্রাদি কিছুই না থাকিলেও পাড়ার দরিদ্রগণ ও দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া পরকালের পথ মুক্ত করেন, হাতে এক পয়সাও রাখেন না।

অমর দশজনের মতই সংসার করেন কিন্তু আসক্তিবশে নহে—কর্ত্তব্য বোধে। তিনি বুঝিতেন—অর্থ পুঁজি করিবার নহে, তাহার সদ্ব্যয় করাই উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য; দশজনের উপকার করিতে পারিলেই তিনি উপার্জ্জনের সার্থকতা বিবেচনা করেন। তাঁহার দুইজন সহকারী আছে, তাহারা যজমানবর্গের কার্য্য করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে—নিজেদের পারিশ্রমিক লইয়া বাকী সমস্তই অমরকে প্রদান করে, ইহাতে অমরের সংসার এক প্রকার চলিয়া যায়। তারপর তিনি প্রায়ই দূরদেশে শিষ্য-

"পোড়ার মুখো ছেলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়" বলিয়া

থাকৃতে কি ভুতে কিলোয়” ওখানে তোমার কি ক্ষীর ছানা আছে, যে লোভে পড়ে দৌড়িয়া যাও” ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিয়া সারিতেন, আসিতে বাধা দিতেন না। সরযু চলিয়া আসিবার পর হইতে পাঁচু আসিবার উপক্রম করিলেই বড়বউ সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর কোমল অঙ্গে এমন বিষম আঘাত করিতেন যে দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যাইত। মা হইয়া যে এমন করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত কেবল অম্বিকার ন্যায় রমণীই দেখাইয়া থাকেন। নরেন্দ্র এই নিষ্ঠুর অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিতেন—আহা! কর কি, ও শিশু, ওর কি শত্রু-মিত্র জ্ঞান আছে? যে ভালবাসে তার কাছেই যায়, কাকাকাকীর কাছে যাবে তাতে আর দোষ কি, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া ত আর ও বুঝেনা?

রায় বাঘিনী অম্বিকা নথ নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিতেন—যাও যাও, আর তোমাকে শিক্ষা দিতে হবে না, এখন থেকে শাসন না করলে যে রাশ পেয়ে নিবে। নরেন্দ্র শিশুর প্রতি সে অত্যাচার দেখিতে পারিতেন না এবং নিজে অপমানিত হইবার ভয়ে মুখ ফিরাইয়া বিরস বদনে সরিয়া যাইতেন, তথাপি পত্নীর দুষ্টআক্রোশ রোধ করিতে পারিতেন না। তারপর ক্ষীরোদা আসিয়া তবে পাঁচুকে বাঘিনীর কবল হইতে উদ্ধার করিত। ক্ষীরোদার নিকট অম্বিকার জারিজুরী খাটিত না, তাহার কলকাঠী নাড়াতেই অম্বিকা যে এ সকল যুদ্ধে জয় লাভ করিতেছে। এই সংসার-সংগ্রামে তাহার বিজয় লাভের হেতুই যে ক্ষীরোদা—

তাহার শিক্ষাই যে অম্বিকার প্রধান অবলম্বন, কাজেই গুর্ব্বিনীর অপমান কি সে করিতে পারে ?

দুর্ব্বল শিশুর উপর প্রবলা বাঘিনী মাতার পীড়ন দেখিয়া, সাবিত্রী ও সরযু দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়া দিতেন, নির্দ্দয়ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে বলিতেন —হায় বাছা ! কেন তুই এ শত্রুদের কাছে আসিস্, এমন করে মুখে রক্তউঠা মার খেয়ে না এলেই কি নয় ? অনবরত তোর কোমল অঙ্গে অমন পীড়ন দেখে আর আমাদের এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না, তুইত আস্তে ছাড়বিনি ! আজ তিনি আসুন, তোর জন্যে আমরা কোন অলক্ষিত স্থানে চলে যাই ; ওঃ একি পীড়ন ! মা হয়ে চোরের ন্যায় শাস্তি ! হতভাগী মা না রাক্ষসী ! অমর থাকিলে, স্বচক্ষে এ নির্য্যাতন দেখিলে বোধ হয় সহ্য করিতেন না, উচিত শাস্তি দিতেন—তারপর যা হয় হ'তো, না হয় জেলে যেতেন কিন্তু অম্বিকার ভাগ্য ভাল যে স্নেহময় অমর তখন গৃহে ছিলেন না।

(৪)

এ জগতে বড়বউ অম্বিকার যদি কেউ প্রাণের মানুষ থাকে— তা সে ক্ষীরোদা ! দাসী হইলেও সে এখন তাহার প্রাণের সঙ্গিনী। একে একে সকলেই অম্বিকার সঙ্গ ছাড়িয়াছে, পাড়ার যাহারা সময়ে সময়ে রায়দের পবিত্র গৃহে মধ্যাহ্নে আহারের পর

বেড়াইতে আসিত—পাঁড়াগাঁয়ের নিয়মানুসারে যাহারা বেড়াইতে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ আমোদ-আহ্লাদে, গল্প-গুজবে কাটাইয়া একটু বেলা পড়িলে আবার স্ব স্ব গৃহে গমন করিত, এখন তাহারাও আর আসে না, বড়বউয়ের কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া তাহারাও সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। বর্ষিয়সী শাশুড়ীগণ নিষেধ করিয়াছেন—অমন দেমাকে মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই, ওখানে ভাল শিক্ষা পাবে না, কেবল একল্‌সেড়েমী, আর নিজের অহঙ্কার—কাজ কি মা, অমন সঙ্গ করে? আহা! অমন যে সোণার মেজোবউ, যার পায়ের ধূলা পেলে কত মেয়ে সতী হয়ে যায়, অমন মাটীর মানুষ ছোটবউ, আর দেবতার মত অমন যে মেজো দেবর, তাদেরই যখন কাল্যমুখী পর করে দিলে, ছোঁড়াটাকে ছন্নছাড়া কল্লে, তখন কি ওর মুখ দেখ্‌তে আছে? আজ একবৎসরের পর শ্যামার মা দেশে আসিয়া বড়বউয়ের প্রকৃতি দেখিল—এখন আর সে আগেকার মত নেই—যেন নবাবের মাগ, গেদায় পা পড়ে না, কাজ কি আমার তার কাছে গিয়ে, আমিত আর তার একচালায় বাস করি না যে ভয় কর্ত্তে হবে? বলিয়া সেও অম্বিকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে।

সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে অম্বিকার মতিগতি দেখিয়া সকলেই ঘৃণা করিতেছে, কেবল ক্ষীরোদা যায় নাই বরং সে পূর্ব্ব অপেক্ষা বড়বউকে পাইয়া বসিয়াছে; রতনের নিকট রতনের আদর বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ক্ষীরোদার খোরাক পোষাক

মাসিক মাহিনা একটাকা ছিল, এখন দুতীয়ালী করিয়া বেতন বাড়াইয়া লইয়াছে, মাসিক দুইটাকা হইয়াছে কিন্তু সে মাসে মাসে মাহিয়ানা লয় না, বাবুর নিকট জমা হইতেছে, অথচ প্রতি মাসে দেশে তাহার এক জেঠাইমা আছে, তাহাকে খরচ দিতে হয়, তাহাও চলিয়া যাইতেছে। এই চাকুরী করিয়া সে তার জেঠাই ও মাসতুতা ভাইদের অবস্থা ফিরাইয়াছে। আসল টাকা নাই লইল, সুদেই যখন সকল দিক রক্ষা হইতেছে, তখন আসলের আবশ্যক কি ?

ক্ষীরোদা আজ কয়েক বৎসর রায়দের বাটীতে দাসীত্ব করিতেছে কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার স্বভাবও ভাল নয়, তাহার উপর একটু কেন, সম্পূর্ণ হাতটান আছে। ঘরের বাসন-কুশন, কাপড়-চোপড় সাবধানে না রাখিলেই তাহা আর পাওয়া যায় না। তারপর স্বভাব তার কেমন, তাহা কাহার অবিদিত নাই, সে চাকুরী করিতে ঢুকিয়াই প্রথমে বড় গিন্নীর সহিত যোগ করিয়া সংসারটাকে উৎসন্নে দিল, আর চুরীর ত কথাই নাই, কতবার ধরা পড়িয়াছে, অমর ও নিখিল তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু বড় গিন্নীর নিকট কান্নাকাটী করিয়া সে আবার বাহাল হইয়াছে। মেজো ও ছোটবাবু এবং তাঁহাদের বধূদ্বয় ক্ষীরোদাকে দেখিতে পারিতেন না, এই জন্যই ক্ষীরোদা ভিতরে ভিতরে বড়বউকে মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাদের পৃথক করিয়া সংসারটাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এখন সংসারে যা করেন বড়বউ, নরেন্দ্র কেহই নহেন, তিনি পত্নী হস্তের ক্রীড়নক—কলের পুতুল, যেমন নাচান তেমনি নাচেন, যেমন বুলি বলান তেমনি বলেন, পুরুষের যে একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য্য তাহা তাঁহার নাই। কেবল সন্ধ্যাবেলা ইয়ার বন্ধু লইয়া বৈঠকখানায় আমোদ-আহ্লাদ করিতে পারিলেই বাঁচেন। সে সময় বন্ধু-বান্ধব অনেকগুলি যোটেন, গান বাজানা আমোদ আহ্লাদ হয়, তার পর প্রত্যহ ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা আছে, সে ভোজনে অখাদ্য কুখাদ্য বা জাতি বিচারের ব্যবস্থা নাই, বিলাতী পানী এবং বোতল খালীও যে না হয়—এমন নহে। পাড়ায় ত অনেক প্রকার লোক আছে, সকলেত আর অমরেন্দ্র বা নিখিল নহে!

বড়বউ এ সকল অত্যাচার সহ্য করিতেন না, তবে পাছে নরেন্দ্র বারফট্‌কা হইয়া পড়েন, পাছে তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পড়িয়া কোন সুন্দরীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েন—পাছে সেই সুরূপ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষকে কোন সুন্দরী হস্তগত করিয়া ফেলে, এই ভয়ে তিনি স্বামীকে বাহিরে যাইতে না দিয়া ঘরে বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতে প্রশ্রয় দিয়াছেন। নিজের কোন রূপগুণ নাই—তিনি রূপে কোকিল, গুণে শিমুল। নরেন্দ্রের ন্যায় রূপবান ও অর্থবান পুরুষ যে সেই কালো-রূপে মজিয়া আছেন এই সৌভাগ্য, এইজন্য একটা প্রবাদ আছে—"যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম!" ইহাতে একটু সহ্য না করিয়া বেশী টানাটানি করিলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়—এই ভয়।

প্রত্যহ কলহ ঝগড়ায় পাড়ার লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্র যেন শুনিয়াও শুনেনা, ওদিকে কাণই দেন না, কেহ বলিলে বরং ছোটবউও মেজবউয়েরই দোষ দেন, পত্নীর দোষ ধরেন না, একটী কথাও বলেন না।

এরূপ বচনবাণ, এত রেষারেসী, সম্বন্ধছাড়া এরূপ গালাগালি, তথাপি অমর বলিয়াদিয়াছেন—উনি যাই বলুন, তোমরা দুঠোঁট এক করোনা। গুরুজনকে গাল দিলে মহাপাপ, সাবিত্রী ও সরযূ অমরের কথা শিরোধার্য্য করিয়াছেন। অম্বিকা হাঁপাই-ঝুড়িয়া মরে, চেঁচামেচি করিয়া গালাগালি করে, কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাক, কাজেই যত কিছু কষ্ট বড়বউয়েরই হয়। ক্ষীরোদা বলে—তুই কেন ঝগড়া করিয়া মাথা মোড় খুঁড়িয়া মিছামিছি কষ্ট পাস্; মেজবউ ছোট্কীর সহিত যোগ করিয়া দল বাঁধিয়াছে, তাহারা আর কথা কইবে না। তুই কর্ত্তাকে বলে দল ভেঙ্গে দে, ছোটকীকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়ীতে নিয়ে আয়, তা হ'লে ওর জারি-জুরি বুঝা যাবে। এখন মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা আস্‌ছে কিনা, তাই মেজ্‌কীর অত তেজ বেড়েছে, তোর সঙ্গে আর কথা কইতে চায় না, তাই বলি, ছোটকীকে ঘরে এনে ওর তেজ ভেঙ্গেদে! টাকা নয় নাই হলো আর তোর অভাবইবা কি, তবু ত ওদের জাঁক ভাঙ্গবে?

অম্বিকা তাই করিল, নরেন্দ্রকে বলিল—তুমি হয় ছোট-বউকে এখানে নিয়ে এসো, না হয় নিখিলের কাছে পাঠিয়ে দাও, সে যদি এখন নিয়ে যেতে না চায়, তাহলে দেশে ওর জেঠার

কাছে পাঠিয়ে দাও, ছোটবউ চলে গেলে মেজকী হাবাতীর তেজ ভাঙ্গবে! নরেন্দ্র তাহাই করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্ষীরোদাকে ডাকিয়া বলিলেন—ক্ষীরী! তুই এখনি গিয়ে ছোটবউকে এ বাড়ীতে আস্‌তে বল। যদি তিনি এ বাড়ীতে থাক্‌তে একান্তই অরাজী হন, তা হলে বলিস্—তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী যেতে হবে, বড়বাবু কিছুতেই তোমাকে এখানে থাক্‌তে দিবেন না। হয় ওবাড়ীতে চল, না হয় বাপের বাড়ী চলো, মেজকর্ত্তার কাছে কিছুতেই থাকা হবে না। যদি মেজবউয়ের কথায় এই দুইয়ের একটী না করেন, যদি তার গোঁ হয়ে থাকেন, তা হলে বল্‌বি, তুমি আর ইহ জন্মেও নিখিলকে পাবে না। বড় কর্ত্তা আবার ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিবেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ক্ষীরোদা কড়া হুকুম পাইয়া মনের আনন্দে নিম্নতলে নামিয়া আসিল এবং সদর দরজার উপর পা তুলিয়া দিয়া একটী মোটা পানের খিলি বদনবিবরে প্রবেশ করাইয়া দোক্তার পুঁটুলী হইতে চুয়াচন্দন মিশ্রিত, কেয়াগন্ধে আমোদিত কতকটা দোক্তা খাইয়া পিচ্ ফেলিতে ফেলিতে গজেন্দ্রগমনে সরযুর নিকট গমন করিতে লাগিল। সদর দরজা পার হইয়া কালিন্দী পুকুরের পাড দিয়া রায়েদের পুরাতন বাড়ী, যেখানে অমর থাকিতেন, তাহার অভিমুখে চরণ চালনা করিয়া দিলেন। ইহারই মধ্যে সে দুই একটা নূতন মতলবও ভাঁজিয়া লইল!

মেজোবাবুকে সে যমের মত ভয় করে—তিনি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিবেন, ততক্ষণ পাপিনীর সাধ্য কি যে তথায় গমন করে। এতক্ষণ হয়ত মেজকর্ত্তা আহারাদি করিয়া হরিসভায় বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। সেই অবকাশে ক্ষীরোদা খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষীরোদা ঠিক আমাদের ঠাকুরমার উপকথার বর্ণিত ডাইনী বুড়ী, প্রকৃতই তার নজর বড় খারাপ। জহুরী না হইলে যেমন জহর চেনে না, আমাদের বড়বউ অম্বিকাদেবীও বাছিয়া বাছিয়া ক্ষীরোদাকে দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাটীর কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না, অন্যান্য বধূগণ তাহাকে দেখিলে, তাহার শ্রীমুখের চেটাং চেটাং কথা শুনিলে রাগে জ্বলিয়া মরিত, অমর নিখিলের ত সে দু'চক্ষের বিষ, নরেন্দ্রনাথেরও প্রায় তাই, তবে বড়বধূর খাতিরে তাঁহাকে সমস্তই সহ্য করিতে হইত, বিশেষতঃ এমন দূতীয়ালী ত আর কেহ করিতে পারিবে না?

ক্ষীরোদা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে মেজোবউয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি তখন আহারাদির পর রন্ধন গৃহ পরিষ্কার করিতেছিলেন, ক্ষীরোদাকে দেখিয়া বলিলেন—কোথায় যাচ্ছ ক্ষীরোদা! জমীদার বাটীর ঝিয়ের প্রতি হঠাৎ এমন প্রশ্ন সাবিত্রী করিতে পারেন কি? তিনি ত আর এখন জমীদার গৃহিণী নহেন, সাধারণ গৃহস্থ মাত্র। অন্য সময় হইলে সে সাবিত্রীকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিত কিন্তু তাহলে কাজ হইবে না, হয় ত ঝগড়া ঝাঁটী করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইবে, মেজোকর্ত্তা হরি-

সভায় আছে, শুনিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? কাজেই সে মাথা গরম না করিয়া খুব ঠাণ্ডাপ্রকৃতিতে বলিল—তোমাদের ছোটবউ কোথা, তেনার সঙ্গেই আমার কথা আছে?

সাবিত্রী। কি কথা ক্ষীরো, আমায় বল্লে দোষ হবে কি? অতি মিষ্ট কথায় মেজোবউ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ক্ষীরোদা এইবার কিঞ্চিৎ তিরীক্ষী মেজাজে বলিল, অত কথা কাটাকাটী কর্ত্তে পারি না বাপু! ছোটগিন্নী কোথায় তাই বলো!

ছোটলোকের সহিত নরম হইয়া কথা কহিলে প্রায়ই মান-হানির সম্ভাবনা—এক্ষেত্রেও তাহাই হইল কিন্তু যে ব্যক্তি ঘরে আসিয়াছে, সে কোন দোষ করিলেও গৃহীকে ক্ষমা করিতে হয়। বিশেষতঃ সাবিত্রী ক্ষীরোদার প্রকৃতি জানিতেন—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" সাবিত্রী সেকথা গায়ে না মাখিয়া "ঐ ঘরে ঘুমাচ্ছে" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন। সাবিত্রী বুঝিলেন—বড়দির গৃহ হইতে চলিয়া আসায় বোধ হয় কোন কথা বলিতে আসিয়াছে। সাবিত্রী আর অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

ক্ষীরোদা গর্ব্বভরে হাত দুলাইতে দুলাইতে সরযুর কক্ষে প্রবেশ করিল। সরযু তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামাশায় শয্যার উপর একটু তন্দ্রাবিষ্টা হইয়াছিল, সরযু রাত্রি একদণ্ড থাকিতে উঠিয়া গৃহের কার্য্য করেন। সাবিত্রী প্রায় রাত্রি একটা অবধি স্বামীর সহিত পূজার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এত রাতা-রাতি উঠিতে পারেন না, সকালে সরযুকেই ঘরের সমস্ত কাজ

করিতে হয়। তারপর মধ্যাহ্নের যাবতীয় কাজ সাবিত্রীই করেন, সরযু সে সময় একটু বিশ্রাম করেন।

সাবিত্রীর ইঙ্গিতমত ছোটবউ যে কক্ষে ঘুমাইতেছিল—ক্ষীরোদা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল—ছোটবউ ও ছোটবউ!

সরযুর ঘুম খুব সজাগ, দুই একবার ডাকিতে না ডাকিতেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ক্ষীরোদাকে তিনি দেখিতে পান নাই। দুইহাতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। ক্ষীরোদা তাহার পশ্চাৎ হইতে আঁচল ধরিয়া টান দিল, সরযু ফিরিয়া দেখিলে—সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—বোস্, অনেক কথা আছে।

সরযু ঘুমের ঝোঁকে সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং বলিল—কি কথা বল্? ক্ষীরোদা সেইখানেই পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—দেখেন গা ছোট বউ মা, এই তোমার বড়ঠাকুর আর তোমার বড় মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন—তোমায় নিয়ে যেতে, এখানে বাবু তোমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, তাই তেনারা পাঠিয়ে দিয়েছে, হাজার হোক্ গৃহস্থ ঘরের বউ, পালা ছুড়কো নয়, অইন্য কিছু নয়, অমন করে কি চলিয়ে আস্‌তে আছে, এখন কি বলো যাবে কি না?

ক্ষীরোদার কথায় সরযুর ঘুম ছুটিয়া গেল, রাগে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—মুখ ভার, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—কি বল্‌লি ক্ষীরি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা, পালা ছুড়কো

কাকে বলে না, আমি এসেছি কোথায়? এক ঘর থেকে, এক ঘরে, এক যায়ের কাছ থেকে আর এক যায়ের কাছে, খবরদার বল্‌ছি—তুই মুখ সাম্‌লে কথা কোস্?

ক্ষীরোদা একটু থতমত খাইয়া বলিল—না তা বলছি না, তা বল্‌ছি না, তবে চলে আসাটা কি ভাল হয়েছে?

সরযূ।—কতদুর চলে এসেছি, এক ক্রোশ না দুক্রোশ, তাই ভাল হয়নি, সে ঘর থেকে এ ঘর! আর তুই বল্‌ছিস্ খাবার কষ্ট, এতদিন খাইয়েছিল কে? মেজদির কি আমার ভাতের অভাব, অন্নপূর্ণার ঘরে অন্ন কষ্ট! রোজ কত লোক খাচ্ছে, একবার চোখ মিলে দেখিস্ নে কি? বড় বড় জমীদারেও যে পারে না, মেজো ঠাকুর যা করেন!

ক্ষীরোদা সরযুর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ চুপ, মেজো কর্ত্তা থাকে ত আমাকে এখনি লাঠি মেরে তাড়াবে—তা কি বল্‌ছি, তবে শোবারও ত কষ্ট হতে পারে, দুএকখানির বেশী ত ঘরও নাই।

সরযূ।—কষ্টই বা হবে কেন, এই ঘরেই ত এতদিন কাটিয়েছি, তারপর ত কল্‌কাতা চলে গেলাম, এই কয়দিন না হয় বড় বাড়ীতে ছিলাম। মেজো ঠাকুর কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক কি? আর যখন থাকেন, রামধনকে নিয়ে হয়—হরি-সভায় না হয় ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে থাকেন—আমরা ঘরে থাকি, তবে শোবার কষ্ট হবে কেন?

ক্ষীরোদা কিছুতেই ছোট বউকে হারাইতে পারিল না দেখিয়া

একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—তোমায় অত হেঁকে হেঁকে কথা কইতে হবে না, এখন যাবে কিনা বলো ?

সরযু তখন আস্তে আস্তে বলিল—তা আমাকে একলাই যেতে বলেছেন কেন, মেজদিরও কি কষ্ট হয় না ; এতদিন বড় ঘরে থেকে তাঁরও যে কষ্টের একশেষ ; তাঁকেও কি যেতে বলেননি ?

ক্ষীরোদা গলা ঝাড়িয়া খুব নীচু স্বরে বলিল—তুই চুপ কর ছোট বউ ; ওদের কথা তুলিস্ কেন ? যে কাণ্ড করেছে তাতে আবার তেনারা ওদের মুখ দেখবে ? শুধু তোমাকেই নিয়ে যেতে বলেছে, তুমি ত আর কোন দোষ কর নাই—কেন মিছে কষ্ট পাবে ?

"আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই—খুব সুখে আছি, বলিয়া সরযু সটান সাবিত্রীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—মেজদি শুন্‌লে ?

সাবিত্রী তখন উঠানের বড় আম গাছটীর ছাওয়ায় বসিয়া কল্যকার দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য যাঁতার দ্বারা কলাই ভাঙ্গিতেছিলেন, ছোট বউয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন—না ভাই, আমি কিছু শুনি নাই—কি বল্‌ছিল ?

সরযূ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলিল—ছোট বউকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া ক্ষীরোদা আর কিছু বলিল না। সেই গৃহের মধ্যে কোথায় কি দ্রব্য আছে, তাহা হাঁটকাইয়া দেখিতে লাগিল। লইবার মত কোনও দ্রব্য নাই দেখিয়া তাহার প্রাণ খারাপ হইয়া গেল। সে এদিক ওদিক চাহিয়া এবার শয্যার

তলদেশ হাতড়াইতে লাগিল। হায় হায়! নৈরাশ্যে তাহার মুখ অন্ধকারময় হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না! শেষে শয্যা ছাড়িয়া সে যেমন উপাধানটি সরাইতে যাইবে, অমনি দেখিল—একখানি স্বর্ণ মণ্ডিত চিরুণী তাহার তলদেশে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, লোভে তাহার বদন উজ্জ্বল হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা পেটকাপড়ে বন্ধন করিতে করিতে শুনিল—ছোট বউ তাহার গুপ্ত কথা মেজো বউয়ের নিকট প্রকাশ করিতেছে। গুপ্তভাবে কথা কয়টি বলিয়া তাহার কোনও ফল হইল না দেখিয়া সে সরোষে গৃহ নিষ্ক্রান্তা হইয়া বলিল—হ্যাগা ছোট বউ! তোমার ভালোর জন্যই নে যাবার কথা বল্‌ছিলুম তা দেখছি, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে। না যাও না যাবে, কাল তোমাকে কিন্তু তোমার বাপের বাড়ী যেতে হবে, বড়বাবু বলে দিয়েছেন, যদি তুমি আমার সঙ্গে ওবাড়ীতে না যাও, তা হলে কাল লছমন সিং পাল্কী নিয়ে আস্‌বে, ভাই বোনে কাল বাপের বাড়ী যেও!

একটা দাসীর এত বড় দর্পের কথা শুনিয়া ছোট বউ আর থাকিতে পারিল না, সে একবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—দেখ্ তুই বলিস্ আমি একলা যাব না, যদি মেজদি, মেজঠাকুর আর আমাকে এক সঙ্গে নিয়ে যান, তবেই যাব, না হলে নয়! বাপের বাড়ী যেতে গেলুম কেন, সেখানে আমার কে আছে, যাদের পা'র তলায় পড়ে এতদিন সুখে কাটাচ্ছি, এখনও তাই কাটাব, তুই পাল্কী পাঠাতে বারণ করিস্, এলে মিছামিছি ফিরে যাবে!

সরযুর দৃঢ়তা দেখিয়া ক্ষীরোদা একটু দমিয়া গেল; শুষ্ক মুখে বলিল—তা বেশ, না যাবে না যাবে; কিন্তু তেনারা তোমাকে এখানে কিছুতেই রাখবে না।

ছোট বউ ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে বলিল—আমি এখানেই থাক্‌বো, বাপের বাড়ীও যাব না, ওবাড়ীতেও যাব না; এতে যে যা কর্ত্তে পারে করুক।

ক্ষীরোদা অপমানের একশেষ হইয়া বলিল—ইস্, বড় যে দেমাক দেখ্‌ছি, তোর ও দেমাক থাক্‌বে না লো থাক্‌বে না। তেনারা বলেছেন—যদি তেনাদের কথা না শুনো, তাহলে ছোট বাবুকে কিছুতেই পাবে না—যার গুমারে এত গুমার, বড়ঠাকুরের মাগ কিনা তাই ধরাকে সরাখানা দেখছো, কিন্তু সে গুড়ে বালি, যদি তেনাদের অপমান কর, তা হলে বড়বাবু বলেছেন—আবার নিখিলের বিয়ে দেবো, তখন যে তোর হাড়ির হাল হবে লো ছুঁড়ী!

সরযু রাগে ফুলিতেছিল, সে বলিল—কোথাকার হতচ্ছাড়া মাগী তুই গা, আ মরণ আর কি, ঘর বয়ে ঝগড়া কর্ত্তে এসেছিস্, রামধন! রামধন! ডাক্‌তো মেজো ঠাকুরকে, মাগীকে দু'ঘা দিয়ে দিন!

অমরেন্দ্র ঘরে আছেন শুনিয়া ক্ষীরোদা আর দাঁড়াইল না; একে ওরা দুইজন সমর্থ্য মানুষ, একলা পেয়ে আমায় প্রহার দিতে পারে, মনে মনে এই ভয় হচ্ছিল, তারপর মেজকর্ত্তা ঘরে আছেন শুনিয়া সে বেগতিক দেখিয়া দাওয়ার নীচে নামিয়া পড়িল, আর

দাঁড়াইল না। চুরি করিয়া অন্তরে আনন্দ হইলেও রাগে নানা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

"দূর হ মাগী বাড়ী থেকে" বলিয়া সরযূও খিড়কীর অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

বড়বউ এখনও ইহাদের পাছু লাগিতে ছাড়িতেছে না, এই বার নিজে না পারিয়া দাসীর দ্বারা অপমান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেখিয়া সাবিত্রী মরমে মরিয়া গেলেন। ক্ষীরোদা ও সরযূর ঝগড়ায় তিনি কাণও দেন নাই, কেবল ভাবিতে-ছিলেন—মানুষ হইয়া এত শত্রুতাও করিতে পারে।

(৫)

বিনা দোষে ক্ষীরোদা এত অনর্থপাত করিয়া চলিয়া যাইবার পর সাবিত্রী প্রাণের অন্তস্তল হইতে একটী বিষম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সরযূ! তুই কেন গেলি না বোন্!

সরযূ সম্ভ্রম মিশ্রিত রাগে মুখ ভার করিয়া বলিল—কি বল্‌ছো মেজদি, তুমি পাগল নাকি? এই দুঃখ-কষ্টে পড়ে তোমরা কষ্ট পাবে, আর আমি সুখে খেতে-পরতে ওখানে যাব, কেন দেহটা কি এতই মাটির যে গলে যাবে, সোণার অঙ্গে তোমাদের এত সহ্য হচ্ছে, আর আমার হবে না? তুমিই কেবল কষ্ট কষ্ট করে, আমায় মনঃকষ্ট দাও; আমি ত একদিনের জন্যও তিলমাত্র কষ্টবোধ করি না!

সাবিত্রী অতি কোমল স্বরে বলিলেন—বেশী ভাল বাসিস্ বলে তাই, কিন্তু আমরা ত কষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি হবে বোন্, যেমন কপাল আমাদের, আমরা সহ্য কর্ত্তে শিখেছি, কিন্তু তুই ছেলে মানুষ, মা বাপের আদুরে মেয়ে ছিলি, এত অল্প বয়সে এ দুঃখ কেমন করে সইবি; আর তোর মেজো ভাসুর কেমন উপায়দার তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

সরযূ। মেজদি, তুমি বার বার আর ও কথা বোল'না। স্বার চেয়ে বল না; আর তোকে খেতে দিতে পারবোনা? মেজোঠাকুর যে রোজগার করেন, তাতে পুঁজি করলে একবৎসরে রাজার রাজত্বের মত ধন হয়।

মেজোভাসুরের প্রতি ছোট বউয়ের ভক্তি-ভালবাসার গভীরতা দেখিয়া সাবিত্রী জিহ্বা দংশন করিয়া করুণা মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—না না ছোট্‌কী, ও কথা মুখে আনিস্ কেন বোন্! কে কাকে খেতে দেয়, খাওয়াবার কর্ত্তা ভগবান। আমিত তোকে সে কথা বল্‌ছি না। বড়ঠাকুর কি বলে দিয়েছেন? শুন্‌লি ত, আমার ঐ ভাবনাটাই বেশী; ছোট ঠাকুরপো না হয়—লেখাপড়াই শিখেছে, ছেলে মানুষ ত, বুদ্ধি-সুদ্ধি ত এখনও পাকালো হয় নি। সাবিত্রী একটী বিষম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন।

সরযূ এতদিন স্বামীর কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার ভাব গতিক, তাহার চরিত্র খুবই বুঝিয়া লইয়াছেন, তিনি কিছু মাত্র চিন্তিত না হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, মেজদি, তুমি এতক্ষণ ঐ

ভাবনাই ভাবছো, মানুষের ভাবনা মানুষে ভেবে কি কিছু কর্ত্তে পারে মেজদি! যার ভাবনা সেই ভাবছে, তোমার আমার ভাবনা কেবল শরীর মাটী করা! আমার অদৃষ্টে যদি তাই থাকে, সপত্নীযোগ যদি কপালের লিখন হয়, তা হলে কেউ ঘুচাতে পারবে না,—তা তুমি ভয়ে যতই জড়যড় হও, আর আমার ভাবনা ভেবে মর। আমি কিন্তু অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারবো না, তা তুমি এতে আমাকে ভালই বল, আর মন্দই বল! বড়দি, এতবড় বুড়োমাগী, ছেলেগুলো বেঁচে থাকলে চার ছেলের মা হতো! মেজঠাকুরকে কি রকম চাতুরীতে ফেলেছিল, শুনে আমি রাগে কথা কইতে পারিনি। মেজদি, আমি তাঁর কাছে এতদিন থেকে, তাঁর মন ভালকরে জেনেছি; তিনিও সব শুনে বড় ভাজের উপর সন্তুষ্ট নন্, তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মান্‌তে হয় তাই। তিনি কি না-বুঝে একটা যা তা কাজ কর্ব্বেন—মনে কর?

এত অল্প বয়সে সরযুর জ্ঞানের গভীরতা ও অদৃষ্টে বিশ্বাস দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তা যা ভাল বুঝিস্ তাই কর বোন্, আমরা ভেবেই আর কি কর্ব্বো তা ঠিক, তবে তোর মেজোঠাকুর আসুন, তিনি শুনে কি বলেন দেখা যাক্?

সরযু বলিলেন—না দিদি, তা বলে আসল কথাটা উল্টে দিয়ে, যেন অন্য কথা ব'লো না, যা যা ঠিক হয়েছে, তাই ব'লো, নইলে তিনি বুঝতে পারবেন না।

এত দুঃখের মধ্যেও ছোট বউয়ের কথা শুনিয়া সাবিত্রী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্র নাথ একটী মুটের মাথায় দিয়া নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং মুটেকে পারিশ্রমিক প্রদানে বিদায় দিয়া বলিলেন—কি, আজ বড় হাসিহাসি মুখ দেখ্‌ছি, এমন ত আর কখনও দেখি নাই?

স্বামীর কথা শুনিয়া সাবিত্রী আরও একটু হাসিয়া বলিলেন—দুঃখের মধ্যে হাসি পায়—ছোট বউটার জন্য, ও বাড়ীর কোনও কথায় সে যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে।

"ও বাড়ীর কি কথা সাবিত্রী" বলিয়া অমরেন্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। সাবিত্রী স্বামীর পদতল হইতে কাপড় খানি তুলিয়া আন্‌লায় গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে ক্ষীরোদা ঘটিত সমস্ত কথা বলিলেন।

অমরেন্দ্র আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মেজবউ। দাদা আমাদের পিছোনে এত করিয়া লাগিয়াছেন কেন, বল দেখি? এত করিয়া ঘর থেকে বার করে দিয়েও কি তাঁর আশা মেটে নাই; হায়! সোণার দাদাকে অমন পিশাচে পেলে কেন?

সাবিত্রীও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আর কেন? ঘরে পোষা রয়েছে, আর পাবে না! মায়াবিনীদের কথায় মুনির মন টলে, তা উনিতো মানুষ, ওঁকে পেয়ে বস্‌বে না তো কি? এতদিন কি আর উনি অমন ছিলেন, এখন অনবরত যে মন্ত্রণা পাচ্ছেন।

অমর একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তাইত বটে, ছোট বউমার এখানে কষ্ট হচ্ছে নাকি? কিন্তু ওখানে গেলে বোধ হয় তা হতো না?

ঐ কথাই আমি ছোট বউকে বলেছিলুম, কিন্তু আমার কথা শুনে সে চোক মুখ লাল করে, কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে—হাঁ মেজদি, তবে বুঝি তোমরা আমার ভার সইতে পারছো না, তাই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমিত এখানে অতুল সুখে আছি, একদিনও কোন কষ্ট পাইনি, তবে যদি আমার ভার তোমাদের অসহ্য হয়ে থাকে ত বলো, আমি রাক্ষসীর কাছে যাবনা, হয় তিনি নিয়ে যান—আমি পত্র লিখি, আর না হয় আমি রামধনকে সঙ্গে করে জেঠার বাড়ী চলে যাই।

আমি তার সেই অভিমানের কথা শুনে মরমে মরে যাই আর কি? মনে কল্লাম কেন মরতে এমন কথা বল্লাম, ছেলে মানুষের মনে অযথা কষ্ট দিলাম। সে দুঃখ করে বলে—আমি কখনও অধর্ম্মের সহায় হতে পার্ব্বো না, এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আমি সুখে থাকবো আর তোমরা কষ্ট পাবে, তা আমি সইতে পারবো না, আমি ওখানে গেলে বড়দি আরও তোমাদের পেয়ে বোস্‌বে?

অমর পত্নী-প্রমুখাৎ ছোট বউয়ের কথা শুনিয়া আনন্দ সহকারে বলিলেন—আহা! মা আমার এত অল্প বয়সে এমন বুদ্ধি ধরেন? ভগবানের উপর, নিজের অদৃষ্টের উপর তাঁর এত প্রগাঢ় বিশ্বাস! তাঁর যদি এমন হতে পারে, ত আমাদের হবে

না—খুব হবে। আমরা যদি একবেলা খেতে পাই, তাহা হলে ওঁরাও ভাই বোনে পাবেন, না কিছুতেই মাকে আমার ও পুরীতে রাক্ষসীর গোলামী কর্ত্তে পাঠাব না। বড়দা যে ভয় দেখিয়েছেন—ভাইয়ের বিয়ে দিবেন, সে পারবেন না, হাজার হোক নিখিল তাঁর মত অত ছেলে মানুষ নয়, সে লেখাপড়া শিখে সমাজে গণ্যমান্য হয়েছে, বিনাদোষে কখনই অমন স্ত্রীকে ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না, ওকথা তাঁর নিজের মনগড়া, বুঝলে মেজো বউ?

সাবিত্রী। তা আর আমার বুঝতে বাকী আছে?

অমর। তুমি ছোট বউমাকে ওবিষয়ে ভাবতে বারণ করো—উহা একান্ত দুর্ভাগ্যের কথা, মার আমার ভাগ্যত তেমন নয়?

ছোটবউ দেওয়ালের পার্শ্বে দাড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল। অমন যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মেজো ভাসুরকে পাইয়া তিনিও ভগবানকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

(৬)

অমরেন্দ্র রামধনকে হরিসভায় রাখিয়া হাটে গিয়াছিলেন, সে এতক্ষণ রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়া তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে, কাজেই অমর আর দাঁড়াইলেন না। তাঁহার পাঠ জিজ্ঞাসা করিয়া এইবার তাহাকে গৃহে জলযোগের জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

ছেলেমানুষ সেই কখন্ চাট্টি ভাত খেয়েছে, আর থাক্‌তে পারবে কেন? এ সময় অপর কেহও হরিসভায় আসিতে পারে, তাই অমর আর দাঁড়াইলেন না, চাদর খানি কাঁদে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ছেলেদের যতদিন বুদ্ধি পাকালো না হয়, হিতাহিত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন তাহাদের নজর ছাড়া কর্ত্তে নাই, চোখে চোখে রাখ্‌তে হয়। রামধনের একটু বয়স বেশী হইলেও তাহার দোষ এখন সম্পূর্ণ যায় নাই। বিশেষতঃ অভিভাবক বিহনে তাহার স্বভাবও একেবারে অমার্জ্জিত রহিয়া গিয়াছে। নিখিল তাহাকে কলিকাতায় লইয়া কাছে রাখিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাহার প্রতি কিছু মাত্র নজর রাখেন নাই। নিখিল মনে করিতেন, তিনিও যেমন নিজের আগ্রহে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, রামধনও তাই শিখিবে, কিন্তু তাই কি হয়, সকলের আগ্রহ কি সমান হইতে পারে? বিশেষতঃ যে আদৌ লেখাপড়া শেখে নাই, প্রথমে তাহাকে ঔষধ গিলাইবার মত গিলাইয়া দিতে হইবে, তার পর যখন সে তাহার মধুর আস্বাদ বুঝিবে, তখন আর তাহাকে কিছু বলিতে হইবে না, নিজের আগ্রহেই তখন সমস্ত কাজ করিবে! কিন্তু রামধনকে সেরূপ ভাবে ত কেহ দেখে নাই, তাই সে কলিকাতায় গিয়া সেই আজব সহরের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সে অমরের কাছে আসিয়া বেশ চালাক হইয়াছে, মনোযোগ সহকারে বেশ লেখাপড়া করিতেছে। অমর তাহাকে প্রথমে মুগ্ধবোধ

ব্যাকরণ পাড়াইতে আরম্ভ করাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতও শিক্ষা দিতেছেন—যাহা জ্ঞানের আকর, শিক্ষার চূড়ান্ত, অথচ মধুর গল্প পাঠের অক্ষয় ভাণ্ডার। বালক এখন বেশ মজগুল হইয়া তাহা পাঠ করিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সাবিত্রী আর বাজে কাজে সময় নষ্ট না করিয়া সান্ধ্যদীপ সাজাইয়া তুলসী তলায়, মনসা তলায় এবং প্রত্যেক গৃহে এক একবার তাহা দেখাইয়া, পুনরায় তুলসী মণ্ডপের উপর রাখিয়া ধুনা দিবার জন্য একখানি শুষ্ক ঘুঁটে লইয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সরযু চুল্লিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ঘরে বিছানা প্রস্তুত করিতে গিয়াছে, আজ আবাগী ক্ষীরীর পাল্লায় পড়িয়া এ কার্য্যে দেরী হইয়া গিয়াছে, নতুবা একাজ বৈকালেই শেষ হইয়া যায়, সাঁজের বাতি সরযুই দেখায়, সাবিত্রী এতক্ষণ রন্ধন শালায় প্রবেশ করেন।

সাবিত্রী ঘুঁটে পোড়াইয়া ধুনুচীতে ধুনা ছড়াইয়া দিলেন, প্রথমে তুলসী ও মনসা তলায়, তারপর একবার বাটির ভিতরে চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া যথাস্থানে তাহা রক্ষা করত দেবগৃহে বাতি ও ধুনা দিয়া রামধনকে জলখাবার দিলেন। সে জল খাইয়া পুনরায় হরিসভায় গমন করিলে—অমর আসিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রী দেবতার জলপানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন।

সরযু দিদির গৃহে বিছানা করিয়া, বাহিরের ঘরে ভ্রাতার শয্যা প্রস্তুত করতঃ নিজ কক্ষে একটি মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া শয্যাটী

পরিষ্কার করিতে করিতে উপাধানটী নাড়িয়া দেখিল—তাহার নীচে চিরুণী নাই। অন্যদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাবিত্রী ছোট বউয়ের চুল বাঁধিয়া দেন, আজ আর তাহা হয় নাই, কারণ কি পাঠক তাহা জানেন।

উপাধানের নিম্নে চিরুণী না পাইয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিল, পরে চিন্তা করিতে করিতে সাবিত্রীর নিকট যাইয়া বলিল—দিদি, আমার চিরুণীখানা যে পাচ্ছি না, তুমি কি কোথাও তুলে রেখেছ ?

সাবিত্রী। সে কি লো! আমি রাখবো কেন, তুই কোথা রেখেছিলি ?

সরযু। বিছানায় মাথার বালিসের নীচে !

সাবিত্রী। ওহো, তবেই হয়েছে, সে গেছে; ক্ষীরী এসে ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপরই তুই বেরিয়ে এসেছিস্, সেই তক্কে ঠিক সে চক্ষুদান দিয়েছে! ও মাগী চোরের অগ্রণী, যাঃ সে কি আর পাওয়া যাবে ?

সরযু। কি হবে দিদি, আমি ত জানিনি যে ও চোর, তা হলে সাবধান হতেম।

সাবিত্রী। আচ্ছা, ছোট্‌কি চুপ কর, তোর মেজ ভাশুর সন্ধ্যাহ্নিক করে উঠুন, তাঁকে একবার বলে দেখি।

সরযু। না দিদি, আর ওঁকে বলে কাজ নি, তাহলে এখনি উনি ওবাড়ীতে ক্ষীরীর সন্ধানে যাবেন, তাহলেই কি হতে কি হবে।

সাবিত্রী। সে কি লো! তা বলে কি জিনিসটা অমনি অমনি চলে যাবে—একটা খোঁজ হবে না; আমার নিশ্চয় মনে লাগ্‌ছে,—ঐ মাগীই নিয়েছে, ঘা কতক দিলেই বেরিয়ে পড়বে এখন। সে একবার ঐ রকম চুরি করেছিল, শুনিস্‌নি বড় ঠাকুরকে বল্‌তেই মারের চোটে বেরুলো।

সরযূ। কই না দিদি, আমি ত শুনিনি!

সাবিত্রী। সে অনেক দিনের কথা, আমার বিয়ের পরেই, আমিও তোর মত বালিসের নীচে হারছড়াটা রেখেছিলুম, তারপর পর্ব্বো বলে যাই নিতে যাই, আর পাই না। বড়ঠাকুর শুনে বকাবকী কর্ত্তে লাগ্‌লেন, আমিও বকুনি খেয়ে কত কান্নাকাটি করলাম। তিনি বল্লেন—তার কি হবে, আমি হরি শেক্‌রাকে বলে আর একছড়া কিনে দিব, সেই দিন থেকে সব চুপ হয়ে গেল।

সরযূ। তারপর কি হলো, কেমন করে বেরুলো?

সাবিত্রী। তারপর বড়ঠাকুর বোধ হয় হরিকে বলেছিলেন যে যদি এক ছড়া ভাল হার সন্ধানে পাও ত আমাকে বলো ত, একদিন হরিও হার পেয়ে বল্‌তে এসেছিল। তিনি হার ছড়াটী দেখে তাকে বল্‌লেন—এ হার তুই পেলি কোথা! এখুনি বল্ নইলে তোকে পুলিশে দেবো! সে ভয়ে থতমত খেয়ে সব বলে ফেল্‌লে, তখনি তিনি ক্ষীরীকে ডাকলেন, সে কিছুতেই মান্‌তে চায় না। শেষকালে দুই এক ঘা দিতে তবে স্বীকার কল্লে, এই তিনি তখন তাকে পুলীশে দিতে যান, সকলে এসে তবে মাগীকে

বক্ষে করে, ঐ মাগীই এখন আবার বড়দির পেয়ারের দাসী হয়েছে!

সরযূ। তবে ঐ হারামজাদীই নিয়েছে, আমি মনে করছিলুম —বাড়ীর ঝি, ও কি চুরি কর্ত্তে পারে?

সাবিত্রী। ও মাগী সব কর্ত্তে পারে, তবে এখন বামাল বেরুবে কিনা সন্দেহ, যিনি রক্ষক তিনিই যে ভক্ষক হয়েছেন? তবে দেখি কতদূর কি হয়, বলিয়া দুই জনে মনমরা হইয়া রন্ধন শালায় বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণের পর অমরেন্দ্র সন্ধ্যা-পূজা শেষ করিয়া রন্ধন গৃহে আসিয়া বলিলেন—কি গো! আজ এখনও ভাত হয়নি?

ভাসুরকে গৃহ প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেওয়ালের ধারে সরিয়া গেল, সাবিত্রী মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিলেন—দেখ, আজ একটা হানি হয়েছে, তাই বড়ই ভাবনায় পড়েছি!

অমর। এর মধ্যে আবার তোমাদের কি হানি হলো?

সাবিত্রী। দেখ, ছোট বউয়ের মাথার চিরুণীখানা পাওয়া যাচ্ছে না; সে বালিসের নীচে রেখেছিল। দুপুর বেলা ক্ষীরী এসে ঘরে ঢুক্‌লে, সে বাহিরে আমার কাছে চলে আসে, তারপর আর খোঁজ করা হয়নি, এখন বিছানা কর্‌তে গিয়ে আর চিরুণী পাচ্ছে না।

অমর। তবেই হয়েছে, এ তোমার হারের জো হলো আর কি, ঐ মাগী যে পেট হাতড়ায় তা কি তুমি জান না?

সাবিত্রী। আমি ত জানি, ছোট বউ ত আর তা জানে না, তাই ও তত সাবধান হয়নি।

অমর। সাবিত্রী, দেখ, আমাদের এখন সময় বড় খারাপ, তার উপর তোমাদের অসাবধানতা হলে বড়ই দোষের হবে; ছেলে মানুষের জিনিসটা গেলো; নিখিল কি মনে কর্ব্বে? যাই হউক, তুমি রামধনকে ভাত দাও, আমি একবার দেখি—বলিয়া অমর ক্ষীরোদার উদ্দেশে দাদার বাড়ী গমন করিলেন।

নরেন্দ্র তখন ইয়ার-বন্ধু লইয়া সন্ধ্যার পর অন্য দিনের মত আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে আর তত শত্রুতা নাই, হাজার হউক, মার পেটের ভাই, এক রক্তের যোগ ত? এখন অমরের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে অতি বড় দুষমনও যখন তাঁকে ভালবাসে, তখন এ তো বড় ভাই, কেবল মাগীই যত নষ্টের গোড়া বইত নয়।

অমরকে দেখিয়া নরেন্দ্র বলিলেন—কেন অমর! কোন কাজ আছে কি ভাই?

অমর। হাঁ দাদা, একটা কথা আছে, একবার শুনুন।

নরেন্দ্র শশব্যস্তে প্রাঙ্গনে নামিয়া আসিতেছেন, এমন সময় ক্ষীরোদাও চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছিল। "যাকে দেখে করি ভয়, তারি সঙ্গে দেখা হয়।" অমর দাদার কাণে কাণে সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। এ সকল বিষয়ে নরেনবাবু বড়ই কড়া লোক; তিনি আধার সমেত চায়ের পিয়ালাগুলি হাতে করিয়া রোয়াকে রাখিয়া বলিলেন—ক্ষীরোদা, তুই এই কর্ম্মে বুঝি আজ ছোট

বউমাকে আনতে গিয়েছিলি? যাই হউক, ছেলে মানুষের চিরুণী খানির আর কতই দাম হবে, তুই ফেলে দে, আমি তার বদলে তোকে টাকা দিব এখন?

ক্ষীরোদা যেন একবারে আকাশ হইতে পড়িল—বিষম আশ্চর্য্যের সহিত বলিল—হাঁ, কি গো বড়বাবু, কি বল্লেন—ছোট বউয়ের চিরুণী কি?

নরেন্দ্র। এই যে অমর বলতে এসেছে, তুই তাঁর ঘরে দুপুর বেলা ঢুকেছিলি, তার পর থেকে চিরুণী পাওয়া যাচ্ছেনা?

ক্ষীরোদা স্বভাবসিদ্ধ রাগতস্বরে বলিল—ভদ্দরলোকের কি একটা বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই, তাই যাকে তাকে চোর বলা, কেন, আমরা দাসীগিরি কর্ত্তে এসেছি বলে কি, আমাদের জাত গেছে?

নরেন। তোর যে স্বভাব খারাপ, অনেকবার যে করেছিস, তাই সন্দেহ হয়।

ক্ষীরোদা নাকি সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কখন কি করেছি বলে, এখনও কি তাই আছে গা, তোমরা কেমন ভদ্দর লোক?

অমর অতি বিনীতস্বরে বলিলেন—দেখ ক্ষীরো, আমার জিনিষ হলে, আমি সন্ধান কর্ত্তে আসতাম না, যা বরাতে ছিল—হয়েছে বলে চুপ করে থাকতাম। কিন্তু এ ছেলে মানুষের জিনিস, সে কান্না কাটী কচ্চে। আর নিখিল শুনলে সুমুখে কিছু বলতে না পারুক, মনে মনে কি কর্ব্বে বল্ দেখি? তাই বলছি, তুই কিছু

নিয়ে জিনিষটাকে ফেলে দে, আমি কারু কাছে প্রকাশ কর্ব্বোনা।

ক্ষীরোদা বড় বউয়ের আদরের ঝি, বিশেষতঃ এখন সে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া বড়ই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। সে অমরের কথা শুন্‌বে কেন? এতক্ষণ বড়বাবু বলিতেছিলেন—তাই কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছিল কিন্তু অমরের কথা শুনিয়া সে ক্রুদ্ধা সাপিনীর ন্যায় বলিল—মেজোবাবু! সাবধান হয়ে কথা কহিও, আমি তোমার দাসী নই যে, যা ইচ্ছা তাই বল্‌বে, মুখ সাম্‌লে কথা না কইলে সমান সমান উত্তর পাবে? ক্ষীরোদা মনে করিয়াছিল—অমরকে গালাগালী দিলে বড়বাবু বোধ হয় রাগ করিবেন না, বরং সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু হতভাগিনী জানে না যে ভায়ে ভায়ে হাজার শত্রুতা থাকিলেও অপর একজন তাহার অপমান করিলে সে কখনই তাহা সহ্য করিতে পারে না।

অমরের প্রতি ক্ষীরোদার অপমানসূচক কথা শুনিয়া নরেনের হৃদয় তন্ত্রীতে ঘা পড়িল, তাহার সেই পূর্ব্বেকার অবস্থার কথা স্মরণ হইল। অমর যখন বালক মাত্র, তখন তাঁহার জননী জীবিত আছেন, তিনিই বলিয়া দিতেন—যাও ত বাবা! দাদার জুতা ঝাড়িয়া দাও ত? বালক উঠি-পড়ি করিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কর্দ্দমাক্ত জুতা ঝাড়িয়া যথাস্থানে রক্ষা করিত। নরেন্দ্র অমরকে এত ভালবাসিতেন যে, সে কাছে বসিয়া না থাকিলে তাঁহার খাওয়া হইত না। আর নিখিলকে ত মায়ের স্থান অধিকার করিয়া দুইভায়ে মানুষ করিতে হইয়াছে, জননী ত তাহার ছয় মাসের পর

পিতৃবিয়োগে একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন। অমর বড় দাদাকে পিতার মত মান্য করিতেন, নরেনও তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। হায়! সে দিন আর নাই! পরের মেয়ের প্ররোচনায় সেই ভাইকে আজ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িল—তিনি রাগে অস্থির হইয়া "কি হারামজাদী, যত বড় মুখ তত বড় কথা, ওকি তোমার যোগ্য নয়" বলিয়া একটা ধাক্কা মারিলেন; ক্ষীরোদা পড়িয়া গেল—কাপড় সামলাইতে গিয়া পেট্‌কাপড়ের দ্রব্যটী বাহির হইয়া পড়িল, অমর কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন—কি ক্ষীরোদা! এ জিনিসটা কি? চোর ধরা পড়িলে আর কথা কহিতে পারে না। সে আমৃতা আমৃতা করিয়া পালাইবার উপক্রম করিল, নরেন বাবু তাহাকে হৃদ্দ মুদ্দ প্রহার দিয়া পুলীশে দিবার উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময় চেঁচামেচী শুনিয়া উপরের বারান্দায় এক স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল, নরেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া আর কোন হাঙ্গামা করিলেন না, ক্ষীরোদকে বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করিয়া অমরকে বিদায় দিলেন। তার পর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া আমোদে মত্ত হইলেন কিন্তু সে দিন তত আমোদেও তাঁর আমোদ হইল না, অমন যে বিলাতী একের নম্বর ব্রাণ্ডী, তাহাতে তত নেশা জমিল না। কি যেন একটা দুশ্চিন্তা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মস্তিষ্ককে গুলাইয়া দিয়া ছিল। দারুণ দুশ্চিন্তা জুটিলে মদেও তত নেশা হয় না—শুনা গিয়াছে।

ক্ষীরোদা প্রাণের ভাই অমরকে অপমান করিয়াছে বলিয়া দুশ্চিন্তা, না স্ত্রীর সম্মুখে ক্ষীরোদাকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া সেই দুশ্চিন্তা? আমাদের বোধ হয় দ্বিতীয় চিন্তাই অতিশয় বলবতী। হায়! স্ত্রীরূপিণী প্রবল শক্তিকে দেখিয়া নরেন্দ্রের সকল শক্তিই লুপ্ত হইয়াছিল, তাই যথার্থ অপরাধীকে সাজা দেওয়া হইল না। ক্ষীরোদা যে অম্বিকার খাস্ পেয়ার বাঁদী।

(৭)

আপনার পক্ষে যতক্ষণ কোনও গলদ বাহির হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ মানুষ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া খুব যুঝিতে পারে, কিন্তু কোনও গলদ বাহির হইয়া পড়িলেই তখন সে মুষড়াইয়া যায়, নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, আর যেন সে কার্য্যে তত জোর উৎসাহ থাকে না। ভাল লোক হইলে সে সেই ঘটনা হইতেই সমস্ত মিটমাট করিয়া ফেলে, আর যদি একান্ত খারাপ লোক হয়, তাহা হইলে ছিনে জোঁকের মত নাছোড়বান্দা হইয়া শেষ অবধি দেখিয়া থাকে, তাহাতে তার হার হউক আর জীৎই হউক?

বড়বউ অম্বিকা ছোটবউকে অনাদর করায় সে মেজোবউয়ের কাছে চলিয়া গিয়াছে, মেজোবউ এখন একটা সহায় পাইয়া খুব ফুলিয়া উঠিবে, টাকা কড়ি পাইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে, ইহা তাহার সহ্য হইবে না। বড় বউয়ের যত কিছু রাগ সাবিত্রীর উপর,

কারণ সে পাড়ার সকলের প্রিয়, অতএব তাহাকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে—এই তার উদ্দেশ্য, ছোট বউয়ের সঙ্গে ত তাঁর কোনও মনোমালিন্য নাই ? এই ছোট বউই আবার তাহার পরম শত্রু মেজো বউয়ের সহিত যোগ দিয়াছে, ইহাই হইল অম্বিকার গাত্রদাহ, আর এই জন্য সে স্বামীকে বলিয়া ক্ষীরোদা দ্বারা তাহাকে আনিতে পাঠাইয়াছিল কিন্তু ছোট লোক ক্ষীরোদা যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া চুরী করিবে, তাহা সে জানিত না, এবং এমন কার্য্য করিতে অম্বিকা কখন তাহাকে পরামর্শও দেয় নাই কিন্তু যখন সে করিয়া ফেলিয়াছে এবং ধরা পড়িয়াছে, তখন এমন একজন পরম মন্ত্রনাদাতৃকে, এমন একজন পরম হিতৈষিনীকে বিপদে রক্ষা করা উচিত মনে করিয়া মা আমার রক্ষাকালীরূপে বারান্দায় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং সেই ঘোরা ভয়ঙ্করী মুর্ত্তি দেখিয়া নরেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ভয়ে আত্মাপুরুষ শুখাইয়া গিয়াছিল, তাই আজ ক্ষীরোদা রক্ষা পাইল, নতুবা এক্ষেত্রে তাহার অবস্থার ব্যবস্থা থাকিত না।

ক্ষীরোদা ঘটিত ব্যাপারে নরেন্দ্ররও সে দিন মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। ছোট বউমা কি মনে করিবে, এই ভাবিয়া মনে মনে বড় চিন্তার উদয় হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আজ তাহার আমোদ হইল না, নেশা জমিল না, তাই যত শীঘ্র পারেন, বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং মনের দুঃখে যৎসামান্য আহার করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন।

অম্বিকা আজ স্বামীকে কত মন্ত্রণা দিবে, মেজো দেবরের বিপক্ষে কত চুকলী গাহিবে, স্থির করিয়াছিল কিন্তু চোর ধরা পড়িয়া সমস্ত মাটী হইয়া গেল, এতদূর অগ্রসর হইয়া সমস্ত নষ্ট হইল দেখিয়া তাহারও মনটা আজ ভাল নয়, কাজেই স্বামীকে আর উত্যক্ত না করিয়া আহারাদির পর সেও শয়ন করিয়া সুখে না হউক, দুঃখে-কষ্টে পাশমড়া দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

নরেন্দ্রনাথের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া ভোরের বেলায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তাই উঠিতে বেলা হইতেছে, এখনও বাহিরে আসেন নাই। ডাক পিয়ন কিন্তু প্রাতের ডাকে একখানি চিঠি আনিয়া সদরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। দ্বারবান ভজন-লাল তখন দেউড়ীতে ছিল না। বাবুর নীচেয় আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সেও দোক্তা কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, হাঁকা হাঁকি শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া পত্রখানি লইয়া বরাবর উপরে বাবুর খাস্‌কামরায় গমন করিল।

বাবু সেইমাত্র উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেছিলেন। পত্রখানি হাতে পাইয়া মনে করিলেন, বুঝি নিখিল বউমাকে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছে কিন্তু অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তাড়া-তাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। ইহা ছোট বউমাকে লইয়া যাইবার জন্য নিখিলের পত্র নহে; তবে ছোট বউকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার জেঠাইমা পত্র লিখিয়াছেন, জেঠার অবস্থা বড় খারাপ, বাঁচিবার আশা নাই, তাই লোক দিয়া

রামধন ও সরযুকে পাঠাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন।

যখন এমন বিপদ, তখন পাঠান নিশ্চয়ই আবশ্যক, নইলে তাঁহারা মনে করিবেন কি? বিশেষতঃ ছোট বউমা—শৈশবে মাতৃপিতৃহীনা, জেঠা-জেঠাইমাই তাঁহার বাপ মায়ের অপেক্ষাও বেশী, এইজন্য পাঠাইতেই হইবে। তাই তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন—কি হচ্ছে গো, আজ আর একবার উঁকিও মারছো না যে?

অম্বিকা পাশের ঘরে খোকাকে খাবার খাওয়াইতে ছিলেন। ক্ষীরোদার কাজে তাঁহারও আজ স্বামীর কাছে মুখ দেখান ভার হইয়াছে, তাই এতক্ষণ আসিতে পারেন নাই, পুত্রকে খাবার খাওয়াইতে খাওয়াইতে মতলব ভাঁজিতে ছিলেন—এখন কি করা যায়, কি করিয়া আবার স্বামীর নিকট সাধু হওয়া যায়! তিনি হয়ত তাঁহাকেই এরূপ নীচ চক্রান্তে জড়িত বলিয়া মনে করিতেছেন। এমন সময় ডাক শুনিয়া সানন্দচিত্তে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন--হুজুরের কি হুকুম?

নরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি বড় আদালতে যে-আরজী পেশ করেছিলে, তাহার হুকুম আসিয়াছে—পড়িয়া দেখ?

অম্বিকা। আমি আর কি পড়িব, তুমিত পড়েছ, কি বলো না শুনি?

নরেন্দ্র। এ বড় আদালতের হুকুম অমান্য করো না, দেখই না পড়ে!

অম্বিকা। ছোট-কর্ত্তা বুঝি ছোট গিন্নীকে পাঠাতে লিখেছে ?

নরেন্দ্র। ছোট কর্ত্তা না লিখুন, তুমি যার জন্মে এত কর্চ্ছো, ছোট গিন্নীকে মেজোগিন্নীর সঙ্গে আলাদা কর্ত্তে যে উঠেপড়ে লেগেছ, এইবার তা হয়েছে, তার জেঠার অবস্থা খারাপ, তাই তার জেঠাইমা পাঠাতে লিখেছে।

অম্বিকা মুখখানি ভার ভার করিয়া বলিলেন—সব দোষই বুঝি আমার ঘাড়ে, আমি কেবল মেজগিন্নীর সঙ্গে ছোটগিন্নীকে আলাদা করবার চেষ্টা করছি, আর বুঝি কেউ নয় ? বলিয়া পত্র খানি হাতে লইলেন এবং পড়িয়া বলিলেন—এখন কি কব্বে ?

"ভজনলালকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও" তাঁর মত কি জেনে আসুক। বলিয়া তিনি নীচে গমন করিলেন। অম্বিকা ভজনকে দিয়া পত্র খানি সরযুর কাছে পাঠাইয়া দিল।

সরযু পত্র পাঠ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইল। "জেঠ যে তাহার সব, তিনি বাল্যকাল থেকে যে তাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মে সরযু কখনও বাপ মায়ের অভাব বোধ করে নাই। অমন জেঠা মহাশয়ের অন্তিম শয্যায়, সরযু একবার চক্ষের দেখার জন্ম অস্থির হইল। তার পর বরাতে যাহা আছে-তাহাই হইবে। সরযু বলিল—মেজদি, এখন কি হবে ?

সাবিত্রী বলিলেন—অত অস্থির হলে চল্‌বে না, বিপদে ধৈর্য্যই মূল! তুই অপেক্ষা কর, আমি ভজনকে জিজ্ঞাসা করি।

ভজনলাল বহুদিনের চাকর, সে বহুদিন রায়েদের বাটী দ্বারবানী করিতেছে। সে সকল বাবুকেই সমান মান্য করে, ক্ষীরোদার মত সে আধুনিক নহে, তাই জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল— ছোট মাজী, আভি যানে মাঙ্গে ত হাঁম লে যানে শেক্তা হ্যায় ?

সাবিত্রী। বড়বাবু কি বল্লেন—ভজন ?

ভজন। বড় বাবুজী আউর বড়মা বোলা হ্যায়, ছোট মা যদি যানে মাঙ্গে ত পাল্‌কী করকে দেবীপুর পৌঁছায় দেও।

সাবিত্রী সরযুর মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—ভজন! তবে তুমি পালকা নিয়ে এসো, ছোটবউয়ের মত আছে। ভজন পালকী আনিয়া সরযু ও রামধনকে দেবীপুরে রাখিয়া আসিতে গমন করিল। ভজন বহুদিনের নিমকের চাকর, বাড়ীর কোন কাজে তাহাকে অবিশ্বাস নাই। ছোটবউ চলিয়া গেলে অম্বিকা হাঁপ ছাড়িয়া মনে মনে বলিলেন—বাঁচা গেল, আর কোন ঝঞ্ঝাট কর্ত্তে হলো না, আপনাপনি কাজ হাঁসিল হলো, একেই বলে—"যা শত্রুর পরে পরে"।

ছোটবউ চলিয়া যাইবার পর স্বামী-স্ত্রীতে যে ব্যবধান টুকু স্থান পাইয়াছিল, ক্ষীরোদা ঘটিত ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্যটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা ঘুচিয়া গেল, আবার হাসি মুখে কথা হইল, সময়ে সময়ে মেজো কর্ত্তার প্রতি আক্রোশ-বাণ ছাড়িতে ত্রুটী হইল না। এবার একেবারে গ্রাম ছাড়া করিবার ইচ্ছা, তবে আর এমন ভাবে নয়, যাহাতে ঠকিতে না হয়, সেইরূপ বুঝাইয়া সুঝাইয়া আস্তে আস্তে কাজ করিতে

হইবে। নরেনবাবু মনে করিয়াছিলেন—ছোটবউ চলিয়া গেলে বড়বউ বোধ হয় অমরের প্রতি কোনও হিংসা করিবে না। কিন্তু স্বভাব যায় না মোলে, রায় বংশ ছারখার না করিয়া কি তার হিংসাবৃত্তি নিবৃত্তি হইবে? তবে 'উপরে ভগবান আছেন, যদি তিনি শেষ রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা, নতুবা আর উপায় নাই।

ক্ষীরোদা একেবারে বরখাস্ত হয় নাই। তবে বড়বাবুর নজরে সে আর আসিতে পারে না। গুপ্তভাবে সে অম্বিকাকেই সাহায্য করে—মন্ত্রনা দেয়। সে দিনকার কৃত কার্য্যের জন্য বড়গিন্নীর নিকট সে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে, এমন ছোট কাজ করিয়া আর সে তাহাদের মাথা হেঁট করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাই বড়বউ প্রাণের মন্ত্রিকে আবার কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তবে তাহাকে ঘরের মধ্যে স্থান দিবে না আর বাটীর কোন কাজে পাঠাইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায়—এ যাত্রা ক্ষীরোদার অন্নজল উঠিয়া যাইল না।

(৮)

এই ঘটনার পর পাঁচ ছয় বৎসর আর নরেনের ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী চাপে নাই, তিনি স্ত্রীর কথা শুনিয়া আর অমর-সাবিত্রীকে জ্বালাতন করেন নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিবেক বুদ্ধি বেশী দিন থাকে না—ইহা যে সাধন সাপেক্ষ। নরেন

এখন আবার একটু একটু করিয়া স্ত্রীর প্ররোচনায় অমরের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

পাঁচু এখন একটু বড় হইয়াছে, সে খুড়া-খুড়ীমার স্নেহে বড় মুগ্ধ; তাই সময় নাই, অসময় নাই সে অমরের দাওয়ায় বসিয়া সাবিত্রীর সহিত কত আদরের কথা কয়, কত খাওয়া-পরার বাহেনা করে, অমর-সাবিত্রী তাহা অকাতরে সহ্য করেন। নিজের ছেলের এত আবদারও বুঝি কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে না। সাবিত্রীর পুত্র হয় নাই—এ কথা তিনি একদিনও ভাবেন না; পাঁচু যখন তাহার ঘর আলো করিয়া, প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়া অহরহঃ প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়, আনন্দে নাচিয়া খেলিয়া তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে, তখন তাহাদের পুত্র নাইবা হইল? বড়ভাইয়ের পুত্র কি তাহার পর, সে যে তাঁহারই বংশের দুলাল, গৃহের আলো, সাবিত্রী ও অমর পাঁচুকে পাইয়া পুত্রের অভাব বোধ করিতেন না।

নরেন্দ্রত কিছু করেন না, অম্বিকাও এ কয় বৎসর পাঁচুকে আটক করিতে পারে নাই, এখন কিন্তু পাঁচু খুড়া খুড়ীর কাছে আসিলে বিরক্ত হয়, আসিতে নিষেধ করে কিন্তু বালকের স্বভাব যেখানে আদর অভ্যর্থনা পায়, হাজার নির্য্যাতীত হইলেও সে সেখানে আসিতে ছাড়ে না, পাঁচু তাই করিত। মাতার অতিরিক্ত প্রহার খাইয়াও সে লুকাইয়া লুকাইয়া সাবিত্রীর নিকট আহার করিয়া যাইত।

নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি এতদিন পরে জ্বলিয়া উঠিবার কারণ,

কলেক্টারীর খাজনা! নিখিল আর কোন খোঁজ খবর লয় না; বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না কিন্তু কালেক্টারী দিতে হয়—নরেন্দ্রকে। তিনি অমরকে বলিলেন—এইবার হইতে আমি আর খাজনা দিব না, বিষয় তোমাদেরও ত, আমার ত আর একার নহে? অমর বলিলেন—দাদা! আপনি সমস্তই ভোগ দখল করিতেছেন। আমরা উহার এক কপর্দ্দক গ্রহণ করি না, আপনার আয়ও যথেষ্ট রহিয়াছে, আমার কিছু মাত্র আয় নাই, ভিক্ষা সম্বল, সে ক্ষেত্রে আমি কেমন করিয়া কালেক্টারী দিব। আপনি ত উহার আয় হইতে অনায়াসে খাজনা দিতে পারেন?

নিখিল টাকা পাঠায় না, অমরও গ্রাহ্য করে না। কাজেই নরেন্দ্রও খাজনা দিলেন না, মনে করিলেন—যখন চাপ পড়িবে, তখন দিতে হইবে, না হয় নিলাম হইয়া যাইবে, তখন তিনি বেনামী করিয়া ডাকিয়া, উহা নিজের খাস্ করিয়া লইবেন. কিন্তু অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি, একজনের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। বিষয় লাটে উঠিলে, নিলামে বিক্রয় হইলে যে বেশী টাকা দিবে—তাহারই হইবে। বিষয় নিলামে উঠিল, নরেন্দ্র তাহাতে ডাক দিলেন কিন্তু নিত্যানন্দপুরের জমীদার রতনবাবু তাহার অপেক্ষা বেশী দিতে চাহিলে বিষয় তাঁহারই হস্তগত হইল। নরেন্দ্র হালে পানি পাইলেন না, এত টাকা তাহার নাই। তার পর নরেন্দ্রের সহিত উহাদের চিরবিবাদ, তাহাকে বিপাকে ফেলাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অমর ও নিখিলের প্রতি রতনবাবুর কোনও আক্রোশ নাই কিন্তু ভ্রাতার সঙ্গে পড়িয়া

তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হইল। নিলাম খরিদের পর জমী দখলের জন্য ঢোল সরহদ্দ হইল, নরেন্দ্র বলিলেন—আর কি হইবে, এ বুনো দেশে থাকা অপেক্ষা কলিকাতায় গিয়া বাস করিব। পৈতৃক বাস্তু পরের হইল—ইহাতে নরেন্দ্র ও অম্বিকার প্রাণে কিছু মাত্র আঘাত লাগিল না, বরং আনন্দই হইল। কিন্তু অমরের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল—হায়! এতদিনের পবিত্র বাস্তু, পিতৃপিতামহের পবিত্র নাম বসন্তপুর হইতে লোপ হইল? যেদিন রতনবাবু বাস্তু দখল করিলেন—অমর সাবিত্রী সেদিন আর উদরে অন্ন দিতে পারিলেন না।

রতনবাবু কিছু দিন সময় দিয়াছেন। অমরকে ডাকিয়া, বলিয়াছেন—অমর? তুমি বামনদাস বাবুর যথার্থ ধার্ম্মিক পুত্র, তোমার উপর আমার কোনরূপ আক্রোশ নাই; তুমি যেরূপ কাজ করিতেছ, তাহা মানব জীবনের আদর্শ এবং গ্রামের মুখোজ্জ্বল, তুমি যতদিন পার থাক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না, তোমার দাদার জন্য কেবল আমাকে উহা খরিদ করিতে হইল, উহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, তোমাদের ফাঁকি দিয়া নিজে বেনামী করিয়া ডাকিয়া লয়, বুঝিতে পারিয়া আমি বেশী দামে উহা খরিদ করিয়াছি, নতুবা তোমাদের এ বিষয়ের এত দাম নয়। তাহার ন্যায় স্ত্রৈণ পুরুষকে জব্দ করাই আমার উদ্দেশ্য।

জমীদার রতনবাবুর কথায় অমর বাহ্যিক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন বটে কিন্তু অন্তরে বলিলেন—পর ভাতি ভাল, তবু পর ঘরী কিছু নয়। দাদার বিষয় যাওয়াতে আমাদেরও গেল,

এখন যত শীঘ্র পারি, এস্থান ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিব। পৈতৃক এ বাস্তুতে একদিন কত ক্রিয়া কলাপ হইয়াছে, কত দোল দুর্গোৎসব হইয়াছে। এখন সেই স্থানে আবার কত কি দেখিতে হইবে? হয়ত কত অনাচার-অত্যাচার এই পবিত্র স্থানে আচরিত হইবে, সেই সকল স্বচক্ষে দেখা অপেক্ষা স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অমরেন্দ্রনাথ রতনবাবুকে বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করত চলিয়া আসিলেন, এদিকে নরেন্দ্রও কলিকাতায় যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অমর কি করিবে, না করিবে—তাহা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

পাঁচু আর আসে না, তাহার চাঁদমুখ দেখিলে অমর ও সাবিত্রী সকল কষ্ট ভুলিয়া যান, দাদা ও বউদি না হয় আমাদের প্রতি বিরূপ কিন্তু বংশের দুলাল, ভবিষ্যৎ আশার ধন পাঁচু বাঁচিয়া থাকিলে সময়ে খুড়া-খুড়ী বলিয়া বুঝিতে পরিবে, সে ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত হইয়া বংশের মান রাখিবে। দাদার পুত্রে আর নিজের পুত্রে প্রভেদ কি? অমর-সাবিত্রীর প্রাণ এত উদার, মন এত পবিত্র কিন্তু যেথানে যত পবিত্রতা, যেথানে যত ধর্ম্ম, ভগবান বুঝি সেইখানে তত দুঃখ কষ্টের পালান দিয়া রাখেন! সেই দিন হইতে পাঁচু আর আসে না, অম্বিকা তাহাকে আসিতে দেয় না। বুঝাইয়া রাখিয়াছে—বাটীর বাহির হইলে পুলীশের লোক ধরিয়া লইয়া যাইবে, ছেলে মানুষের উপর তাহাদের রাগ বেশী! দুধের বালকও মার কথা শুনিয়া আর ভয়ে বাটীর বাহির হয় না।

সাবিত্রী এককালে বাপমায়ের খুব আদুরে মেয়ে ছিল, দুঃখের লেশ মাত্র সহ্য করেন নাই কিন্তু বিবাহ হইয়া অবধি যে কয় দিন শাশুড়ী-শ্বশুর বর্ত্তমান ছিলেন, অতুল সুখে কাটাইয়া তাঁহাদের স্বর্গ গমনের পর অনবরত অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিতেছেন। খাওয়ার দুঃখ, পরার দুঃখ, তার উপর নানাবিধ মর্ম্মদুঃখ, মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে? তবে স্বামীর সুখই তাঁহাকে সকল দুঃখে অতুল আনন্দ দান করিত বলিয়া তিনি অধীরা হইয়া পড়েন নাই। গ্রাম জুড়িয়া তাঁহার খোস্‌নাম, ধার্ম্মিক আখ্যা শুনিয়া সাবিত্রী এত কষ্টের মধ্যেও খুব আনন্দে জীবনের গণা দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিলেন, বাস্তবিক অমরের মত স্বামী পাইলে হিন্দু-স্ত্রী গাছ তলায় থাকিয়া স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারে।

আনন্দময়ী সাবিত্রী ধর্ম্মপ্রাণ অমরের সহবাসে অতুল সুখে ছিলেন কিন্তু এ সুখও বুঝি ভগবান তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে দিলেন না। সরযু পিতৃগৃহে যাইবার পর সাবিত্রীর প্রাণটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল। কিছু না হউক, সমস্ত দিন দুইজনে প্রাণের কথাবর্ত্তা কহিয়াও সুখে কাটাইতে পারিতেন কিন্তু সে আর কাছে নাই, সেখানে তাহার জেঠামহাশয় মারা যাইবার পর বৃদ্ধা জেঠাইমা ও তাহার একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে না থাকিলে যে তাহাদের চলে না।

প্রাণের দিদি সাবিত্রীকে না দেখিয়া সরযু যদিও চারিদিক শূন্য দেখিতেছেন, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে সে মাতৃসমা জেঠাই-

মাকে এ অসময়ে রাখিয়া আসিতে পারে না। এখানে সাবিত্রীও তাহাকে না দেখিয়া, তাহার সহিত প্রাণের কথা না কহিয়া দিন দিন যেন মলিন হইয়া যাইতেছেন। নিখিল পত্র লিখিলেও, পত্নীকে লইয়া যাইবার কথা জানাইলেও, না হয় তাহাকে আনা হইত কিন্তু সে যখন কোনও খোঁজ লয় না, তখন নিজের সুখের জন্য সাবিত্রী সরযুকে এমন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে কখনও বলিতে পারেন না। কাজেই সরযুর সঙ্গলাভ এখন অতিশয় দুর্ঘট! অমর দুই একবার কলিকাতায় গিয়া নিখিলের সন্ধান লইয়া ছিলেন কিন্তু পূর্ব্ব ঠিকানায় সে আর না থাকায় কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই, আর এত বড় বিস্তীর্ণ সহর কলিকাতায় নিখিলের মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করাও কি সহজ?

সরযু কাঁদিয়া কাটিয়া পত্র লিখিলে অমর থাকিতে পারেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্ধানে গমন করেন কিন্তু বৃথা। কেহই তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে না। একটা স্থানের স্থিরতা না করিয়া সমস্ত সহরটা খোঁজ করিলে, কে নিখিলের ন্যায় একজন সামান্য লোকের সন্ধান বলিয়া দিবে? অমর, তথাপি যাইতেন, সমস্ত দিন এদিক ওদিক করিয়া সন্ধ্যাকালে হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিতেন।

প্রাণের ভগ্নী সরযুর এরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ও সাবিত্রীকে সময়ে সময়ে বিশেষ নাড়াচাড়া দিত। নিখিল উপায়ক্ষম হইয়া স্ত্রীর খোঁজ লয় না, সরলা সরযুর ভাগ্যে কি শেষে এই ছিল?

সরযুর জন্য সাবিত্রী ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করেন; আর পাঁচু আসিয়া তাঁহার প্রাণে অশেষ আনন্দ প্রদান করে, তাই তিনি এত কষ্টের মধ্যেও বালকের সেই হাসি খেলার সাথী হইয়া এক প্রকার সুখে-দুঃখে দিন কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু হটাৎ তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হওয়ায়, ভাসুরের বুদ্ধি দোষে তাহাদের বাস্তু নিলাম হওয়ায় এবং পাঁচুর আগমনে বাঁধা পড়ায়, সাবিত্রী যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অমর তখনও যেমন, এখনও তেমন, সমস্ত দিন ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত, তার পর অতিথি সেবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় গৃহে আসেন। সাবিত্রী সেই নির্ব্বান্ধব পুরীতে এতরাত্রি অবধি একাকিনী থাকেন, কেবল প্রাণ হু হু করে—মন বিষাদে ভরিয়া যায়।

অমর ততরাত্রে দ্রব্যাদি লইয়া আসিলে তাঁহাকে খাওইয়া তার পর সামান্য মাত্র আহার করিয়া সমস্ত রাত্রি পর দিন অতিথি সেবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়, কোন দিন একটু নিদ্রা হয়, কোন দিন হয় না। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে সাবিত্রীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, সোণার দেহ দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছিল। অমর জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—শরীর কখন কিরূপ থাকে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? আমাকে একটু কাহিল দেখিতেছ বটে কিন্তু কই আমার শারীরিক বলের তো কিছু লাঘব হয় নাই। অসুক বিসুখও ত কিছু অনুভব করিতে পারি না। অমর তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া একজন দাসী নিযুক্ত করিলেন। যাহাতে পরিশ্রমের লাঘব হয়। কিন্তু সাবিত্রী

তাহাকে রাখিলেন না। বলিলেন—আমার কি হইয়াছে যে দাসী রাখিতে হইবে? আমি কি খাটিতে অক্ষম? তিনি কিছুতেই দাসী রাখিয়া খরচ বাড়াইতে চাহিলেন না।

এত পরিশ্রম করিয়া ও সাবিত্রীর স্বাস্থ্য বেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল তাহাদের বাস্তু নিলামের পর পাঁচকড়ির দর্শন না পাওয়ায় সাবিত্রীর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। অতিরিক্ত চিন্তা ও পরিশ্রমে তাহার রাত্রে একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। সরযূ কাছে থাকিলে বুঝিতে পারিত কিন্তু সেও নাই. অমরও রাত্রে হরিসভায় অবস্থান করিতেন, কাজেই রোগ ধরা পড়িল না। তার উপর পরিশ্রম ও স্নানাহার চলিতে লাগিল। কাজেই রোগ কি আর চাপা থাকে, সে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সাবিত্রীকে পাড়িয়া ফেলিল। সাবিত্রী শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

অমর তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সাবিত্রী কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ মত কার্য্য করিলেন না। গৃহে আর কেহই নাই, তিনি একমাত্র কর্ত্রী; অমর যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন, ততক্ষণ চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, স্ত্রীর সেবা করিতেন, তিনি বাটির বাহির হইলে আর কেই বা দেখে, কেই বা রাখে? রন্ধনের জন্য আমাদের পূর্ব্বোক্ত শ্যামার মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, সাবিত্রী লুকাইয়া লুকাইয়া কুপথ্য করিতেন—যাহা খাইতে নিষেধ বা যাহা করিতে চিকিৎসক বারণ করিয়াছেন, তাহাই করিতেন। তিনি বুঝিতে স্ত্রীলোকের আবার এত বাঁধাবাঁধি কি? পুরুষের অমূল্য প্রাণ

রক্ষার জন্যই এত কড়াকড়ি নিয়ম করিতে হয়, স্ত্রীলোকের প্রাণ কি সহজে যাইবার, তাই এত করিব? বুদ্ধিহীনা রমণীগণ এইরূপ বুদ্ধি দোষেই কত সোণার সংসার শ্মশান করিয়াছে—কত বাসগৃহ ছারখার করিয়াছে।

সাবিত্রীর সমস্ত দ্রব্যে অরুচি হইয়াছে, আর কালস্বরূপ অরুচিই তাহার সোণার দেহ, অসীমরূপসৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া কালের কবলে টানিয়া আনিতেছে! একদিন রজনী যোগে শ্যামার মা রন্ধনাদি করিয়া দিয়া বলিল—বৌ মা! আমার শ্যামার আজ শরীর ভাল নয়, আমি একটু সকাল সকাল গৃহে যাইতেছি, তুমি অমর আসিলে তাহাকে অন্নব্যঞ্জন ধরিয়া দিও, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া গেলাম। শ্যামার মা চলিয়া গেল।

অমর প্রতিদিন রাত্রি দশটার নীচে গৃহে আসেন না, সন্ধ্যা-কালে হরিসভায় কীর্ত্তনাদি শেষ হইলে, লোকজন সমস্ত গৃহে গমন করিলে তিনি প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া ইষ্ট দেবীর নাম জপে তন্ময় হইয়া থাকেন, তারপর ইষ্ট-তুষ্টি সম্পাদন করিয়া চিত্ত প্রসাদ লাভ হইলে, আনন্দে বিভোর হইয়া বাটী আগমন করেন। অমর মহাশাক্ত ছিলেন। শাক্ত বলিতে এখন যাহা বুঝায়, মদ্যমাংস উদরস্থ করিবার জন্য তন্ত্রের সাধন-ভজন, এখন যেমন লোকের অভ্যস্থ হইয়াছে, অমর সেরূপ ছিলেন না! যে প্রকৃতি লইয়া আরাধনা করিলে মায়ের আসন টলে, মাকে পাওয়া যায়, অমর সেই প্রকৃতি লইয়া সাধনা করিতেন। তিনি শক্তি উপাসক বলিয়া

সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না। শক্তি উপাসকের সমস্ত বিষয় গোপন রাখিতে হয়, এ সাধনা এইজন্য সকলে করিতে পারে না! যে যথার্থ শাক্ত, সেই পরম বৈষ্ণব, যে যথার্থ বৈষ্ণব সেই পরম শাক্ত। ভগবান মহাবিষ্ণুই যে পরম শাক্ত, তবে তাঁহার উপাসকগণ শাক্ত না হইবেন কেন? আর মা আদ্যাশক্তি যে পরম বৈষ্ণবী তবে তাহার উপাসকগণ বিষ্ণুভক্তিপরাঙ্মুখ হইবে কিরূপে? অমর হৃদয়ে মায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাহিরে সদাশিবকে প্রহরি রাখিয়া বদনে অনবরত হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া সাধনার চরম সীমায় উঠিয়া ছিলেন। সকলে তাহাকে চিনিত না, বুঝিতে পারিত না বলিয়াই ঘোর সংসারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি যে ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, এই সংসারে থাকিয়াই তিনি যথার্থ সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্য যাহা কিছু পাইতেন, তাহা সঞ্চয় না করিয়া সমস্ত দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ কর্ম্মেই আসক্তি বড় বেশী ছিল। এই আসক্তি মায়ের দেওয়া অনাশক্তিরই পূর্ব্ব লক্ষণ।

বর্ষাকাল। অমর এখনও গৃহে আসেন নাই, শ্যামার মাও সাবিত্রীকে রাখিয়া বাটী চলিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী এত রুগ্ন শরীরেও স্বামীর আহারীয় দ্রব্য কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঝুপ ঝাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, মাটীর রন্ধন গৃহে ইন্দুরের উৎপাত, তাই সাবিত্রী আহারীয় দ্রব্যে ধামা ঢাকা দিয়া অবশ দেহে সেই ভিজা মাটীর উপর অঞ্চল বিস্তার করিয়া শয়ন করিয়াছেন। সাবিত্রী নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন, ইন্দুর

সকল চারিদিকে কিছমিছ করিতেছে। তারপর ইন্দুরের গর্ত্ত মধ্যে ওকি, ফোঁশ্ ফোঁশ্ করিয়া বাহির হইল? একবার গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া সাবিত্রীকে দংশন করতঃ রন্ধ্রপথে পলায়ন করিল—সাবিত্রী তাহা জানিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অমর গৃহে আসিলেন, পত্নীকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি নিঃশব্দে ঘুমাইতেছেন। অমর রন্ধন গৃহের শীকল মোচন করিয়া দেখিলেন—দরিদ্রের অমূল্য নিধি, তাঁহার প্রাণের সাবিত্রী ধুলায় ধূসরিতা। একে পীড়িতা, তাহাতে ভিজা মাটীতে শয়ন, আমার মা বুঝি চলিয়া গিয়াছে? তিনি শশব্যস্তে আসিয়া বাহু বেষ্টনে ডাকিলেন—সাবিত্রী! আনন্দ প্রতিমা!

সাবিত্রী একবার মাত্র চাহিলেন, স্বামীর পদধূলি মাথায় লইলেন কিন্তু কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না, গলা ধরিয়া গিয়াছে, স্বর বন্ধ হইয়া আসিয়াছে; মুখে ফেণা নির্গত হইতেছে, শরীর নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অমর বিপদ গণিলেন—বুঝিলেন—সর্পাঘাত হইয়াছে, সাবিত্রী তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রতিবাসী একজনকে ডাকিয়া বিষ চিকিৎসক আনিতে পাঠাইলেন কিন্তু চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী অমরকে একাকী রাখিয়া অমরধামে গমন করিলেন। কিসে কি হইল, অমর বুঝিতে পারিলেন না। প্রতিবেশী সকলেই সাবিত্রীর এইরূপ অকস্মাৎ মৃত্যুতে হায় হায় করিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—এমন সতীলক্ষ্মী আর হয় না, রায়-বংশ এইবার সত্য সত্যই লক্ষ্মী ছাড়া হইল।

পাড়ার সকলে আসিয়া অমরের দারুণ বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল কিন্তু মায়ের পেটের ভাই নরেন্দ্র একবার চক্ষের দেখা দেখিতে, কি এই ভীষণ বিপদে ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন না। অমর সাবিত্রীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, সকলেই মনে করিল—স্ত্রীবিয়োগে অমর নিশ্চয়ই পাগল হইয়া যাইবে, কিন্তু একি! তাঁহার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জলও বাহির হইল না। সকলে যখন শবদেহ নদীতীরে লইয়া গেল। অমরও তখন তাহাদের সহিত হরিবোল দিয়া সহযাত্রা করিলেন।

সাবিত্রীর মৃত্যু যখন সর্পাঘাতে হইয়াছে—ইহা সাব্যস্থ হইল, তখন আর তাঁহার দেহে অগ্নি সংস্কার করা হইল না। সোণার প্রতিমা, পরম পবিত্র সতীমূর্ত্তি পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র সলিলে বিসর্জ্জন করা হইল। মা সন্তান-বৎসলা ভাগিরথী পবিত্র প্রতিমা বক্ষে লইয়া নাচিতে নাচিতে সাগরপানে ছুটিলেন! অমর একবার পলকহীন দৃষ্টিতে দেখিলেন—তাঁহার সোণার কমল বিষ্ণু-পাদোদ্‌ভবা গঙ্গানীরে শোভা পাইল। তারপর হরিধ্বনি করিয়া বাটী ফিরিলেন কিন্তু গৃহের মধ্যে আর ঢুকিলেন না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর অমর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুঝি এ সকল মানবীয় ধর্ম্ম তিনি সহধর্ম্মিণীর সহিত সেই দিনেই গঙ্গানীরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সাবিত্রীর মৃত্যুর পর অমরের পরোপকার ব্রতটা যেন আরও বেশী রকম চাপিয়া

ধরিয়াছে। তখন সংসার করিতে, আহারের পর নিদ্রা যাইতে যেটুকু সময় যাইত, এখন সেটুকুও এই কাজে দিয়াছেন। আর্ত্তের সেবা, পরের শবদাহ প্রভৃতি কাজ পূর্ব্বে যেরূপ করিতেন, এখন তাহা অপেক্ষাও অনেক বাড়িয়াছে। তখন ঘরের প্রতি একটা টান ছিল—এখন তাহা নাই, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়াও পরের উপকার করিতেছেন, তথাপি ধনীর দ্বারস্থ হইতেছেন না। দরিদ্রই তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল। পাড়ার সকলে অমরের এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতে লাগিল। সকলে টানাটানি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইত—শোয়াইত কিন্তু পাষণ্ড নরেন্দ্র এবিপদে একদিনও তাঁহাকে ডাকেন নাই। অমরের এই দুর্ব্বিসহ বিপদের তিনদিন পরেই তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিলেন। রতনবাবু ভয়ানক তাড়া দিতেছেন, আর কি থাকা যায়? পাঁচু কিন্তু দুই তিনবার কাকার সেই সন্তাপিত প্রাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়াছিল—"ওগো তোমরা একবার আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একবার কাকীমার কাছে যাই" বলিয়া কত চিৎকার করিয়াছিল কিন্তু বড়বধূর হুকুমে ভজনলাল তাহাকে একটী গৃহে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে সে কাকার ত্রিসীমানায় আসিতে না পারে। হায়! ভ্রাতৃস্নেহ, ইহা অপেক্ষা শত্রুর শত্রুতাও যে অশেষ সান্ত্বনাদায়ক!

তৃতীয় খণ্ড।

(১)

বহুদিন হইল—আমাদের নিখিলের কোনও সংবাদ গ্রহণ করা হয় নাই। এইবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব। মধ্যে তাঁহার সময় অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল কিন্তু এখন আবার তাহা ফিরিয়াছে। পুরুষের দশ দশা, অদৃষ্ট কখন কিরূপ থাকে—বলা যায় না। অদৃষ্ট গগন মাঝে কিছু দিন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকিলেও এখন আবার নূতন কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়া, তাঁহার মেঘমলিনতা বিদূরিত হইয়া অতিশয় নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছে। উপায় উপার্জ্জন খুব হইতেছে—নাম ডাকও খুব বাড়িয়াছে।

নিখিল সরল প্রকৃতির যুবক, চরিত্র গঙ্গাবারির ন্যায় অতি পবিত্র, এত ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াও তাহাতে কোনও প্রকার ব্যভিচার দোষ প্রবেশ করে নাই, আজ পর্য্যন্ত ঠিক বংশোচিত গুণে বিভূষিত থাকিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিয়া চা পান, অখাদ্য-

কুখাদ্য ভক্ষণ, এখনও নিখিলের স্বভাবে স্থান পায় নাই। হোটেলে আহারাদি করিলেও যতদূর সম্ভব তিনি শুদ্ধাচারে এবং স্বধর্ম্মে কাল কাটাইতেছেন। দেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের মনোমালিন্য দেখিয়া তিনি আর টাকা পাঠান না। কাহার মান রাখিতে গিয়া কাহাকে অপমান করিয়া শেষে অধর্ম্মের ভাগী হইবেন? তাঁহার নিকট বড় ও মেজো দাদা উভয়েই সমান, উভয়ের নিকটেই যে তিনি সমান ভাবে ঋণী, অতএব একবার দেশে যাইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া তাহার পর কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন কিন্তু যাইব যাইব করিয়া—এই দুই বৎসরের মধ্যে যাওয়াও হইল না, বিবাদ ভঞ্জনও হইল না, এই জন্য রক্ষোরাজ রাবণ শ্রীরাম চন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং" শুভ কাজ মনে হইলেই করিয়া ফেলিবে, কাল বিলম্ব করিবে না, আর অশুভ কর্ম্মে কালবিলম্ব করাই বিধেয়। নিখিল করিব করিব করিয়া শুভ কাজ ফেলিয়া রাখিলেন কিন্তু ইহাতে যে ক্ষতি হইল, তাহা এ জীবনে আর পূর্ণ হইবে না। সতী সাবিত্রী অকপটে নিজের সমস্ত গাত্র-অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া দেবরকে এম্, এ পড়াইলেন, কত আশা করিয়াছিলেন—সে মানুষ হইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু দুঃখে দুঃখে, অসীম কষ্টে সতী বুকের আশা বুকে করিয়া স্বর্গগত হইলেন, মাতৃসমা মধ্যম ভ্রাতৃজায়ার সহিত তাঁহার একবার দেখাও হইল না। নিখিল জানিলেন না, তাহার বুদ্ধি দোষে কি একটা বিষম সর্ব্বনাশ—কি একটা ভয়ানক অনর্থপাত ঘটিয়া গেল।

তাঁহাদের সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশত্যাগী হইয়াছেন, মধ্যম ভ্রাতা এখন দেশত্যাগী না হইলেও গৃহশূন্য; সতীর স্বর্গ গমনে সকল আসক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইবার উপক্রম করিয়াছেন। হায়! নিখিল, সময় আর কবে হইবে, কবে আর উপকারের প্রত্যুপকার করিবে? মানব জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সময় যে চলিয়া যায়? যে বড় আশা করিয়া তোমার মুখ চাহিয়া ছিল—সে এখন কোথায়! মাতৃসমা মেজো বউয়ের আশা পূর্ণ করিতে ভগবান কি আর তোমায় কোন সুযোগ প্রদান করিবেন?

নিখিল ভ্রাতাদের কোন সন্ধান গ্রহণ করেন নাই, এমন কি স্ত্রীরও কোন প্রকার সন্ধান লইতে তাঁহার অবসর নাই, তিনি এমনি কাজে ব্যস্ত। কলেজের অধ্যাপকতা করিয়া তিনি প্রত্যহ কয়েক স্থানে গৃহ-শিক্ষকতা করেন, এইজন্য তাঁহার তিল মাত্র সময় নাই। তখন সময়ে সময়ে পত্র দিতেন, কিছু কিছু পাঠাইতেন কিন্তু বিষম গৃহ-বিবাদে পাছে কাহারও মনক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলেন, এই জন্য সে সমস্তও বন্ধ করিয়াছেন। যখন দাদারা এবং বউ দিদিরা রহিয়াছেন, তখন সরযু যেখানে হউক সুখেই থাকিবে, সে ছোট, তাহার অনাদর কেহই করিবে না। কিন্তু সেও যে পিত্রালয়ের নিবান্ধব পুরীতে একাকিনী পড়িয়া রহিল, নিখিল তাহাও জানিতে পারিলেন না। সরযু মাঝে মাঝে পত্র দিলে কেহ উত্তর দিক আর নাই দিক, সাবিত্রী তাহার উত্তর দিতেন; বিশেষ আশা-ভরসা দিয়া পত্র লিখিয়া সরযুর নিরাশ হৃদয়ে আশার

সঞ্চার করিতেন কিন্তু এখন আর পত্রের উত্তর পায় না, সে সেখানে ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে। হায়! সেও জানে না যে তাহার প্রাণের দিদি, সুখে দুঃখে সম সঙ্গিনী সাবিত্রী আর ইহসংসারে নাই, সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি অকালে স্বর্গ-গমন করিয়াছেন। ধন উপার্জ্জনের সময় নিজেকে অজর-অমর মনে করিয়া কার্য্য করিতে হয়, নতুবা উপায়ের পথ প্রশস্ত হয় না। নিখিল তাহাই করিতেন, তিলমাত্র সময় নষ্ট করিতেন না।

তিনি যে বাসায় থাকিতেন, তাহার পাশের বৃহৎ অট্টালিকায় ব্রজেশ্বর বন্দোপাধ্যায় নামক একজন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী আসিয়া বাস লইয়াছেন। ব্রজেশ্বর বাবুর একটী পুত্র, নাম দেবেন্দ্র, আর একটী কন্যা নাম মনোরমা। স্ত্রীর নাম গৌরী দেবী। ব্রজেশ্বর যখন স্বকার্য্যে ছিলেন, তখনই তাঁহার চালচলন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, ঠিক সাহেবী ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আহারে বিহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রও পিতার অনুকরণ করিয়াছিল কিন্তু গৌরী দেবীর জন্য কন্যা মনোরমা ততটা হইতে পারে নাই। তবে এত বলিয়া কহিয়াও তাহাকে ঠিক স্বভাবে রাখিতে মাতাও অপারক হইয়াছিলেন। যেখানে সব একাকার, সেখানে তরলমতি বালক বালিকাকে স্বভাবে রাখা বড়ই কঠিন। ব্রজেশ্বর পুত্রকে সাহেবী চাল-চলন শিক্ষা দিতেন, মাতা তাহাতে কিছু বলিতেন না, কারণ বেটা ছেলের সব শোভা পাইবে, কিন্তু

কন্যাকে যতদূর ক্ষমতা টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কর্ত্তার উপদেশ মত চলিতে নিষেধ করিতেন। তাহাতে মনোরমা আধা স্বদেশী, আধা বিদেশী ধরণে চলিতে অভ্যস্তা হইয়াছিল।

ব্রজেশ্বর বাবুর বাহির এরূপ ধরণের হইলেও অন্তঃপুর পবিত্রতার আধার ছিল, গৌরীদেবী সেখানে কোনও প্রকার অনাচার প্রবিষ্ট হইতে দিতেন না। গৃহিণীর নিকট কর্ত্তার কোন জারীজুরীও খাটিত না। অহিন্দু ধরণের শিক্ষা দিলে গৃহিণী রাগিয়া যাইতেন, বলিতেন বাপ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আজ আবার তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না কি? আমি ঐ প্রকার আচারের প্রশ্রয় দিব না। তুমি যাহা করিতে হয় বাহিরে করিও। জমীদার পুত্রী গৌরীদেবীর কথার উপর ব্রজেশ্বর কোনও কথা কহিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মাসহারা হইতেই কর্ত্তার এখনও এত জারীজুরী, নতুবা দুইশত টাকা মাসিক পেন্‌সনে কি এরূপ চালে চলিতে পারা যায়?

গৌরীদেবী জমীদারের কন্যা বলিয়া কোন অহঙ্কার করিতেন না; স্বামীকে তিনি দেবতার মত জ্ঞান করিতেন—প্রত্যহ পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তবে তিনি অনাচারের প্রশ্রয় দিতেন না, বিশেষতঃ অন্দরের মধ্যে বিদেশী ভাব কিছুতেই প্রবেশ লাভ করিতে পাইত না। হিন্দুর অন্তঃপুরই ত পার্থিব স্বর্গ, আর গৃহিণীই ত সেই স্বর্গের সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। স্বামী দেবতা, স্বভাব দোষে আহারে-বিহারে কিছু

ব্যতিক্রম করিলে তত যায় আসে না, কারণ দেবতার পাতিত্য দোষ নাই। হিন্দুর যত কিছু বাঁধা বাঁধি, যত কিছু ধর্ম্ম, যত কিছু মহিমা সবই স্ত্রীজাতির উপর, ইহাদের জন্যই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর স্ত্রীর জন্যই হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব।

চিরকাল রাজার অধীনে বড় চাকুরী করিয়া ব্রজেশ্বর বিদেশীয় হাব-ভাব মণ্ডিত হইয়াছেন, এখন হটাৎ ছাড়িয়া দিলে পাছে স্বামীর কোন অনিষ্ট হয়, এজন্য যতদূর সম্ভব গৌরীদেবী তাঁহাকে ধীরে ধীরে ছাড়িতে বলিতেন, তিনিও তাহা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন কিন্তু যে গুলি অস্থিমজ্জার সহিত গাঁথা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর এ বয়সে ছাড়া যায় কেমন করিয়া?

বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদ কখন অন্তঃপুরে যাইত না, গৌরীদেবী স্বামীকে সে সকল বাহিরে রাখিয়া পবিত্র হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেন। পত্নী যাহাতে অসন্তুষ্ট হন, ব্রজেশ্বরও তাহা করিতেন না, বাহিরেই তাঁহার যতকিছু কার্য্য সমাহিত হইত। তবে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অনেক কদভ্যাস ক্রমশঃ ছাড়িতে চেষ্টা করিতেছেন।

মনোরমা বড় হইয়াছে, হিন্দুর ঘরে এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা থাকে না, গৌরীদেবী তজ্জন্য স্বামীকে প্রত্যহ বিরক্ত করেন, বলেন তুমি কি কচ্ছো, মেয়েকে যে আর রাখা যায় না, এ কল্‌কাতা বলেই তাই, পাড়া গাঁ হলে তোমাকে একঘরে কর্ত্তো।

ব্রজেশ্বর বলেন—দেখ এইটেই তোমাদের বড় অন্যায় কথা,—তোমাদের শাস্ত্রও ত বলে—যতদিন ভাল পাত্র না পাওয়া যাবে,

ততদিন মেয়ের বিয়ে দিবে না, এতে মেয়ে যত বড় হয় হউক, পাত্র ভাল পাচ্ছি না, চেষ্টারও ত্রুটী কচ্ছি না দেখছো ত ?

স্বামীর সে বিষয়ে কোন ত্রুটী নাই, ঘটক লাগাইয়াছেন, তথাপি গৌরীদেবী প্রত্যহ এক একবার তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ছাড়েন না।

ব্রজেশ্বরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যে কলেজে এফ্ এ পড়েন, নিখিল সেই কলেজেই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ইংরাজী সাহিত্য এমন সুন্দর ভাবে অধ্যাপনা করান, যাহা সাহেব অধ্যাপকেও পারে না—তাহা এমন সুন্দর, এমন মর্ম্মস্পর্শী! এলাহাবাদে তিনি সাহেব অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াও এমন আনন্দ প্রাপ্ত হন নাই। দেবেন্দ্র প্রত্যহই আসিয়া পিতার নিকট শতমুখে নিখিলের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া অনবরত প্রস্তাব করেন। ব্রজেশ্বরও তাহাতে মত দিয়াছেন, এইবার নিখিলের মত হইলেই হয়। নিখিল কিন্তু আর কাজ জড়াইতে রাজি নহেন, ইহাতেই তাঁহার খাইবার-পরিবার এক প্রকার সময়াভাব হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন রবিবার প্রাতঃকালে ব্রজেশ্বর পুত্রকন্যা লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। এমন সময় নিখিল প্রাতঃভ্রমণ জন্য বাসা হইতে বাহির হইলেন—দেবেন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটে গমন করিয়া নমস্কার করতঃ তাহাদের গৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। নিখিল সরল

প্রকৃতির যুবক, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদের বৈঠক-খানায় আসিয়া যথারীতি ব্রজেশ্বরকে অভিবাদন করিলেন। দেবেন্দ্র পিতার নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করিল। ব্রজেশ্বর তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া চেয়ার সরাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন।

নিখিল অনুরোধ রক্ষা করত আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। নিখিলের সরল স্বভাব দেখিয়া ব্রজেশ্বর মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বলিলেন—আমার পুত্র ও কন্যাটীর ভার আপনাকে লইতেই হইবে। নিখিল দুই একবার বলিলেন—দেখুন! আমি অনেক জড়াইয়াছি আর আমার দ্বারা সুবিধা হইবে না; কলিকাতায় আরও অনেক কৃতবিদ্য অধ্যাপক রহিয়াছেন—আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আপনি তাঁদের দেখিলে বোধ হয়, দেবেন্দ্রের বেশী কাজ হইতে পারে! ব্রজেশ্বর পুত্রের মুখে তাঁহার গুণপণার কথা শুনিয়াছিলেন, কাজেই ছাড়িলেন না, অগত্যা নিখিলকে সম্মত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সেইদিন হইতে নিখিল দেবেন্দ্র ও মনোরমার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিখিল প্রত্যহ পড়াইতে যাইতেন, ব্রজেশ্বর তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন। নিখিলের সরল ও হিন্দুয়ানী ব্যবহার শুনিয়া অন্তঃপুরে গৌরীদেবীও তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতে লাগিলেন, বৈকালে প্রায়ই সুন্দর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। নিখিল মেসে থাকিয়া এমন পবিত্র রুচিকর দ্রব্য কখন আহার করিতে পাইতেন না।

প্রতিদিন আসিতে আসিতে একদিন ব্রজেশ্বর বলিলেন—নিখিলবাবু! আপনি প্রাতঃকালে চা পান করেন না কেন? উহা যে আপনাদের মত অনুশীলনশীল অধ্যাপকের বিশেষ স্বাস্থ্য-প্রদ ও পরম উপকারী!

নিখিল আজীবন তাহাতে অভ্যস্ত নহেন—ইহার অভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ন হয় নাই। ব্রজেশ্বর প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে চা পান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন—আমি আজীবন উহাতে অভ্যস্ত নই এবং তাহার জন্য আমার শরীর একদিনের জন্যও খারাপ হয় নাই।

ব্রজেশ্বর বলিলেন—আচ্ছা! আপনি একদিন একটু পান করিয়া দেখুন দেখি, দেহে কিরূপ স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন?

নিখিল হাত নাড়িয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আমি মোটেই ওসব পছন্দ করি না, বা কখন উহা ব্যবহার করিবার আবশ্যকও হয় নাই। আপনি দুঃখিত হবেন না। মেসের সকলে এবং দেবেনও জানে যে আমার চা পানে অভ্যাস নাই।

দেবেন্দ্র পার্শ্বে বসিয়া পড়িতেছিল—সে বলিল, না বাবা! মাষ্টার মশাই উহাতে আদৌ অভ্যস্ত নন্, সেদিন ঐ কথা নিয়ে ওঁর সঙ্গে একটী ভদ্রলোকের খুব তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছলো, সেই থেকে আমি জানি—উনি চা পানের বিষম বিরোধী।

ব্রজেশ্বর মনে মনে বড়ই চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন—এইত, এমন একটা বড় শিক্ষিত অধ্যাপক, বহুদিন সহরে রহিয়াছেন—ধনী, মানী, গুণীও বটেন, কই ইনিত চা খান না? কলিকাতা

সহর—সভ্যতার আকর, আবাল্য এখানে লেখাপড়া শিখিয়াও ত কই ইঁহার কোন প্রকার বাবুয়ানা বা চাল-চলনের বিকৃতি হয় নাই? ঠিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের মত সমস্ত বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, কেবল আমরাই অধঃপাতে গিয়াছি। ইত্যাকার চিন্তা করিয়া তিনি নিজের তুলনায় নিজেই অত্যন্ত লজ্জানুভব করিলেন। কিন্তু কি হইবে, এ আদর্শ ত এতদিন তাঁহার সম্মুখে খাড়া হয় নাই—তাহা হইলে এতদূর অগ্রসর করাইতে পারিত না। এখন যে ইহা মজ্জাগত হইয়াছে, ছাড়িবার আর উপায় কোথায়?

(২)

দেবেন্দ্র ও মনোরমার শিক্ষার ভার নিখিলেন্দ্র গ্রহণ করায় ব্রজেশ্বর ও গৌরীদেবী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন উপযুক্ত শিক্ষক আর পাওয়া যাইবে না—ছাত্র-ছাত্রীকে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, নিখিলেন্দ্র যেমন জানেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ জানে না। দেবেন তাঁহার শিক্ষকতার বড়ই পক্ষপাতী, আর মনোরমা শুধু শিক্ষকতায় নহে, তাঁহার ভদ্রতায়, তাঁহার অমায়িকতায় এবং তাঁহার গুণের পক্ষপাতী, মাষ্টার মহাশয় তাহাকে খুব যত্ন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নিখিল যেখানে শিক্ষকতা করেন—কখনও ফাঁকি দেন না, যেমন-তেমন করিয়া সময় কাটাইয়া মাসিক মাহিনা লওয়া তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি যথার্থ পরিশ্রম করিয়া ছাত্রকে বেশ সুন্দররূপ পাঠ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া তবে মাহিনা গ্রহণ করেন। যে ছাত্র বা

ছাত্রী তাঁহার কথার অবাধ্য হয়—পাঠে অমনোযোগী হয়, কিছু দিন দেখিয়া তিনি তাহাদের অধ্যাপনা কার্য্যে ইস্তফা প্রদান করেন, কারণ ছাত্র যদি শিক্ষা না করিল, উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে না পারিল, তবে আর বৃথা বদ্‌নাম কিনিয়া পিতামাতার টাকা খরচ করায় ফল কি?

দেবেন্দ্র ও মনোরমা বেশ মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেছে দেখিয়া নিখিলও খুব আগ্রহের সহিত তাহাদের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। দেবেন যখন পড়িতে আসিত, তখন মনোরমা আসিত না, কারণ দুইজনকে একত্র পড়াইলে কাহারও ফল হইবে না। শিক্ষাকার্য্যে নিখিলের নিপুণতা দেখিয়া ব্রজেশ্বর ও গৌরীদেবী বড়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। এত অল্প বয়সে নিখিলের এরূপ পাণ্ডিত্য, এরূপ ধর্ম্মভাব দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। একদিন স্বামী-স্ত্রীতে বলাবলি করিতেছেন —নিখিলের মত অমন একটী সুন্দর পাত্রে মনোরমাকে দিতে পারিলে তাহাদের কন্যাদান সার্থক হয়, আহা! ভগবান্ যেমন রূপ দিয়াছেন, গুণও কি সেইরূপ?

নিখিলের করে মনোরমাকে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা ব্রজেশ্বর প্রকাশ করিলে গৌরীদেবী বলিলেন—অমন পাত্র কি আর এখনও অবিবাহিত আছে?

ব্রজেশ্বর। আমি শুনিয়াছি—উঁহার মা বাপ নাই, ভাইয়েরা কি আর এত শীঘ্র উঁহার বিবাহ দিয়াছেন? আর দিবে বা কখন, উঁহার আর বয়স কত, খুব বেশী হয় ত ২৮।২৯ বৎসর, তা লেখা

পড়া শিখিতেই ত কাটিয়া গিয়াছে, আমার বোধ হয়—উহার বিবাহ হয় নাই, আর হলেই বা দোষ কি, এক পাত্রে কি আর দুই কন্যা সম্প্রদান করা চলে না?

গৌরী। তা কি হয়, জেনে শুনে একজনের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে যাওয়া কি ভাল, আর তাতে যে মনোরমার ভাল হবে—তাই বা কেমন করে জানলে, হয় ত হিতে বিপরীত হতে পারে, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে কাজ না করলে কারও ভাল হয় না।

ব্রজেশ্বর। তুমি কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই মরলে, স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আবার ধর্ম্ম কি, প্রাজ্ঞলোকে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করে থাকে, আমরাত আর তাকে ফাঁকি দিচ্ছি না, অমন সুন্দরী মেয়ে দিব, আর টাকা কড়িও যথেষ্ট দিব। তার পর যদি ওঁর বিয়ে হয়েই থাকে—আর দুইজনে যদি বনিবনাও না হয়, তাহা হইলে সে দেশে থাকবে আর মনোরমা আমাদের কাছেই থাকবে। তবুত একটা সৎপাত্রে কন্যাদান করা হলো, দেখতে শুনতে এবং লোকের কাছে বলতে কইতে খুব ভাল। মুখ উজ্জ্বল বই মাথা হেঁট হইবে না?

গৌরী। তবে এতই যদি ইচ্ছে হয়েছে ত একবার নিখিলকে জিজ্ঞাসা করেই দেখনা, মত জানতে দোষ কি?

ব্রজেশ্বর স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আজ নিখিলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর পাঠাভ্যাস করিয়া দেবেন্দ্র চলিয়া গিয়াছে—মনোরমা আজ আর রাত্রে পড়িতে আসে নাই। সে প্রতিদিন রাত্রে দাদার পড়িবার পর আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের

নিকট পড়া দিত, নূতন পাঠ মুখস্থ করিত। বড় লোকের মেয়ে, আজ তাহার শরীরটা একটু অসুস্থ বলিয়া পড়িতে আসে নাই।

আহারাদি প্রস্তুত হইতে এখনও একটু বিলম্ব আছে। তাই ব্রজেশ্বর নিখিলের সহিত গল্প-গুজব করিতেছেন, তাঁহাদের দেশের অবস্থা, বাড়ীর অবস্থা, তাঁহাদের পরিচয় প্রভৃতি লইয়া প্রকারান্তরে বিবাহের মতামতটা জানিবেন—এই ইচ্ছা।

ব্রজেশ্বরের কথা শুনিয়া নিখিল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাড়ীর কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, সে কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! আমি এক সময়ে জমিদারের পুত্র ছিলাম, জমিজমাও যথেষ্ট ছিল। বড়দাদা সমস্ত নষ্ট করেছেন। দেশে দুই ভাই এবং দুই ভাজ আছেন। বড়দাদা একটু কড়া মেজাজ বলিয়া জমীদারের সঙ্গে মকর্দ্দমায় সমস্ত নষ্ট করেছেন। মেজোদাদা খুব ধার্ম্মিক প্রকৃতি, সংসারে তাঁহার আসক্তি কিছুমাত্র নাই, কেবল পরের উপকার করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন—এই ইচ্ছা, এই জন্য দুই ভাইয়ে মিল হয় না, বউয়ে বউয়েও এই জন্য অমিল। আমার বিবাহ হইয়াছে; স্ত্রী কখন দেশে, কখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট, কখন মধ্যম ভ্রাতার নিকট থাকে। বলিয়া নিখিল নীরব হইলেন।

ব্রজে। স্ত্রীকে কেন কলিকাতায় আনিয়া রাখেন না?

নিখিল। দেশে সকলেই রহিলেন—আর তাহাকে কলিকাতায় আনা যেন আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। কারণ কলিকাতা সহরটা উপায়েরই স্থান, আমাদের মত দরিদ্রের বাসস্থান নহে,

আর পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোক সহরে থাকিতেও পারে না। খাঁচার মধ্যে পাখী পোষার মত রাখিলে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, একবার আনিয়া কিছুদিন রাখিয়াছিলাম—তাহাতে সুফল হয় নাই, অনবরত গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া পীড়িত হইয়া পড়ায় বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি।

ব্রজে। দেখুন, যখন কলিকাতাই উপায়-উপার্জ্জনের স্থল, আর যখন এখানে থাকিতেই হইবে—তখন একাকী থাকা কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নহে, শরীরে সুখ-অসুখ ত আছে, কতদিন একাকী হোষ্টেলে পড়ে থাকবেন? আর আপনার যেরূপ সময়াভাব দেখিতেছি, তাহাতে দেশে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করাও চলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় আপনার বড়ই কষ্ট দেখছি।

নিখিল। তা বলে আর কি করি বলুন—ভগবান কষ্ট দিলে, কে রক্ষা করিবে?

ব্রজে। দেখুন, আপনার যেরূপ আয় তাহাতে কলিকাতায় একটী বিবাহ করিলে আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হয় না। এমন ত অনেকেরই থাকে, তবে কলহ-বিবাদের জন্য একত্র দুইজনকে না রাখিলেই হইল, ইহাতে আপনাকে একাকী থাকিতে হয় না, আর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে?

নিখিল। মাপ্ করুন, আর দুইটী বিবাহে কাজ নাই—সংসারের যে অবস্থা, তাহাতে পূর্ব্বে জান্‌লে একটা বিবাহই করিতাম না, আবার দুইটা। স্ত্রীর আমার দোষ কি, যে তাহার মনে কষ্ট দিয়ে, আবার একটা বিবাহ করিব?

ব্রজে। দোষের জন্য নয়, স্বাস্থ্যের অনুরোধে, বাস্তবিক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সহরে থাক্‌তে পারে না, তা আমি বিশেষ জানি, তাই বল্‌ছি?

নিখিল আর কোন উত্তর করিলেন না, যেন এ সকল কথা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, ব্রজেশ্বরও একদিনে আর বেশীদূর অগ্রসর হইলেন না, আহারাদি প্রস্তুত হইয়াছিল—দুইজনে আহারে বসিলেন। গৌরীদেবীকে দেখিয়া নিখিলের মাতৃভাব উদ্দীপিত হইল, তিনি বহুদিন এমন করিয়া আহারে বসেন নাই। আজ মনে হইতে লাগিল যেন, তাঁহার জননী স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া গৌরীরূপে তাঁহার ভোজনে বাৎসল্যভাব দেখাইতেছেন। ব্রজেশ্বর এমন আচার-ভ্রষ্ট, কিন্তু একি! গৃহ যে তাঁহার স্বর্গ, গৌরীই যে এ স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মরি মরি, এমন ধর্ম্মভাব যাঁর গৃহে, বাহিরের ভাব তাঁর এত পঙ্কিল কেন?

আহারাদির পর ব্রজেশ্বরের নিকট বিদায় লইয়া নিখিল হোষ্টেলে শয়ন করিতে গেলেন। আজ নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভোরপুর হইয়াছে। প্রথম চিন্তা সরযুর, সে এখন কোথায়, কেমন আছে? আগুনের দাহিকাশক্তি যেমন আগুনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকে, তদ্রূপ সরযূও নিখিলের সহিত অভেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নিখিল সেই সতীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিতে পারেন না, তবে অদর্শন জনিত উভয়ের যে কষ্ট, সে কেবল সংসারের বিশৃঙ্খলতা হেতু। নিখিল কেবল ভয় করেন—কোন্ দিক রক্ষা করি, মেজ্‌দার দিক—কি বড়দার দিক! আর সেই জন্যই সরযুরও বিচ্ছেদ যন্ত্রণার অন্ত নাই।

মনোরমা পড়িতে আসে—যত পড়া হউক আর নাই হউক, সে নিখিলকে নিজের হাব-ভাবে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু নিখিল তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না, তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য করেন। যাহা করিতে যান, তাহাই করিয়া চলিয়া আসেন, মনোরমার চেষ্টা সেখানে কোন কার্য্যকরী হয় না। যাহার প্রাণ সরযূর প্রাণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, যাহার প্রাণ সরযূর বশীকরণ মন্ত্রে সবশ হইয়া গিয়াছে, কয়দিন মাত্র না দেখায় কি তাহা পরের বশ হইতে পারে ?

মা জানিতেন না, পিতা বুঝিতেন না, মনোরমা কিন্তু এই কয়েক মাসেই নিখিলকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিবার জন্য ধীরে ধীরে আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। নিখিলের রূপ, তাঁহার গুণ যে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। কুরঙ্গিণী যাহাতে বাণবিদ্ধ—জালাবদ্ধ হয়, নিখিলের যে সে সমস্তই ছিল, তবে হরিণীর প্রাণ অপহৃত হবে না কেন ?

নিখিল কিছুদিন পরে তাহা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তাহার উপর বিরক্ত হইলেন না, বিরক্ত হইলেন তাহার পিতা—আহাম্মুক ব্রজেশ্বরের উপর, মনোরমার সতেজ যৌবনের এই অসহ্য অভাব-আকাঙ্ক্ষা, তাহার হৃদয়ের দারুণ বেদনা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। অন্যে হইলে মনোরমার এ মর্ম্মবেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেন কিন্তু এ আশ্চর্য্য চরিত্র যুবক তাহার দিক দিয়াও যাইলেন না, কেবল তাহার পিতামাতার উপর হাড়ে চটিয়া, তিনি ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। পরস্ত্রী মাতার সমান,—পূজার বস্তু, কুৎসিৎ ভাব কি এখানে স্থান পায়?

একের অধিক বস্তু একস্থানে একসময়ে থাকিতে পারে না। যেখানে সরযূর প্রেম দৃঢ়রূপে আসন পাতিয়াছে, সেখানে হঠাৎ নূতন একটা প্রেমের বস্তু কেমন করিয়া স্থান পাইবে? আর সরযূর প্রেমে এবং মনোরমার প্রেমে যে পার্থক্য অনেক। সরযূর প্রেম নিঃস্বার্থভাব জড়িত, স্বর্গীয় কুসুমগন্ধে আমোদিত—যাহা নিখিলের হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে জড়িত থাকিয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে; আজ হঠাৎ মনোরমার এ পুতিগন্ধময় সৌরভ সেখানে প্রবেশ করাইয়া তিনি মনের চাঞ্চল্য আনিবেন কেন? ঘোর কষ্টে, দারুণ অভাবে পড়িয়াও সতী স্ত্রী পতিকে হৃদয়দানে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, ধীরে ধীরে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া প্রাণের সর্ব্বস্ব দানে নিস্কামভাবে পতি সোহাগিনী হইতে চায়, হিন্দুর দাম্পত্য মিলন এইরূপে দুই দেহে এক আত্মা হইয়া থাকে! কেবল কামগন্ধ লইয়া, স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা লইয়া তাহাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে। নিখিল এখন খুব দৃঢ়—খুব বলিষ্ঠ, চিত্তবৃত্তি নিরোধে এখন সে যোগজ্যোতিসম্পন্ন হইয়াছে। তবে সুদূর ভবিষ্যতে এত প্রলোভনের মাঝে থাকিয়া সে অধঃপতিত, যোগ-বিচ্যুত, দুর্ব্বল চিত্ত হইবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? অগ্নির নিকট ঘৃত থাকিলে—কে বলিবে—তাহা গলিবে না! সময় হইতে সাবধান হইলে বোধ হয় নিখিল এ যাত্রা পরিত্রাণ পান কিন্তু ভাগ্যে যদি পতন থাকে, তবে রক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সাধন-মন্দির

বৈশাখ মাসের দারুণ মধ্যাহ্নে প্রাণ অস্থির, সূর্য্যের প্রখর কিরণে চারিদিক দগ্ধ হইতেছে. অসহ্য গ্রীষ্মে জীবজন্তু ছট্‌ফট্ করিয়া শীতলতা লাভের জন্য কেহ গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া মেজের উপরে, কেহ বা সরসী সলিলের আশ্রয় লইতেছে।

এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সময়ে গরম অতিশয় অসহ্য, তাহার উপর গা গরম হইলে, ভীষণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন।

আজ কয়েক দিন হইল—নিখিল ভীষণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০৪।৫ হইতেছে। একে অসহ্য গ্রীষ্ম—তায় দারুণ গাত্রদাহে নিখিল ছট্‌ফট্ করিতেছেন—ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। মেসের একটী নিভৃত কক্ষে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ব্রজেশ্বর ও গৌরীদেবী—যুবককে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে আসিতেছেন। দেবেন্দ্র অনবরত ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াত করিতেছে, আর মনোরমা সেত নিখিলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াই আছে। আজ জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, তাই প্রাতঃকাল হইতে মনোরমা নিখিলের সেবায় নিরত; নিখিল উৎকট গাত্রদাহে এপাশ ওপাশ করিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইতেছেন, আর মনোরমা অনবরত পাখা নাড়িয়া বাতাস করিতেছে, আইস-ব্যাগ মাথায় বসাইয়া দিতেছে, যুবক শয্যায় পড়িয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিখিল পিপাসায় কাতর হইয়া জল চাহিলেন, মনোরমা জলের পরিবর্ত্তে একটু দুধ দিল।

মেসে পড়িয়া থাকিলে সেবা শুশ্রূষার সুবিধা হয় না—তাই গৌরীদেবীর পরামর্শে ব্রজেশ্বর অদ্য তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন। নিখিলের একটু চেতনা হইলে মনোরমাকে পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিলেন—মনোরমা! কখন আসিয়াছ? তোমরা সকলে আমার জন্য যেরূপ কষ্ট করিতেছ—না জানি, পূর্ব্বজন্মে তোমরা আমার কে ছিলে?

মনোরমা বলিল—মাষ্টার মশায়! আমি সকাল বেলাই আসিয়াছি—আপনি তখন অচৈতন্য ছিলেন—জান্‌তে পারেন নাই; দাদা ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছেন—মা ও বাবা এখনি আসিবেন। তাঁহারা আর আপনাকে এখানে রাখিতে রাজী নহেন—অদ্য আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। নতুবা এখানে আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, আর আমাদের যাওয়া আসারও অসুবিধা, এবং ডাক্তার বাবুও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। নিখিল কষ্টবিজড়িতস্বরে বলিলেন—তোমার মা মূর্ত্তিমতী দয়া! তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন, এ সময় তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা।

মনোরমা। মাষ্টার মশায়! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আপনার সেবার বা চিকিৎসার কোন প্রকার ত্রুটী হইবে না। আপনি ঘরেই আছেন, বলিয়া মনে করিবেন।

নিখিল। হাঁ মনোরমা, তা দেখিতেছি, ঘরে হইলেও আমার এমন যত্ন, এমন চিকিৎসা হইত না। বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রজেশ্বর গাড়ী লইয়া আসিলেন। দেবেনও

ডাক্তারখানা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রে নিখিলকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। উভয়ে তাঁহাকে ধীরে ধীরে গাড়ীতে তুলিয়া নিজের বাটীতে আনিলেন।

গৌরীদেবীর স্বার্থহীন স্নেহ-ভালবাসায় এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিখিল প্রায় একমাস পরে সুস্থ হইলেন এবং পথ্য পাইলেন। এখন তিনি বেশ আরোগ্য হইয়া একটু একটু করিয়া বেড়াইতে পারেন।

আরও কিছুদিন গত হইলে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া নিজ কার্য্যে যোগদান করত পূর্ব্বের মত কার্য্য চালাইতে-ছেন। নিখিল রোগভোগের পর হইতে গৌরীদেবীর অনুরোধে মেসের বাসা ত্যাগ করিয়া এখন তাঁহাদের গৃহেই একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছেন। গৌরীদেবী যে কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিখিলকে এইরূপ করিতেছেন—তাহা নহে। তবে একজন বিদেশস্থ ভদ্রবংশীয় যুবকের অতি কষ্টে মেসে কালযাপন করা অপেক্ষা এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিলে দোষ কি—তাঁহাদের ত কোন প্রকার অভাব নাই? স্নেহের আধার গৌরীদেবীর প্রাণ এইরূপই উচ্চ ছিল, কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর ভাব স্বতন্ত্র—তিনি এইরূপ নানা উপকার-কৌশলে নিখিলকে জড়াইয়া রাখিয়া কন্যাটীকে সম্প্রদান করিবেন—এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু নিখিল তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী, তিনি এই বন্দোপাধ্যায় পরিবারের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ হইলেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য কিছুতেই

করিতে পারিবেন না। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে, তাহার মনে ব্যথা দিয়া অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে নিখিল হেন ধর্ম্মভীরু যুবক কখনই স্বীকৃত হইতে পারেন না।

মাষ্টার মহাশয় এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন, পুত্র কন্যার পাঠের আর কোন বাধা হইতেছে না। এখন তিনি সদাসর্ব্বদা বাড়ীতেই থাকেন, আহারাদি করিয়া কেবল কলেজে যান মাত্র। রোগভোগের পর তিনি অতিরিক্ত চিন্তা-পরিশ্রমের কাজ প্রায় সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেবল দেবেন ও মনোরমার শিক্ষকতা না করিলে নয়—তাই করিয়া থাকেন, আর দেবেন হেন মেধাবী ছাত্রকে পড়াইতে তাঁহার কোন কষ্ট নাই—একবার বলিয়া দিলেই যথেষ্ট।

মাষ্টার মহাশয়কে গৃহে রাখিয়া [illegible]রের খুব সুবিধা হইয়াছে। তিনি যখন যেখানে যাইতেন—নি[illegible]ক সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেন—নিখিলও সে অনুরোধ [illegible]তে পারিতেন না। সকালে বৈকালে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বেড়াই[illegible] যাইতেন—ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভাল হইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বর ভবানীপুরে কোন বন্ধুকে ইতিপূর্ব্বে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলেন। অনেক দিন হইল—তাহা আদায় হয় নাই। আজ নিখিলের সহিত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি সেই টাকা আদায়ের জন্য ভবানীপুরে গমন করিলেন এবং টাকা আদায় করিয়া বরাবর ধর্ম্মতলার মোড় পার হইয়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আসিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ব্রজেশ্বর সাহেবী ধরণের লোক; খাওয়া

পয়ার কোনও বিচার করিতেন না। গৌরীদেবীর ভয়ে ঘরে ততবেশী অনাচার না করিলেও বাহিরে বাহির হইয়া তিনি সাহেবদের হোটেলে ঢুকিয়া খানা খাইতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। তবে অখাদ্য কুখাদ্য খাইতেন কি না, তা ভগবানই জানেন।

বহুদিন পরে এই বড় হোটেলের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মুখে জল সরিতে লাগিল। তিনি সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—নিখিল, এস একবার হোটেলে যাই—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, শরীরটাও মেজ্‌মেজ্‌ করছে, একটু চা-বিস্কুট খাইয়া আসি। নিখিল বলিলেন—সে কি মশাই, এ যে সাহেবদের হোটেল, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া এখানে ঢুকিবেন কেমন করিয়া?

ব্রজেশ্বর। সাহেবদের ব'লে কি হিন্দুদের খাদ্য ওখানে নাই—এসই না, একবার দেখই না, বলিয়া নিখিলের হাত ধরিয়া টানাটানি করিলেন। নিখিল বলিলেন—মাপ্‌ করুন মশাই, আমি কিছুতেই উহার মধ্যে ঢুকিতে পারিব না, আপনি বরং যান, আমি এই গাড়ীতেই বসিয়া থাকি? অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নিখিল যাইলেন না, অগত্যা ব্রজেশ্বর একটু মনমরা হইয়া, প্রাণে একটু দুঃখ পাইয়া একাকী প্রবেশ করিলেন—তথাপি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নিখিলের প্রতি মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন—এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—এই হতভাগা যুবকটাকে আমি যেমন করিয়া হউক জাহান্নমে দিব—তবে ছাড়বো, দেখি এ কত প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে।

ব্রজেশ্বর চলিয়া যাইলে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া বসিয়া নিখিল মনে

করিতে লাগিলেন—ভগবান! এ তোমার কি মিলন-ব্যাপার। যাহার গৃহিণী এরূপ সতী সাবিত্রী, পবিত্রতার আধার, হিন্দু রমণীর আদর্শ; তাহার স্বামী কি না এইরূপ ব্যভিচারগ্রস্ত, ইংরাজী চাল চলন সম্পন্ন, এ তোমার কি যোটক-বিচার জগদীশ্! ব্রজেশ্বর যেরূপ অহিন্দু, তাহাতে এতদিন তিনি নানা প্রকার বিপদে জড়িত হইয়া পড়িতেন, কেবল অতুলনা হিন্দুললনা গৌরীদেবীর পুণ্যে এখনও এ সমস্ত পাপ কার্য্যের ফল ভোগ হইতে রক্ষা পাইতেছেন।

নিখিলকে আর বেশী ভাবিতে হইল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রজেশ্বর রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহে পৌঁছিলেন। গাড়ীতে আর তাঁহাদের বেশী কথা হইল না। মুখের দুর্গন্ধ হেতু ব্রজেশ্বর ইচ্ছা করিয়া বাক্যালাপ না করুন, বা মনে মনে একটু রাগান্বিতই হউন, কারণ কি তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল না। তবে যে কারণই হউক—গৌরীদেবী নিখিলকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা ব্রজেশ্বরের নাই, বা সেরূপ সাহসে কুলাইবে না। গৌরীদেবী জমীদার-পুত্রী, তাঁহার মাসহারার আয় হইতেই এখন ব্রজেশ্বরের এত বাহাদুরী—এত বাবুয়ানা; তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিখিলের অপকার করিতে পারেন না, তবে পাকে-প্রকারে কি করিবার মনস্থ করিয়াছেন—তা তিনিই জানেন।

নিখিল এখন বেশ ভাল হইয়াছেন। তাই একবার জন্মভূমি দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়া, দাদা ও বৌদির চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ইষ্টারের ছুটীতে দেশে আসিলেন কিন্তু দেশে আসিয়া

যাহা দেখিলেন এবং শুনিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহাদের বাস্তু ভিটাটী নষ্ট হইয়াছে। বড় দাদা সপরিবারে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, পাড়ার লোক তাহার কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। কারণ পাড়ার সহিত নরেন্দ্রনাথের সদ্ভাব বড় কম ছিল, তিনি যাইবার সময় কিছু বলিয়াও যান নাই। যাহা হউক, তাঁহারা সকলে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন, একদিন না একদিন দেখা হইতে পারে কিন্তু মেজ্‌দাদার কি সর্ব্বনাশ, আমারই কি দুরদৃষ্ট; মাতৃসমা মেজবউ স্বর্গগতা! হায় তাঁহার সহিত শেষ দেখা হইল না! তিনি যে ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, করিয়া অস্থির হইতেন, আমার উপর যে তাঁহার বড় আশা ছিল; তিনিই যে আমার এই উন্নতির মূল—ওহো! সে দেবী প্রতিমা আমাকে চিরতরে ফাঁকী দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! পাপীষ্ঠ আহাম্মুক আমি, তাঁহার জীবিতাবস্থায় একবার আসিয়া চরণ স্পর্শে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিলাম না?

স্ত্রী বিয়োগের পর মেজ্‌দা মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পাড়ার সকলে প্রাণপণ যত্নে সে ধার্ম্মিক, সাধন-ভজনশীল ব্রাহ্মণকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু দেশে থাকিলে সতীর স্মৃতি তাঁহাকে বড় কষ্ট দেয়, বলিয়া একদিন রাত্রে বাস্তু দেবতা দামোদরকে গলায় বাঁধিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভাবে তাহার পুরাতন দেউল বন-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া হা হা করিতেছে। এ অংশটুকু জমীদারবাবুরা গ্রহণ করেন নাই, মেজদাদা যাইবার সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তথায় বাসের অনুমতি দিয়া দেশ ত্যাগ

করিয়াছেন। হায়, হায়! এমন প্রাতঃস্মরণীয় রায় বংশ বাস্তবিক এতদিনে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল? নিখিলের চক্ষু দিয়া শোকের তীব্রবারি বাহির হইয়া বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল। শ্যামের মা আর এদেশে নাই—তাহা হইলেও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইত।

এত দুঃখের পরও মুখ ফুটিয়া কাহার নিকট সরযুর সংবাদ লইতে নিখিলের লজ্জা হইল কিন্তু একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন—সে বেলার মত তথায় স্নানাহার করিতে বলিলেন, নিখিল উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাই করিলেন। তিনিই উপরপড়া হইয়া বলিলেন—আহা, মেজো বউটার মত মেয়ে আর হবে না, ছোট বউকে ঠিক মার পেটের বোনের মত কাছে কাছে রেখে কত সংশিক্ষা দিত; ছোট বউমার সঙ্গেও দেখা হয় নাই—সে তখন জেঠার মৃত্যু সংবাদে দেবীপুর গিয়েছিল। আহা, আর কে আনবে নিখিল! তুই কল্‌কাতা ছেড়ে আবার এখানে আয় বাবা, বৌমাকে নিয়ে আয়—তোকে পেলেও আমরা রায়-বাড়ীর অভাব বোধ কর্‌বো না!

নিখিল সদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আর মাসী! এখানে কি আর থাকতে ইচ্ছে হয়—তবে দেখি বৈকালে একবার দেবীপুর যাই!

বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিলে নিখিল দেবীপুরাভিমুখে রওনা হইলেন। দেবীপুর—বসন্তপুর হইতে তিন ক্রোশ পথ—সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। সরযূ তখন সন্ধ্যার বাতী হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে আলো দেখাইতে আসিতেছিল।

নিখিলকে দেখিয়া সে কি করিবে না করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না! হঠাৎ এ আনন্দের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কে বলে তুমি কষ্ট কত্তে পার না?

বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ত নিখিলের হৃদয় এক প্রকার অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল—তার উপর আবার সরযূর সেই মোলায়েম সুন্দর দেহের বৈলক্ষণ্য, সে হীনজ্যোতি দেখিয়া বলিলেন—সরযূ! বাড়ীর খবর কিছু জান কি?

সরযূ।—আজ তিন মাস হইল, তাঁরা আমাকে ভুলে গেছেন—মেজ্‌দি যে এত ভালবাসতেন তিনিও আর এ অভাগীর খবর লন না—আর বড়দির ত কথাই নাই। আমি জেঠার মৃত্যুর পর বৃদ্ধা জেঠাইমাকে ফেলিয়া যাইতে পারি নাই—তিনি স্থবীরা হইয়াছেন—যাইব বলিলেই কাঁদিয়া আকুল হন।

"সরযূ! খবর নেবার দফা এ জন্মের মত শেষ হইয়াছে," বলিয়া নিখিল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত দুর্ঘটনা বিবৃত করিলেন। সরযূ শুনিতে শুনিতে অত্যধিক মর্ম্ম বেদনায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই; জেঠাই উমাসুন্দরী নড়িতে অশক্ত; কাজেই নিখিল নানা প্রকারে পত্নীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। রামধন দেশে আসিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, সে কঙ্কাল-সার হইয়া গিয়াছে—কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—বিনোদবিহারী আসিয়া ভগ্নীপতিকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ দেহে থাকিয়া ভগবানের কৃপায় ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ, গোয়ালভরা

গাম্ভীর দুখে সংসার চালাইতেছেন। পল্লীগ্রামে তাহারা বেশ ভাল গৃহস্থ, কিছুরই অভাব নাই, যা অভাব—লোকের, ভোগ করিবার বেশী কেহ নাই। বিনোদ ভগ্নীপতিকে অনুরোধ করিল—রায় মশাই! আপনি এসে আমাদের দেখুন—নইলে ত মারা যাই। নিখিল তাহাকেও বাড়ীর দুরবস্থার কথা বলিলেন—শুনিয়া বিনোদবিহারীও হায় হায় করিতে লাগিল।

যিনি চিরদিন সহরে কাটাইয়াছেন—তাহার পক্ষে এই জন-কোলাহলবিহীন—অন্ধকারময় পল্লীগৃহ ভাল লাগিবে না। কোন গতিকে সে রাত্রি দেবীপুরে যাপন করিয়া নিখিল আহারাদির পর কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময় সরযূর চক্ষের জল দেখিয়া বলিলেন—সরযূ! আমার আর তিলমাত্র তোমাকে এখানে রাখিতে ইচ্ছা নাই—আমি অদ্যই তোমাকে লইয়া যাইতাম কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া পারিলাম না। কলিকাতায় গিয়া একটা সুবিধা মত বাড়ী দেখিয়া একেবারে এখানকার সকলকে লইয়া যাইব। নতুবা তোমাকে একা লইয়া যাইলে ইহাদের উপায় কি হইবে! আমার উপায়-উপার্জ্জন এখন বেশ হইতেছে; তবে সম্প্রতি বিষম জ্বরে ভুগিয়া বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া অনেক কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। সেই দুঃসময়ে একটা ছাত্র খুব সমাদরে আমাকে বাড়ীতে রাখিয়াছিল—তাহার জননী এখনও আমাকে পুত্রের মত ভালবাসেন।

সরযূ ভগবানের নিকট স্বামী-উপকারী এই পরিবারবর্গের কুশল প্রার্থনা মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—উপায়ের জন্য বেশী

পরিশ্রম করে, শরীর নষ্ট করো না, শরীর বাঁচিয়ে সব কর্ব্বে—শরীর থাক্‌লে টাকার ভাবনা কি ?

গাড়ীর সময় হইয়া আসিতেছে ; নিখিলকে বহু কষ্টে যাইতে হইবে—কারণ তাঁহার এত পথ হাঁটা অভ্যাস নাই—আর তথায় যানাদিও পাওয়া যায় না, বা যান বাহনের রাস্তাও তাদৃশ নাই। তিনি বলিলেন—আমার সময় অল্প হইলেও সময়ে সময়ে পত্র দিব—তুমি উত্তর দিও, কোন গতিকে পত্র দিতে বিলম্ব হইলে উৎকণ্ঠিতা হইও না—ছুটী পাইলে আসিব ; যতশীঘ্র পারি বাড়ীর ঠিক করিয়া তোমাদের কল্‌কাতায় লইয়া যাইব। এই বলিয়া স্ত্রীরপ্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে নিখিল মাঠের পথে নামিয়া পড়িলেন। সরযু সদর দরজায় দাঁড়াইয়া যতদুর দেখা গেল—সেই আরাধ্যমূর্ত্তি নির্নিমেষ নয়নে দেখিলেন, তারপর নয়নের অন্তরাল হইলে—চক্ষের জল চক্ষে মারিয়া ভগবানের চরণে তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সেইদিন ইষ্টারের ছুটীর শেষ দিন—পরদিন কলেজ খুলিবে—নিখিল সন্ধ্যাকালে কলুটোলায় ব্রজেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন—তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল।

(৪)

বাড়ী হইতে আসিবার পর, ব্রজেশ্বর অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক জেদ্‌ করিলেন কিন্তু নিখিল কিছুতেই মনোরমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বরং বলিলেন—মনোরমাকে আমি ভগ্নীর ন্যায়

স্নেহ করি, আমার সহিত বিবাহ হইলে সে কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না; জানিয়া শুনিয়া এবং বুঝিয়া কিছুতেই আমি তাহার অসুখের কারণ হইব না, কর্ত্তাবাবু! আপনি বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি—চেষ্টা করিয়া আমাপেক্ষা কোন সৎপাত্রে তাহাকে সম্প্রদান করুন। সপত্নীর উপর কন্যা সম্প্রদান করা পিতামাতার কর্ত্তব্য নহে। আপনারা আমাকে আত্মীয়তা বন্ধনে বাঁধিবার জন্য এত করিতেছেন কিন্তু আমি বিনা বাঁধনে চিরদিনই আপনাদের আত্মীয় থাকিব, আপনাদের উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

নিখিলের কথা শুনিয়া, তাহার পত্নী-অনুরাগ দেখিয়া—রমণী কুল আদর্শ গৌরীদেবী মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দৃঢ়তার শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দাম্পত্য প্রণয় যে কি বস্তু—নিখিলের হৃদয়ই তাহা যথার্থ বুঝিতে পারিয়াছে; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ বিমল ভালবাসাই স্বর্গীয় প্রণয়ের চিহ্ন; আর নিখিলের এরূপ দেব চরিত্র সকলের অনুকরণীয়; গৌরীদেবী আর কিছু বলিলেন না। ব্রজেশ্বর কিন্তু তাহার এ দেবভাব আদৌ গ্রহণ করিলেন না—হাড়ে চটিয়া গিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার সর্ব্বনাশের সুযোগ—সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তখনকার সভ্য সমাজে ব্রজেশ্বরের যথেষ্ট সম্ভ্রম-সম্মান, উচ্চ-শিক্ষিত প্রবীণ হাকিম বলিয়া সাহেব মহলে তাঁহার প্রসার—প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। কেহ কখন তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারে না, আর এই পল্লীবাসী দরিদ্র যুবক, না হয় একটু শিক্ষিতই হইয়াছে; অযাচিত ভাবে এরূপ উপহার, এত টাকা, এমন সুরূপা;

বিদুষী কন্যা-দান অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিল—ইহাতে কি ব্রজেশ্বরের অপমান রাখিতে স্থান আছে? এ অপমানের পরিশোধ লইতেই হইবে—দেখি সে কেমন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখে? ব্রজেশ্বর বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না—যেমন সদ্ভাব তেমনি রাখিলেন—প্রাণে কিন্তু তাঁহার প্রতিহিংসার অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

নিখিল গাহিতে না পারিলেও সঙ্গীতের বড় প্রিয় ছিলেন—ভাল গান শুনিলে তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিত; ইহার জন্য তিনি আহার-নিদ্রা পর্যান্ত ত্যাগ করিতেন। নিখিলেন্দ্র চরিত্রে সকলই সুন্দর—সকলই মনোহর—কেবল এইটুকুই তাঁহার গলদ ছিল। ব্রজেশ্বর তাহা জানিতেন, তাই উভয়ে পদব্রজে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে কলকাতার বেশ্যা-পল্লীর মোড়ে তাঁহাকে উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে দেখিতেন। সে সময় তাঁহার পদচারণা মৃদু হইত, ব্রজেশ্বর অগ্রবর্ত্তী হইলেও তিনি পাছে পড়িয়া থাকিতেন, কিন্তু কখনও কোথাও যাওয়া-আসা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এমন কি এত-দিন কলিকাতা সহরে থাকিয়া তিনি কখনও থিয়েটার শুনিতে যান নাই; পাঠদ্দশায় কত বন্ধু তাঁহাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াও লইয়া যাইতে পারে নাই। এখন তিনি পাঠ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, এবং নানা কারণে সে সকল বন্ধুও আর নাই—থাকিলে কি হইত বলা যায় না।

ব্রজেশ্বর একদিন সপরিবারে থিয়েটার শুনিতে যাইবেন। নিখিলকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে বলিলেন। সেদিন থিয়েটারে

খুব ভাল পালার অভিনয় হইবে, নাচ গানও যথেষ্ট আছে, শুনিয়া নিখিল সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সেইদিন জীবনের মধ্যে প্রথম তিনি রঙ্গমঞ্চে বামন-ভিক্ষা ও বিবাহ-বিভ্রাট দেখিয়া আসিলেন। থিয়েটার দেখিয়া অবধি প্রধান অভিনেত্রীর বাম-কণ্ঠের স্বর-লহরী তাঁহার প্রাণকে উদাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাড়ীর কামিনী দাসী একদিন গৃহিণীকে সেই অভিনেত্রীর গুণ-গরিমার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছিল—গিন্নী মা! মাধুরী দিদি, খুব উন্নতি করেছে, সেদিন যে রকম দেখালে—তাতে বোধ হয়—সে অনেক টাকা উপার্জ্জন করে, তার প্লেটাই সকলের সেরা হয়েছিল। গৌরীদেবী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"ও পরিচয়ে আর কাজ্‌নি কামিনী! তুই থাম, এখনি ছেলে পিলেরা শুন্‌বে; ও কেলেঙ্কারী যত গোপনে থাকে—ততই ভাল, বুড়ো মিন্সের এ কাণ্ড কতদিনে লোপ পাবে? ও পোড়ারমুখী যে ঐ থিয়েটারে আছে, তা জান্‌লে কি আমি যেতাম! বামন-ভিক্ষা পালাটা ভাল মনে করে গেছলাম—ভক্তিভাবে মন মোহিত হবে বলে—তা ঐ হতভাগীকে দেখেই—ভক্তিভাব নষ্ট হলো, তুই আর ও কথা তুলিস নে! কামিনী আর বাড়ীর মধ্যে ও কথার বেশী আলোচনা করিল না।

নিখিল তখন বাহিরে বসিয়া খপরের কাগজ পড়িতে ছিলেন—কামিনী ও গৌরীদেবীর কথোপকথন তাঁহার কাণে পৌঁছিল, ভাব-সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি আরও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—যদি ঐ অভিনেত্রীর সম্বন্ধে আরও কোন কথা হয় কিন্তু তাহা

আর হইল না, কেবল নামটী শুনিয়া রাখিলেন—মাধুরী। যথার্থ মাধুরীই বটে, যেমনি রূপ—তেমনি গুণ; আহা কি তাল-মান, কি গলা, যেন কোকিল-কণ্ঠ।

ব্রজেশ্বর পরদিন বলিলেন—নিখিল কখনও থিয়েটার শুন নাই—কেমন শুনলে?

নিখিল। অতি মধুর; বিশেষতঃ ঐ মাধুরী নাম্নী স্ত্রীলোকটীর গোলা খুব সুন্দর। সহজেই লোকে মুগ্ধ হবে।

ব্রজেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই যে এরই মধ্যে নামটী কণ্ঠস্থ করেছ—প্রাণেও জেগেছে নাকি?

নিখিল। আজ্ঞে না, তার নামই বা আর জানবো কোথা থেকে, তবে সেদিন কামিনী গিন্নিমার কাছে উহার নাম করে—খুব তারিফ কচ্ছিল—তাই শুনেছি!

ব্রজেশ্বরের বদন একটু মলিন হইয়াছিল; কিন্তু বেহায়া পুরুষের লজ্জা বেশীক্ষণ থাকে না। ব্রজেশ্বর নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া বলিলেন—ওর মা! আবার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং গায়িকা ছিল, কিছুদিন হইল—সে মারা গিয়াছে। বলিয়া ব্রজেশ্বরের বদন যেন কথঞ্চিৎ বিরস এবং চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইল। তারপর নির্লজ্জ ব্রজেশ্বর বলিলেন—ওর মাকে আমি এলাহাবাদ হইতে আনিয়া ছিলাম;—কলিকাতা মেছুয়াবাজারে বাড়ী করিয়া দিয়া ছিলাম; তার ঐ কন্যাটী মাত্র হইয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে বসন্ত রোগে মারা যায়। যতদিন মাধুরী বালিকা ছিল, ততদিন ধাত্রী দ্বারা মানুষ করিয়া পরে ওস্তাদ রাখিয়া উহাকে গান বাজনা শিক্ষা

দিই। এখন সে খুব ভাল অভিনেত্রী হইয়াছে, তাই আমাকে আর উহার খরচ যোগাইতে হয় না। বাড়ী ঘর ওর মায়ের নামে ছিল—শেষে উহাকেই দিয়াছি; এখন ওর লেখা-পড়া শেখ্‌বার ইচ্ছা খুব বেশী, তা তেমন উপযুক্ত লোক পাচ্ছি-না। বলিয়া ব্রজেশ্বর মাধুরীর সহিত নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তারপর দেবেন, নিখিলের নিকট পড়িতে আসিল।

নিখিল দেবেনকে পাঠ বলিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল সেই মাধুরীর রূপমাধুরী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্মল অন্তঃকরণ সেই দিন হইতে সমল হইল—ধীরে ধীরে মাধুরীর রূপ গুণ তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্র আয়ত্ত করিয়া বসিল। যে স্থানে পতিব্রতা সতী সরযুর পবিত্র দেবীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল—একে একে সেই স্থানে দানবী মাধুরী মূর্ত্তি আসন পাতিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নিখিল এক একবার ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন, পুনরায় আবেশভরে তাহা যত্নে হৃদয়-রাজ্যে তুলিয়া লয়েন, এইরূপ কিছু দিন তোলা ফেলা করিতে করিতে একদিন সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লইলেন। দেব চরিত্র নিখিল এতদিনে সব ভুলিয়া, ধর্ম্মে-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দানব সাজিলেন। তিনি মনে মনে করিলেন—ইহাতে দোষ কি? কর্ত্তাবাবু যে এরূপ করিয়াছিলেন—তাহাতে ত আমি দোষ দেখি না। বড় লোকের অর্থ আছে—তদ্দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হয়। স্বর্গেও ত বিদ্যাধরী আছে—দেবতারা তাহাদের সঙ্গং সঙ্গীত শুনিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করেন। নতুবা তিলত্তমা, রম্ভা, প্রভৃতির এত খোসনাম কেন? সঙ্গীত যে দেবতার প্রিয়—ইহাতেই সে

সাধনার পূর্ণ পরিণতি—সঙ্গীত সাধকই ত শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করে ; মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ডাকিবার এমন সুবিধা আর কিছুতেই নাই ! আর সাধনায় জাতি বিচারইবা কি ? সঙ্গীত সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ —ইহার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। আহা কি সুন্দর, কি মনোরম, কি প্রাণারাম ! কত্তাবাবু বলিতেছিলেন—লেখাপড়া শিখিবার জন্য সে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে ; তাহাকে শিক্ষা দিলে হয় না ? তাহা হইলে নিত্যই ত সেই স্বর্গীয় স্বর কর্ণকুহর পবিত্র করিতে পারে। ছাত্রী বলিয়া মাধুরীকে পড়াইতে যাইব ; তাহাতে আর দোষ কি ? নিখিল মাধুরীর রূপ-সাগরে নয়, গুণ-সাগরে ডুবিয়া পড়িলেন। কেবল রূপ হইলে বিদুষী মনোরমাই বা কি দোষ করিল !

নিখিল ! খুব অগ্রসর হইয়াছ, আর পা বাড়াইও না, তুমি সুধার সাগর ভ্রমে যাহাতে ডুব দিতে যাইতেছ—যে সুধার আস্বাদ লইয়া প্রাণ সুধাময় হইবে ভাবিতেছ ; তাহা গরলের আকর—বিষের অগ্নিকুণ্ড, স্বেচ্ছায় তাহাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইও না। সরলা সাধ্বী তোমাগত প্রাণা সরযু চিরদিন তোমার আশা পথ চাহিয়া আছে ; বালিকা আজীবন অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া আশা করিয়া আছে—পতি তাহার শিক্ষিত ধার্ম্মিক ; একদিন না একদিন তাহার দুঃখের নিশি ভোর হইয়া অদৃষ্টাকাশে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইবে ; নিশ্চয়ই বিধাতা একদিন তাহার ধার্ম্মিক স্বামীর উন্নতি বিধান করিবেন, আর সরলা সতী সরযু দাসীরূপে তাঁহার পদ সেবা করিয়া ধন্য হইবে—নিখিল ! নিজ বুদ্ধি দোষে সতীর এ সাধে বাদ সাধিও না, তাহার প্রাণের আশা অপূর্ণ রাখিয়া সুধা ভ্রমে গরল পান

করিয়া মরিও না! তোমার প্রাতঃস্মরণীয় বংশ চিরদিন তোমার মুখ চাহিয়া আছে—তুমি মানুষ হইয়া তাহার মুখোজ্জ্বল করিবে। তোমার ধার্ম্মিক পিতামাতা তোমাদেরই ধার্ম্মিকতার জন্য স্বর্গবাসী হইয়াছেন, ক্ষণিক সুখের জন্য তাঁহাদিগকে নরকস্থ করিও না! তোমার বড়দাদা, বড় বউদির কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু তোমার ধার্ম্মিক মেজো দাদা, ও তোমার সাবিত্রী সমান মেজো বৌদি সাবিত্রীর কথা একবার চিন্তা কর, তাঁহারা বড় আশা করিয়া তাঁহাদের শেষের সম্বলটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া তোমাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন—তুমি বংশের মান রক্ষা করিবে বলিয়া—হায় নিখিল! তাঁহাদের সে আশায় ছাই দিও না, যাহাকে তুমি সুখ বলিয়া, শান্তি বলিয়া, মনের আরামপ্রদ ভাবিয়া আশ্রয় করিতে যাইতেছ, পরিণাম তাহার অতি জ্বালাময়, নরক বিশেষ! পড়িলে আজীবন দুঃখে কষ্টে, অশেষ যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইবে। অতএব নিখিল! মনের কল্পনা মনেই থাক, কার্য্যে পরিণত করিতে আর অগ্রসর হইওনা, অমন অমূল্য সম্পত্তি—সাধু চরিত্র ক্ষণিক সুখের জন্য নষ্ট করিও না, তাহা হইলে আর উহার অধিকারী হইতে পারিবে না, অজস্র টাকা উপায় করিলেও কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না—এখনও সময় আছে নিখিল—সাবধান হও।

পাপ-অগ্নি উৎসাহ-ইন্ধন পাইলে নির্ব্বাপিত না হইয়া দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে। নিখিল এক পা অগ্রসর হইতেছেন, সাত পা পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতেছেন, বিবেক তাঁহাকে তাড়া দিতেছে, কিন্তু ব্রজেশ্বরের উগ্র উৎসাহ বাক্য প্রবল বাতাসের মত নিখিলের বিবেক

বুদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া দিতে লাগিল। একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রজেশ্বর তাহাকে মাধুরীর বাড়ী লইয়া গিয়া আলাপ পরিচয় করিয়া দিলেন, মায়াময়ী মাধুরী পিতার ইঙ্গিতে গললগ্নিকৃতবাসে মাষ্টার মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া পদধূলি লইল। নিখিল মাধুরীর নম্রতা, তাহার ধীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, মরি-মরি গণিকার এত কমনিয়তা, এত এক প্রাণতা, সেইদিন হইতে তিনি মাধুরীকে পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রাণ ত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই গলিয়া গিয়াছিল—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সেইদিন হইতেই সামান্য গাড় হইয়াছিল, আজ গাঢ়তম হইয়া গেল—পুরুষ-সিংহ জালাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

(৫)

সঙ্গীতের অসীম শক্তি! একদিন এই সঙ্গীতই ভগবানকে বিচলিত করিয়া দ্রবময়ী গঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনাতেই বনের পশু জালাবদ্ধ হয়—অতিবড় হিংস্রক ফণীও যখন হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যায়, তখন দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয় ত কোমলতার আধার, সহজে আকৃষ্ট হইবে নাত কি? নিখিল মাধুরীর কোকিল কণ্ঠের কাকলী লহরী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর ব্রজেশ্বরের শিক্ষায় মাধুরীর অতিশয় নম্র ব্যবহারে নিখিল একান্ত বশংবদ হইয়া প্রত্যহ তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ নাম মাত্র শিক্ষাও দিতে লাগিলেন কিন্তু সঙ্গীতের আলোচনাই বেশী হইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর বলিয়াছিলেন—যেমন করিয়া হউক, নিখিলের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেই হইবে। পিতার কথা কন্যা কি অবহেলা করিতে পারে?

বিশেষতঃ নিখিলের রূপ যেরূপ চমকপ্রদ ; মানুষের ভাগ্যে এরূপ সুরূপ সহজে মিলে না। স্ত্রীলোক যে রূপের কাঙ্গালিনী, নিখিল যেরূপ মাধুরীর কোকিল কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, মাধুরীও সেইরূপ দেবোপম সুন্দর কান্তি নিখিলকে দেখিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ অনুরোধ না করিলেও এ ধনকে প্রেমপাশে বাঁধিতে কোন্ রমণী ইচ্ছা না করে ? তার উপর নিখিল উচ্চ শিক্ষিত—শিক্ষাবিভাগে উচ্চ পদবীধারী। মাধুরীর হৃদয় এতদিন অতৃপ্ত ছিল, ব্রজেশ্বরের কটাক্ষ দৃষ্টিতে এতদিন অবধি অবাধ বাণিজ্য প্রশ্রয় পায় নাই। আজ তিনিই যখন নিখিলকে মজাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন, তখন অতৃপ্ত কাম-তৃষাতুরা মাধুরীর হৃদয় আর বাধা-বিঘ্ন মানিবে কেন ? মাধুরী এই ললিত ললাম যুবককে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে তাহার সকল প্রকার কৌশল-জাল বিস্তৃত করিল।

নিখিলও বিনায়াসে এমন সুন্দরী গায়িকার প্রণয়পাত্র হইয়া আপনার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রতিদিন তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষ এমন ঘনিষ্ঠতা হইল যে একজন আর একজনকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, তিলমাত্র বিলম্ব হইলে উভয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখেন। বেশ্যাপুত্রী হইলেও মাধুরী এখনও ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয় নাই, এতদিন ব্রজেশ্বরের নজরে নজরে ছিল। এক্ষণে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য সবেমাত্র আসরে নামিতে ছিল—থিয়েটারে অভিনেত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু নিখিলকে পাইয়া, কিজানি তাহার মত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবককে আয়ত্ত করিয়া—সে আর থিয়েটারে

যাইল না, তাহার চরিত্র ফিরিয়া পড়িল। পাছে নিখিল তাহাকে বাজারের বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করে—তাই সে তাঁহাকেই একমাত্র প্রণয়-ভাজন করিয়া তাঁহার প্রেমেই মজিয়া পড়িল। আর নিখিল এতদূর শিক্ষিত হইয়া, আজীবন চরিত্রকে অচল অটল রাখিয়া শেষে সামান্য বেশ্যাপুত্রীর মধুর কণ্ঠের গান শুনিবার অছিলায় একেবারে হাবড়াইয়া পড়িলেন। সতী সাধ্বী সরযূর সে মলিন বদনের প্রতি, তাহার সে সতীত্ব-প্রতিভামণ্ডিত কমনীয় কান্তির প্রতি, সেই পবিত্র সরলতা মাখান নধর অধরের প্রতি আর ভুলেও তাকাইলেন না। সে যে প্রাণ-মন, জীবন যৌবন একেবারে তাঁহার পায়ে একান্ত ভাবে সমর্পণ করিয়া চির জীবন কাঁদিয়া কাটাইতেছে—সে বিষয় আর একবার নিখিলের মনে উদয় হইল না। দেবী ফেলিয়া তিনি আজ দানবীর প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিলেন—হায় রে! পুরুষ প্রকৃতি! এইজন্য বলে—“কেবল বাহিরের শিক্ষালাভ করিলে শিক্ষিত হওয়া যায় না, কতগুলা বই মুখস্ত করিলে মানুষ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না।” নিখিল বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আজীবন কেবল বাহিরের শিক্ষার জন্য এদিক ওদিক ঘুরিয়াছে, আদর্শ দর্শনে ও পিতামাতার সুশাসনে তাহার চিত্ত কখনও সংযম-শিক্ষা লাভ করে নাই, কাজেই পশুর মত অল্প প্রলোভনেই তাহার পতন হইল।

সংযম-শিক্ষা যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই,—বাসনা-লালসা তাহার হৃদয়ে জাগিলে সে তাহা দমন করিতে পারে না। চরিত্র অটুট রাখিতে হইলে—সংযমই মূল মন্ত্র, ইহাই যোগের অঙ্গ; এই

যোগাঙ্গই কালে মানুষকে ভোগের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া ত্যাগের রাজত্বে, তথা বাঞ্ছিতের পরম তত্ত্বে পৌছাইয়া দেয়। নিখিলের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এতদিন হৃদয়ে জাগরিত হইয়া গুপ্তভাবে ছিল, অর্থ, সামর্থ ও অবস্থার প্রতিকূলে এতদিন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; এইবার সময় বুঝিয়া আশা মিটাইবার জন্য, প্রাণের পিপাসা ছুটাইবার জন্য নিখিল মাধুরীকেই প্রকৃত আশ্রয়স্থল বিবেচনা করিলেন। ধর্ম্ম-কর্ম্মের একাঙ্গীভূত আরও উচ্চ, আরও মহান্, আরও পবিত্র, স্বর্গীয় আশ্রয় যে তাঁহার ঘরের কোণে শোকে-তাপে মলিন হইয়া দর্শন আশায় অশ্রুঝরে ঝরিয়া মরিতে লাগিল—পাষণ্ড নিখিল তাহা ভাবিয়াও দেখিল না।

উপর্য্যুপরি মাস দুই প্রতি সপ্তাহে সে সরযুকে পত্রাদি দিয়াছিল, আনিবার উদ্যোগ করিতেছি, আর বেশী বিলম্ব নাই বলিয়া কত আশা দিয়া পত্র লিখিয়াছিল। পবিত্র প্রেমাতুরা অভাগিনী সরযূ—সেই পত্র কতই আদরে আশাভরা হৃদয়ে বুকে তুলিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর কই! আজ প্রায় একমাস হইল—সরযু হৃদয়-ধনের কোন পত্রাদি না পাইয়া প্রমাদ গণিলেন; মনে করিলেন—বুঝি তিনি হাঠৎ কোন প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন—তাই পত্র লিখিতে পারেন নাই। হায় হায়! সে বন্ধুহীন স্থানে যদি পীড়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কে তাঁহার সেবা করিবে, কে তাঁহার ঔষধ পথ্য যোগাইবে—লোকাভাবে অসহ্য কষ্টে তাঁহার পীড়ার শান্তি ত কিছুতেই হইবে না। সরযূর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া যাইয়া সে প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণের পায়ে তাহার

উত্যক্ত প্রাণ উৎসর্গ করেন, কিন্তু সে যে সুদূর কলিকাতা; এ যান-বাহন-হীন পল্লী হইতে গৃহস্থের কুলবধূ কেমন করিয়া তথায় যাইবেন—আর কেই বা তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে?

যত দিন যাইতে লাগিল—সরযূর প্রাণ তত অস্থির হইয়া পড়িল; তিনি প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। শেষে একদিন রামধন ও বিনোদ বিহারীকে তাঁহার সন্ধানে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিত কলুটোলার ঠিকানায়—ব্রজেশ্বরের বাটীতে তাহারা আসিল। ব্রজেশ্বরের সহিত দেখা হইল—আর দেখা হইলেই কি নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা-লোলুপ ব্রজেশ্বর তাহার সন্ধান বলিয়া দিবেন! অন্য যাহাদের সহিত দেখা হইল—তাহারা বাস্তবিক নিখিলের সন্ধান জানিত না; ব্রজেশ্বর কন্যা ও পত্নীর নিকট তাহা গোপন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন-- তিনি আর আমাদের বাটী আসিবেন না—অন্যত্র বাসা লইয়াছেন। গৌরী ও মনোরমা তাহাতে একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন—কিন্তু পরের ছেলের উপর জোর কি? তিনি ত আর আমাদের কেনা গোলাম নহেন, অমন একজন শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যে দয়া করিয়া এতদিন আমাদের বাটীতে ছিলেন—এই সৌভাগ্য। দেবেন তখন কলেজ গিয়াছিল—কাজেই গৌরীদেবী পল্লীর দুইটী সরল চিত্ত যুবককে আহারাদি করাইলেন।

আহারাদির পর রামধন ও বিনোদ কোন আত্মীয়ের নিকট সন্ধান লইতে যাইবেন বলিয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন, এবং তাহাদের দেশের দুই একজন লোক—যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন,

তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তাঁহারা মুদীবকালী বা সামান্য মসীজীবী কেরাণী, অধ্যাপক নিখিলেন্দ্রের সন্ধান তাঁহারা কেমন করিয়া জানিবেন—কাজেই তাহারা সন্ধান না পাইয়া সন্ধ্যার গাড়িতে রওনা হইয়া রাত্রি দশটার সময় বাড়ী গিয়া দিদিকে যে সংবাদ দিল, তাহাতে তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। একে সরযূ তাঁহার শ্বশুর কুলের ভাঙ্গার দশা দেখিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার শরীর আধখানি হইয়া গিয়াছিল। তবে স্বামীর বল স্ত্রীলোকের বড় বল—সম্বল করিয়া এতদিন একপ্রকার সুখে ছিলেন। আজ তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেলেন—প্রাণে বিষম দাগা পাইলেন। দারুণ দুশ্চিন্তায় হৃৎপিণ্ড অনবরত আন্‌চান্ করিতে লাগিল, মনে করিলেন তবে কি হইল, তিনি কোথায় গেলেন? প্রতি সপ্তাহে যাহার পত্র পাওয়া যাইত, আজ দুইমাস একেবারে তাহা বন্ধ; পীড়া হইলেও ত তাঁহার সংবাদ আসিতে পারিত—তিনি ত আর একটা অজানা, অচেনা, কেউকেটা লোক নন্;—তেমন হইলে তাঁহার বন্ধুগণও ত সংবাদ দিতে পারিতেন? তবে কি অভাগিণীর অদৃষ্ট আরও মন্দভাব ধারণ করিল, সরযূ ভাবনা-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল। রামধন ও বিনোদ বিহারী তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দিদি! রায় মশাইত আর ছেলে মানুষ নহেন, এতদিন কল্‌কাতায় রয়েছেন, তার উপর তিনি একজন নামজাদা লোক, তাঁহার কি কোন অনিষ্ট

হইতে পারে? নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজ পড়েছে—তাই পত্র দিতে দেরী হচ্ছে। শীঘ্রই আসবে দিদি—তুমি বৃথা ভেবে রায় মহাশয়ের অমঙ্গল চিন্তা করো না। খাও দাও—শরীরকে কি অমন করে কষ্ট দেয়?

রামধন ও বিনোদ ত জানে না যে সরযূর হৃদয়ে কি বিষম চিন্তার আগুন জ্বলিয়াছে। এই আগুন যদি শীঘ্র প্রিয় দর্শনের আশাবারি সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত না হয়—তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই সরযূর প্রাণ সংশয় করিবে—এ আগুন যে বড় ভয়ানক,—চিতা অপেক্ষাও বিষম; সেত মরা মানুষকে পুড়াইয়া ভস্ম করে আর চিন্তা যে জীবিত মানুষকে পুড়াইয়া মারে—জীবন থাকিতেও ছারখার করে।

কুলের কুলবধূ সরযূ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া পতির চিন্তায় মধ্যে মধ্যে দিশেহারা হইয়া শূন্য প্রাণে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। আর এদিকে পাষণ্ড নিখিল কলিকাতার আব হাওয়ায় খোলা প্রাণে উদ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বিষম তাড়নায় বিডনবাগানের উত্তরে মাধুরীর মধুময় বিলাস অট্টালিকায় আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

মাধুরী প্রেমাস্পদ নিখিলের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া থিয়েটার ছাড়িয়া দিল, গৃহাবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার মনোরঞ্জনে কুলবধূরূপে আপন প্রেম-নিগড়ে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তাহার উদ্দাম প্রবৃত্তি নিখিলকে আশ্রয় করিয়া নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তাহার মতি গতি ফিরিল কিন্তু নিখিল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-দোষে ঘরের সতীলক্ষ্মীকে ভুলিয়া, বংশের মান মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া,

নিজের জ্ঞান বুদ্ধি, ও বিবেকের মাথায় পদাঘাত করিয়া একটা বেশ্যা পুত্রীর পুষ্ঠ অন্নজলে দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলাফল মানুষ কেমন করিয়া ভোগ করে—ইহা দেখিয়াও আমাদের চক্ষু ফুটে না।

(৬)

ইহার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আদর্শ চরিত্র নিখিল মানবের অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ শুকশারীর ন্যায় মাধুরীর সহিত সুখে বাস করিতেছেন। তিনি কলেজে চাকুরী করিয়া যে দেড়শত টাকা পান, তাহাতে বেশ বাবুয়ানা করিয়া চলিয়া যায়, তখন ত আর এখনকার মত সমস্ত জিনিস এত দুর্মূল্য ছিল না।

মাধুরী আর বাটীর বাহির হয় না—প্রিয়বরের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন ঠিক কুলস্ত্রীর মত গৃহে আবদ্ধ, দাস দাসী খাটাইয়া সংসার চালাইতেছে। একটা অস্পর্শীয়া বেশ্যা পুত্রী যদি এমন একজন সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সুরূপ সদ্বংশজাত যুবকের এমনভাবে প্রাণপ্রিয় হইতে পারে, তাহা হইলে আর সে চায় কি? মাধুরী আর কিছু চায় না, সে নিখিলকে লইয়া মজিয়া থাকিতে পাইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। তাহার জননীও ত কেবল ব্রজেশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া জীবন কাটাইয়া ছিল, তবে সে পারিবেনা কেন? অবশ্যই পারিবে, কিন্তু নিখিল কি চিরদিন তাহার হইয়াই থাকিবে—ইহা কি কখন সম্ভব?

এ অসম্ভব মাধুরী সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিল না। তাই

সে পোষা পাখীকে আফিমের মৌতাত ধরাইবার মত একটু একটু মদ খাওয়াইতে শিখাইল, বলিল—দেখুন! আপনাকে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শরীর সহজেই নষ্ট হইতে পারে—এইজন্য moderate doseএ এক পেগ করিয়া ভাল সুরা আপনার পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়। নিখিল তাহা শুনিয়াছিল কিন্তু কখনও অভ্যাস করে নাই—এইবার মাধুরীর কথায় তাহার রসাস্বাদন করিয়া বুঝিল—বাহবা; বেশ জিনিস ত—ইহাতে শরীর বাস্তবিক নবীভূত হয়, অবসাদগ্রস্ত শরীর-ক্লান্তি খুব সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। কলেজ হইতে আসিয়া সামান্য জল-যোগের পর, ইহার এক পেগ গলাধকরণ করিলে যে কি আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা নিখিল এতদিন উপভোগ করেন নাই। ইহার পর অবসাদ আবেশ প্রাণে মাধুরী আবার যখন তাহার কোকিল কণ্ঠের নিত্য নূতন সঙ্গীত লহরী ছড়াইয়া দিত, তখন নিখিল অর্দ্ধ মুদ্রিত আবেশ-তরল নয়নের করুণ-অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া সোহাগভরে বলিত, মাধু! তুই স্বর্গের অপ্সরী না কিন্নরী আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, মানবী শক্তি কি সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় এমন অপরিসীম শক্তি কখন দেখাইতে পারিয়াছে? মাধুরীও উদাস-করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া অতি ধীর অথচ নম্রস্বরে বলিত—দাসীর প্রতি এ করুণা চিরদিন সমান ভাবে থাকিবে কি প্রাণাধিক্! নিখিল শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সেই সুন্দর বরবপু বাহু-পাশে আবেষ্টন করত—তাহার গোলাপ গণ্ডে সোহাগের চরম চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বলিতেন, "মাধুরী! দাসী তুমি, তুমি রাজরাণীরও

শিরোমণি” আপনাকে দাসী বলিয়া কেন এত হীন কর প্রাণেশ্বরী! বিধাতৃ বিধানে আমাদের এ মিলন সুসম্পন্ন হইয়াছে, প্রাণ যতদিন, ততদিন—এ মিলন অটুট থাকিবে, বুঝি প্রাণের পর জীবনের পরপারেও আমাদের এ বন্ধন শিথীল হইবে না। মাধুরী নিখিলের সুন্দর কোমল বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া কিন্নরী কণ্ঠে গাহিল—

বইছে মলয় বায় হু হু করে ভাসিয়ে
নে যায়—সময় চলে যায়।
সুমধুর বইছে মলয় বায়।
রতনে রতন, মিলেছে যখন
অতৃপ্ত বেদন কেন সহা যায়।
রসাতলে গেলেও ধরা
প্রণয়ীর প্রাণের বাঁধন অটুট রহে যায়॥

রজনীর নিভৃত যামে প্রণয়ী-যুগলের প্রতিদিন এই ভাব, এইরূপ আনন্দ-উচ্ছাস, তুষার ধবল জ্যোৎস্না বন্যায় মিশিয়া আপনহারা হইয়া দিগন্তে মিশিয়া যায়, আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া তখন আর তাহারা আপনাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় না; যুবকযুবতীর প্রেমানন্দ এমনি অতলস্পর্শ—এমন সীমাহীন!

নিখলি চণ্ডীদাসের মত মাধুরীর প্রেম বিকষিত হেম মনে করিয়া তাহার প্রণয়-সাগরে গা ঢালিয়া দিয়া বাড়ী ঘর, বংশ গৌরব এবং উন্নতি অবনতি প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া কলিকাতায় রঙ্গরসে মত্ত! আর দেবীপুরে, হুগলী জেলার সেই নিভৃত পল্লীবাসে পতিপ্রাণা, সতীত্বের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সরলা দিন দিন বিষম চিন্তায়,

অনাহার-ক্লিষ্টা রোগ-জীর্ণা হইয়া শয্যাশায়িনী হইবার উপক্রম করিতেছেন—এ যাত্রা বুঝি তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই।

রামধন ও বিনোদ দিদিকে কত প্রকারে সান্ত্বনা করেন, কত প্রকারে প্রবোধ দেন কিন্তু চিরদগ্ধ অঙ্গারের হৃদয়ে কি সামান্য বারি সিঞ্চনে কোন ফল হয়—বরং আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহা জীবন নাশের চেষ্টা করে। সরযূ হতাশ হইয়াছেন। জীবনের জীবন স্বামী ধনকে আর তিনি ফিরিয়া পাইবেন না, ভাঙ্গা অদৃষ্ট একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর যোড়া লাগিবে না।

যে ব্যক্তি সপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র দিতেন—তাহার পত্রের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইলে কত কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিতেন, প্রভু হইয়া দাসীর নিকট ক্ষমা চাহিতেন। সেই স্বামী অধিনীর সেই একমাত্র হৃদয় দেবতা আজ দুইবৎসর দাসীকে ভুলিয়া আছেন; হায়! আর কি তাঁহার সেই প্রণয় সম্ভাষণ, তাঁহার সেই মধুর সান্ত্বনা-বচন শুনিয়া কর্ণ-কুহর পবিত্র করিব! আর সে আশা নাই—বিধি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন, হয় আমার হৃদয়ের ধন পরের হইয়াছে, না হয় জীবনে কোন অনিষ্ট হইয়াছে, নতুবা এ হতাদর, এ বিরহ-বিরোধ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কেন উভয়ের মধ্যে এ ব্যবধানের সৃষ্টি করিল!

সরযূ বিরহ-বিকারে একপ্রকার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খান না, শোন না, নিদ্রা তাঁহার নয়ন হইতে একেবারে অবসর লইয়াছে। শীতের এমন শীতলতায়, দারুণ পৌষের এমন হীম-প্রভায় সরযূর নিদ্রা হয় না, প্রবল বায়ুর প্রকোপে সমস্ত রাত্রি

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কেবল প্রাণনাথের চিন্তায় বিভোর; অন্ধকারে শুষ্ক-পত্রের উপর দিয়া কোন নিশাচর জন্তু গমনাগমন করিতেছে—সরযূ অমনি শিহরীয়া উঠিয়া নিবিষ্টচিত্তে কাণ খাড়া করিয়া আছেন—এই বুঝি স্বামী আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন—সরযূ! আমি আসিয়াছি, দ্বার খোল—অনবরত এই চিন্তা করিতে করিতে, প্রতিদিন স্বামীর প্রতীক্ষায় গবাক্ষপথে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রজনী পোহাইয়া যায়, সূর্য্যদেব গগনে প্রকাশ হন—সরযূ হতাশ-হৃদয়ে বাহিরের দরজার চৌকাটে আসিয়া বসেন—মনে করেন, বন্ধুর পথ রাত্রে আসিতে পারেন নাই, দিনমান হইয়াছে—এইবার আসিবেন। আহার নাই, বিশ্রাম নাই—জোর করিয়া পাড়ার কোন স্ত্রীলোক আসিয়া দুইমুষ্টী খাওইয়া দিলে—কতক খাইতেন, কতক থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতেন। তারপর দিনও কাটিল, সন্ধ্যা হইল, কই তিনিত আসিলেন না! এইরূপ করিয়া কতদিন, কত রাত্রি কাটিয়া আজ দুই বৎসর অতীত হইল, অভাগিনী আর এ মর্ম্মজ্বালা কত সহ্য করিবে? তাই দিনে দিনে তাঁহার শরীর কঙ্কাল-সার, জীবন অবসন্ন হইয়া আসন্নকালের ছায়ায় ঘেরিয়া ফেলিতেছে। হায়! আর বুঝি দেখা হইল না, আর বুঝি সে আরাধ্যপদ পুজিয়া সরযূ জীবন সার্থক করিতে পারিল না। এ জীবনের মত বুঝি সে সৌভাগ্য সূর্য্যের অবসান হইয়া অদৃষ্ট গগন কালের কাল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল!

সরযূর দ্বারা সংসারের কাজ কর্ম্ম আর কিছু হয় না, বিনোদ পাড়ার একজন প্রবীনা আত্মীয়াকে আনিয়া সংসারে রাখিয়াছেন।

তাঁহার কেহ নাই—দয়া করিয়া তিনি প্রতিদিন তাহাদের মুখের গ্রাস তুলিয়া দেন। সময়ে রন্ধনাদি করিয়া দেন বলিয়া এখনও তাহাদের অন্নজলের বরাত উঠিয়া যায় নাই, সুখে-দুঃখে প্রতিদিন একরকমই চলিতেছে। এই আত্মীয়টী বিনোদের মাকে এবং সরযুকে বিশেষ যত্ন করে, বিশেষতঃ রাজরাণী সরযূর দুর্ভাগ্য দেখিয়া অতিশয় দুঃখ করিয়া বলে—বিধাতা! এমন সোণার প্রতিমা মেয়ের কপালটা কি এমন করে পুড়াইয়া ছারখার করে দিতে হয়! এতো ভুলেও কখন কারু অন্যায় করে নাই, তবে এর উপর তোমার প্রকোপ এত বেশী কেন? যে বেশী ভাল হয়, তাকেই বুঝি তুমি বেশী জ্বালাও! পোড়া বিধি! তোমার বিধানে বলিহারী যাই! বৃদ্ধা অনেক কষ্টে সরযূকে খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তবে আপনি খাইত। সরযূ কি সহজে খাইতে চায়! সে জানে যত শীঘ্র তাহার খাওয়া-পরা উঠিয়া যায়—যত শীঘ্র এ জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়—ততই মঙ্গল, জীবন সর্বস্ব যখন ছাড়িয়া গেলেন—তখন আর জীবনে প্রয়োজন কি? এ দেহ লইয়া, ইহার রূপ লাবণ্য লইয়া আর কি হইবে! এখন রূপত সুখের কারণ নহে, দুঃখের আস্পদ—যত শীঘ্র তাহারা দেহ ছাড়িয়া আমাকে অসার করিয়া ফেলে, ততই মঙ্গল; মরণ কাল উপস্থিত; পার্থিব সম্বলের দরকার কি? এখন পারত্রিক নিস্তারের নিস্তার-কর্ত্তা আমার প্রাণনাথের পাদুখানি একবার শেষ সম্বল পাইলেই যে আমি হাসিতে হাসিতে জীবলীলা শেষ করিতে পারি। ভগবান! সে ভাগ্য কি হইবে না? সতীর এ মর্ম্মান্তিক প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিত না।

(৭)

জগতের নিয়মে সুখ চিরস্থায়ী নহে—মানবভাগ্যে ইহা কখন অটুট থাকে না। আজ যে দুঃখী, দুঃখ-কষ্টে পুড়িয়া মর মর হইয়াছে, কাল সে কালের কৌশলে, নিয়ন্তার নিয়মে, ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সুখ-সন্তোষে জীবন উৎফুল্ল করিতেছে। আবার যে এতদিন সুখের বিমল ক্রোড়ে প্রতিনিয়ত সুখ স্বপ্নে বিভোর ছিল, চারিদিকেই যাহার সুখের উৎস ছুটিয়া জীবন সুখময় করিয়াছিল, বিধাতার বিধানে পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে—তাহার সুখ স্বপ্ন ঘুচিয়াছে, আনন্দ উৎস টুটিয়াছে, সে একেবারে দুঃখের অতল তলে ডুবিয়া চারিদিক শূন্যময় দেখিতেছে! এক যায়—এক আসে, কিছুই চিরস্থায়ী নহে, জগতের ইহাই নিয়ম।

মাধুরীর সহিত একত্র সহবাসে নিখিল এই কয় বৎসর খুব আমোদেই কাটাইয়াছে কিন্তু বিধাতার নিয়মে তাহার সুখের সাগরে এইবার ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে! মাধুরী প্রাণপ্রিয়বরকে আয়ত্ত করিতে গিয়া রাত্রিদিন আনন্দে নাচ গানের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তার উপর সুরাদেবীর উপাসনায় তাহার স্বাস্থ্য এমন ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কোন কাজ করিতে পারে না—আহারে অরুচি আসিয়া জুটিয়াছে; গুপ্তভাবে জরাসুর আসিয়া তাহার সেই অনুপম দেহকে আক্রমণ করিয়াছে। নিখিল ডাক্তার ডাকিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাঁহার প্রিয়তমা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি প্রমাদ গণিলেন।

মাধুরী বেশ্যাপুত্রী হইলেও অনেক কুলবধূর অপেক্ষা হীন

ছিল না। সে নিখিল ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না। বাজারের আসরে নামিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ভগবান তাহাকে নিখিলের মত সৎ পুরুষের সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলেন—সেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে অনন্যশরণ হইয়া তাঁহারই পাদপ্রান্তে জীবন বিক্রয় করিয়াছিল, বেশ্যাপুত্রী বটে কিন্তু কুলটার ভাব তাহাতে কিছুমাত্র ছিল না। তাহার জননী যেমন একমাত্র ব্রজেশ্বর বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবনের শেষ অবধি অনন্য চিত্তে তাঁহারই প্রেমে আবদ্ধ ছিল। মাধুরীও তেমনি এই অল্প দিনের মধ্যে নিখিল-রসালে এমন ভাবে জড়িত হইয়াছিল, যাহা অনেক গৃহস্থের বধূতেও পারে না; আর তাই নিখিল হেন পণ্ডিতও তাহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ছাড়িয়া, তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অহঙ্কার-শূন্য হৃদয়ে রূপ গুণ দিয়া পূজা করিলে বশীভূত না হয় কে?

নিখিলের ন্যায় অধ্যাপকের সহবাসে থাকিয়া মাধুরী খুব বিদুষী হইয়াছিল। সে অনবরত বৈষ্ণব কবিদের কীর্ত্তন, রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কলুষিত জন্ম সার্থক করত পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল। তবে থিয়েটারের শিক্ষানুসারে সে সামান্য রকমে মদিরা সেবন করিত, অজস্র পরিশ্রম করিয়াও বহুদিন তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া সে প্রাণের নিখিলকেও তাহা সেবন করিতে শিখাইয়াছিল। এই মৃত সঞ্জিবনী সুধা সেবনে নিখিলের দেহ তত খারাপ হইল না কিন্তু মাধুরীর স্বাস্থ্যে তাহা গরল উদগীরণ করিল। সামান্য দিনের মধ্যে সেই বিষ যক্ষ্মারূপে তাহার দেহকে

নষ্ট করিয়া ফেলিল, তেমন যে রূপ অতি অল্পদিনের মধ্যেই কালিমা-ময় হইয়া গেল।

প্রণয়িনীর এই দুর্বিসহ অবস্থা দেখিয়া নিখিল—কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন, কাজ কর্ম্ম সমস্ত একপ্রকার ছাড়িয়া দিলেন, কলেজের চাকুরী না করিলে নয়, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও করেন; ছুটী হইলে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া মাধুরীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহোরাত্র সেবা করিয়া, তাহার সে রোগশীর্ণ মলিন দেহলতা বুকে করিয়া নয়নের জলে অভিষেক করেন। মেডিকেল কলেজের একজন শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত হইয়াছিল, দিবাভাগে নিখিলের অনুপস্থিতিতে সে কাছে কাছে থাকিয়া মাধুরীর সেবা করিত, নিখিল আসিলে—সে চলিয়া যাইত, আর যেন প্রিয়াকে তাহার সেবাধীন রাখিতে নিখিলের প্রাণ চাইত না, প্রাণের ধনকে প্রাণ দিয়া সেবা করিয়া তিনি নিজে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন। মাধুরীর পীড়ায় নিখিল জীবনের সমস্ত আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া প্রাণপাত করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেই কি তার আশা মিটে? যে সুন্দর দেহলতা একদিন ভৃঙ্গার মত কোমল; কাঁচের মত মসৃণ ছিল, এখন দুর্বিসহ রোগে তাহা কঙ্কাল-সার কঠিন, জ্যোতিহীন হইয়াছে, তথাপি নিখিল তাহাকে অতি সন্তর্পণে নাড়া-চাড়া করেন, বক্ষে করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়াও অশেষ সুখ পান!

মাধুরী যদিও প্রতিদিন একটু একটু করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে, জীবনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—তথাপি নিখিলের এই সোহাগ-জড়িত নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিলে তাহার প্রাণ এত

দুঃখের মধ্যেও, এত কঠোর কষ্টের ভিতরেও যেন অসীম সুখ পায়, ক্ষণিকের জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল—অশক্ত বাহুলতাদ্বারা নিখিলের গলা জড়াইয়া বলে—প্রাণাধিক! কান্না কিসের; তোমা হেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একটা অসতীকে সতী করিল, একটা নরকের কীটকে স্বর্গে তুলিল—ইহাতে ত তোমার মহত্ব প্রচার হইতেছে। আমার জন্য দুঃখ কিসের, কুলের কুলবতীরাও আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী হইতে পারে না। তোমার চরণতলে থাকিয়া, আমি যে অশেষ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর—আজ নয় কাল, না হয় দুইদিন পরে—ইহা ত যাবেই, "তবে আমি বেশ্যাপুত্রী" নিতান্ত ঘৃণ্য, অস্পর্শীয়া হইয়াও যে তোমার পবিত্র কোলে পড়িয়া মরণ বরণ করিতেছি—ইহা ভাবিয়া আজ আমার বুক অতুল আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেছে! যাহাকে কেহ স্পর্শ করিত না—মৃত্যু সময়ে যে মুর্দ্দাফরাসের অধীন হইত, সে আজ দেবতার স্পর্শ পাইয়াছে, তাঁহার চরণ ছায়া পাইয়াছে, ইহাতে শোক কি প্রাণাধিক! মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে লইয়া আরও কিছুদিন সুখভোগ করিব কিন্তু অদৃষ্টে তাহা নাই। এক জনের প্রাণের ধন কাড়িয়া লইয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করিলে বিধাতা বুঝি তাহার মাথায় এমনি করিয়া বাড়ী মারেন—আমি একজনের মাথার মণি, হৃদয়ের ধন ছিঁড়িয়া আনিয়া আপনার করিয়া এতদিন ভোগ করিলাম—আর ভাগ্যে সহিবে কেন? আমার ভোগ ফুরাইয়াছে। এক্ষণে যাহাকে ফাঁকী দিয়া আসিয়াছ, আমার মরণের পর সেই পূজনীয়া সাধ্বীর নয়ন-জল মুছাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ

করিও। তোমার মত পতি-বিরহে তিনি যাতনায় ছট্-ফট্ করিয়া বোধ হয় মৃত্যুকে বরণ করিতেছেন তাঁহাকে সুখী কর। এ জীবনে তোমার কৃপায় আমার শিক্ষা হইল—নারীজন্ম কেবল পতির সেবার জন্য, পতিব্রতা হইতে পারিলে, নারী বিশ্বজয়ী হয়, আশীর্ব্বাদ কর—যেন পরজন্মে সরযু ও আমি উভয়েই ছোট বড় হইয়া তোমার দাসীত্ব করিতে পারি। মাধুরী বিষম উত্তেজনায় এই কথাগুলি বলিয়া আর কথা কহিতে পারিল না, বিষম দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া চক্ষু কপালে তুলিল।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, কাছে কেহ নাই। নিখিলেন্দ্র প্রিয়তমার এই অবস্থা দেখিয়া হাউ মাউ করিয়া আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পার্শ্বে কয়েকঘর পাচক-ব্রাহ্মণ বাস করিত, তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল—মাধুরীর জীবলীলা শেষ হইয়াছে; বহুক্ষণ হইল প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে শবদেহ স্পর্শ করিল না, কেবল বলিল—বাবু! আর কান্নাকাটী করিয়া কি হইবে, এইবার সৎকারের ব্যবস্থা করুন। না হয় মুর্দ্দাভরাস ডাকিয়া দিন। তাহাদের এই টিট্‌কারীর কথা শুনিয়া নিখিলের অন্তঃকরণ শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল; অন্য সময় হইলে হয়ত তাহাদের রক্ষা থাকিত না কিন্তু এ সময় রাগের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে।

তিনি শোক বিজড়িত স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—দেখুন ঠাকুর মশাইরা! আমি প্রাণ থাকিতে এ দেহ অপবিত্র মুর্দ্দাভরাসের হাতে দিতে পারব না। সকলের নিকট মাধুরী বেশ্যাপুত্রী—

পতিতা, অস্পর্শীয়া হইতে পারে কিন্তু আমার নিকট ও দেহ অতি পবিত্র। এখন কি করা যায়—আপনারা সৎপরামর্শ প্রদান করুন, আমি ত দিশেহারা হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। আপনারা প্রতিবাসী এ সময় বন্ধুর কাজ করুন।

ব্রাহ্মণগণ অনেক সময়ে মাধুরীর দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছেন; নিখিলও যে তাহাদের উপকার করে নাই—তাহাও নহে। মাধুরী বেশ্যাপুত্রী হইলেও দয়াবতী ছিল—অভাব অভিযোগে দু পাঁচ টাকা চাহিলে কখন "না" বলিত না। অতএব যাহাতে তাহার দেহের সংকার হয়, তাহা করা উচিত। তাহারা চেষ্টা করিয়া কয়েক জন মন্ত্রপায়ী সূত্রধারী ব্রাহ্মণ আনিয়া দিল। অর্থের লোভে তাহারা মাধুরীর শব দেহ বহন করিতে পশ্চাৎপদ হইল না।

মৃত দেহ যখন খট্টার উপর তুলিয়া শ্মশানে নীত হইল। নিখিল পাগলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তখন প্রভাত হইয়াছে। অতবড় একজন উচ্চ-পদস্থ অধ্যাপককে বেশ্যার শবানুগমন করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল, কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু নিখিল কোন কথা কহিলেন না। নিমতলা ঘাটে তখন অনেক স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে। অনেক কলেজের ছাত্রও স্নানে আসিয়াছেন, তাহারা পশ্চাৎবর্ত্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল,—ইহা নিখিল বাবুর রক্ষিতা বেশ্যার শবদেহ। এক সময়ে এই বেশ্যা থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী ছিল। নিখিল বাবুর সঙ্গে জুটিয়া সে অভিনয় ছাড়িয়া দিয়াছিল—এক্ষণে তাহারই মৃত্যু হইয়াছে।

ছাত্রগণ এতদিন নিখিলকে ভাল লোক বলিয়া জানিত, এক্ষণে

তাঁহার চরিত্র দোষ দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গেল। নিখিলের কিন্তু লজ্জা নাই—আজ তাহাতে তিনি নাই, কাজেই লোক-লজ্জা তাঁহাকে লজ্জা দিবে কেমন করিয়া? শব চিতাস্থ করা হইল, নিখিল কম্পিত হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই চাঁদ বদনে অগ্নি সংস্কার করিলেন। যখন অগ্নি ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া শব দেহ গ্রাস করিতে লাগিল, তখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না—শোকে-দুঃখে দারুণ মর্ম্মজ্বালায় অস্থির হইয়া চিতায় ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া সকলে বহুকষ্টে তাঁহাকে আটক রাখিয়া শব দেহ ভস্মসাৎ করিল।

নিখিলকে সকলেই চিনিত, তাঁহার এই হীনচরিত্রের কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল কিন্তু নিখিল এমন মজিয়াছেন—শোকে-দুঃখে এমন দিশাহারা হইয়াছেন—যে তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি ছিল না। যখন সমস্ত ভস্মে পরিণত হইল, যখন মাধুরীর পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল, তখন নিখিলের অবস্থা যে কি, তাহা আমরা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম! বিস্ময় বিস্ফারিত পলকহীন নেত্রে, শোকদগ্ধ হৃদয়ে এতবড় একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী অধ্যাপক উঠি-পড়ি করিয়া কোন প্রকারে গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিলেন। পাড়ার পাচক ব্রাহ্মণগণ রন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেদিন খাওয়াইতে খুব চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি কিছুই খাইলেন না, সেই শূন্যগৃহে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া রজনী যাপন করিলেন।

অনেকদিন কলেজ যাওয়া হয় নাই। মাধুরীর পীড়ার জন্য

মাধুরীর শবদেহ পুড়িতে লাগিল দেখিয়া নিখিল মর্ম্মজ্বালায় অস্থির হইয়া ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিলে সকলে ধরিয়া ফেলিল।

তিনি দেশে যাইবার ভান করিয়া ছুটী লইয়াছিলেন। এক্ষণে শূন্যগৃহে একাকী থাকা দায়, মাধুরীময় গৃহখানি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাই পরদিন তিনি অতি কষ্টে কিছু জলযোগ করিয়া দশটার সময় কলেজে গমন করিলেন।

(৮)

নিখিল কলেজে প্রবেশ করিবা মাত্র অধ্যক্ষের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে তাঁহার কাজ গিয়াছে, তাঁহার স্থানে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। অধ্যাপকের চরিত্র আদর্শ হওয়া উচিত, যখন তিনি ঐরূপ চরিত্রহীন, তখন এ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; কলেজ কমিটী আর তাঁহাকে এ পদে বাহাল করিতে চাহেন না। নিখিল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ গত হইল; নিখিল আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, কত প্রকার দুশ্চিন্তা তাল পাকাইয়া তাঁহার মনোমধ্যে অসহ্য বেদনার সঞ্চার করিতে লাগিল। তিনি কলেজ-কমিটীর নিকট হেয়—মানহীন হইলেও অনেকানেক ছাত্র, যাহারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষা দিবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতার বিষয় জানিত—তাহারা কিছুদিন তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিল কিন্তু আজীবন কেমন করিয়া চলিবে? শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহাকে ত আর কেহ লইবে না; তাঁহার সে বিষয় খবরের কাগজে গেজেট হইয়া গিয়াছে। আর নিখিল অন্য কোন কার্য্যেরও লায়েক নহেন, চিরদিন শিক্ষকতা করিয়া এখন অন্য কাজে যাইবার তাঁহার শিক্ষা কই?

তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এত বড় একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকেও নিজ উদরান্নের জন্য অস্থির হইতে হইল। এইজন্য বলে—চরিত্র-বলই বল; এ বল সম্বল থাকিলে ঐশ্বরিক বলের সাহায্য পাইয়া মানুষ এ জীবনে অনেক উন্নতি করিতে পারে, যাহার তাহা নাই—সে পশুরও অধম! নিখিল চরিত্র-বল হারাইয়া লোকচক্ষে এখন পশুর অধম হইয়াছেন, কাজেঃ মানুষই যখন তাঁহাকে দেখিতে পারে না, তাঁহার এত বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের, আদর করে না, তখন ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ তাঁহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

আজ নিখিলের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার ঘোর পরিণাম ভাবিয়া তাই সাধক কবির সেই মর্ম্মগাথা মনে পড়ে :—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমৃত সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

জাতিও গেল, পেটও ভরিল না। নিখিল সুখের আশায় এতদিন কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই; এখন তাঁহার অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক হৃদয় ফাটিয়া যায়! এমন একটা মহাশিক্ষিত ব্যক্তির অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছে—অন্নের অভাব! ওঃ কি দুর্ব্বিসহ পরিবর্ত্তন!

এইবার তাঁহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কি করিতে কি করিয়াছেন। ক্ষণিক মোহে আবদ্ধ হইয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছেন। হায়! জগৎ

এত কুটীলতায় পরিপূর্ণ, ভালোকে ভালবাসিলে তাহার পরিণাম এত ভয়াবহ! মাধুরী নয় বেশ্যাপুত্রী; কিন্তু তাহার রূপ গুণ, চরিত্র এবং ধর্ম্মভাব যে অনেক হিন্দুস্ত্রীর অনুকরণীয়, তাহাকে ভালবাসিয়া যদি আমার দুর্গতি হয় হউক, এ দুর্গতির পরিণাম ত অন্নাভাবে মরণ, আমি অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিতে রাজী আছি! মাধুরীর সেই অমিয়মাখা মুখখানি যখনই মনে পড়িল, নিখিল তখনই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। জগৎ একদিকে আর তিনি একদিকে হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। দেশে যাইব কিন্তু দেশেও যে ভাইয়েরা বিষয়-আশয় ছারখার করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; তাঁহাদের বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত পরের হইয়াছে, সেখানে যাইলেও মাথা গুজিয়া থাকিবার একটু স্থান পাওয়া যাইবে না! শ্বশুর বাড়ী যাইব তাই বা কেমন করিয়া হয়, আজ তিন চারি বৎসর সরযুর সংবাদ পর্য্যন্ত পাই নাই, এক কপর্দ্দকও পাঠাই নাই, সমস্তই নিজের বিলাস-ব্যসনে খরচ করিয়াছি। সেখানেও যে কি হইল, তাহার নিশ্চয়তা কি? একদিন সংবাদ না পাইলে যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, আমার প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া থাকে, এতদিন সংবাদ না পাইয়া সে সরযুরও বোধ হয় অস্তিত্ব নাই, সেও প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অল্প বয়সে আমার জন্য সে যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াছিল। আমার চাকুরী ভাল হইলে, বেশী টাকা কড়ি রোজগার হইলে অন্য সুখের আশা না করিলেও নিকটে থাকিতে পাইবে, এ আশা যে তাহার প্রাণের মধ্যে গাঁথা ছিল, সতী তাহাতে

হতাশ হইয়া এতদিন নিশ্চয়ই মাধুরীর মত আমাকে ফাঁকী দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মাধুরী তাহাকে না দেখিয়া—আমার মুখে শুনিয়াই তাহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিত—মৃত্যুকালে তাহার উক্তিই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ! বাস্তবিক সরযূ সতীর শিরোমণি; ধৈর্য্যগুণ তার তুলা বোধ হয় আর কাহার নাই! মেজোবউ জীবিত থাকিলেও তাঁহার সান্ত্বনা বাক্যে কিছুদিন জীবিত থাকিত। কিন্তু যখন তিনি স্বর্গগত, তখন নানা প্রকার হতাশায়, সে বালিকা কি আর প্রাণ রাখিয়াছে।

শ্বশুর বাটীর অবস্থা অতি শোচনীয়! বহুকষ্টে দিনপাত হয়, তাহার উপর জেঠাই মা স্থবিরা হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় এতদিন নাই; ম্যালেরিয়ায় অন্য সকলে কঙ্কাল-সার হইয়াছে, আমি তাহাদের সকলকে কলিকাতায় আনিব বলিয়া সেই যে চলিয়া আসিয়াছি। এখন এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর; সেই অনাদৃতা উপেক্ষিতা দেবী কি সংসার উজ্জ্বল করিতেছেন। আশায় মানুষ কতকাল জীবিত থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই সরযূও আর ইহসংসারে নাই; তাহাকে কত আশা দিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আমি তাহার কি করিলাম। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়া, দেবতা-সমীপে আজীবন তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইব শপথ করিয়া এ কি করিলাম! সেই সতীসাধ্বীকে আজীবন কষ্ট দিয়া মহাপাপে নরকে ডুবিলাম!

এতদিন পরে নিখিলের ঘরের কথা মনে পড়িয়াছে, তাই বিবেকের পুণ্য প্রতিধ্বনি অনুতাপ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু আরও কিছুদিন পূর্ব্বে এ নাদ শ্রবণ

গোচর হইলে আর তাঁহাকে এত হাবড়াইয়া পড়িতে হইত না, এখন সে শোক-দৈন্যের দারুণ অবসাদে বড় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দুর্ব্বল হইয়া একপ্রকার বধির হইয়া পড়িয়াছে, স্বর্গের এ পবিত্র দুন্দুভি-নিনাদ কি সে শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে পুণ্যের পথে অগ্রসর হইবে? এখন কি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবে—তাহার সে ভাগ্য কই!

পুণ্যের নিকট পাপ অগ্রসর হইতে পারে না; নিখিল নিজেকে মহাপাপী বলিয়া মনে করিয়াছে, কাজেই সে প্রতিভা আভাময়ী, পবিত্র দেবীমূর্ত্তি সরযূর নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে কেন? আর কেমন করিয়া বা সে তাহার নিকট মুখ দেখাইবে; স্বইচ্ছায় সে দুঃখ দৈন্য বিজড়িত পবিত্র মূর্ত্তির নিকট দাঁড়াইবার ক্ষমতাই বা তাহার কোথায়! সরযূর এ হাড়ির হাল করিবার কর্ত্তাই যে নিখিল স্বয়ং!

বিশেষ চিন্তা করিয়া নিখিল সাব্যস্ত করিল—বাপ মায়ের এত আদরের আদরিণী সরযূ যদিই জীবিত থাকে, তাহা হইলে এ অবস্থায় যাইব কেমন করিয়া, খাওয়াইব কি? নিজেদের বিষয় আশয়ে ছাই পড়িয়াছে, শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তিও কিছু নাই যে চিরদিন বসিয়া বসিয়া চলিবে? যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে উপায়ের উপায় যদি করিতে পারি ত যাইব—নতুবা আর কিসের টান, কিসের মায়া মমতা! নিখিল পরদিন মাধুরীর কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করত কলিকাতা ত্যাগ করিল।

(৯)

আমরা এতদিন একটী আবশ্যকীয় ঘটনা বিবৃত করিতে ভুলিয়া ছিলাম। ব্রজেশ্বর নিখিলের সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়া দিয়া আর কোন প্রকার খোঁজ খপর গ্রহণ করেন নাই। পত্নীর উত্তেজনায়, মনোরমার জন্য ব্যস্ত হইয়া বহু চেষ্টায় একজন বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টারের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বিবাহের দুই বৎসর পরে মনোরমা বিধবা হইয়াছে। পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিলে বোধ হয় মনোরমাকে দ্বিতীয়বার পতি-পরিগ্রহ করিতে হইত কিন্তু সে যে গৌরীদেবীর অধীন—সেখানে অন্য ব্যভিচার বরং চলিতে পারে কিন্তু সে ব্যভিচার আদৌ চলিবে না। কিছুদিন কান্নাকাটীর পর গৌরীদেবী কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোলে টানিয়া ঠিক হিন্দুর মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মনোরমার সহিত আপনিও ব্রহ্মচারিণী সাজিলেন, সমস্ত সুখ বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া নিরামিষ আতপান্ন ভোজনে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। প্রথম প্রথম মনোরমার কিছু কষ্ট হইয়াছিল—তারপর মায়ের শিক্ষাগুণে সমস্তই সত্য হইয়া গেল। সাহেবী ধরণে প্রতিপালিতা, ব্যারিষ্টার-পত্নী মনোরমা আজ পবিত্র ব্রতপালিনী, ব্রহ্মচারিণী—হিন্দুর পবিত্র সংসারের দেবী স্বরূপিনী—এইজন্য আজ তিনি আমাদের নমস্যা!

ব্রজেশ্বর বড় আশা করিয়া কন্যাকে ব্যারিষ্টারের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন—সাহেব জামাই হইলে—তাহার সংসারে সাহেবী-খানার স্রোত পূর্ণমাত্রায় চলিবে—তাহার আশা

মিটিবে, গৌরীদেবী আর তাহার মত জামাতাকে শাসনে রাখিতে পারিবেন না; আর সে পরের ছেলে—শাসন মানিবেই বা কেন? কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে আশায় বিধি বাদ সাধিলেন। সামান্য দিনের মধ্যে মনোরমা বিধবা হইল। গৃহিণী কন্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। হিন্দুত্বে খুব বাঁধাবাঁধি ভাব সংসারে প্রবিষ্ট হইল। ব্রজেশ্বর অল্প বয়সে প্রাণের কন্যা মনোরমাকে বিধবা হইতে দেখিয়া, সোণার প্রতিমাকে নিরাভরণা, আহার-বিহার ভোগ-বিলাস পরিত্যক্তা দেখিয়া কিছুদিন অনবরত নেশার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, লিভার এবসেস্ হইয়া সামান্য দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গৌরীদেবী স্বামীর শোকশেল হৃদয়ে ধরিয়া কন্যার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। মায়ে ঝিয়ে এখন আর কোন পার্থক্য রহিল না।

পিতার মৃত্যুর পর দেবেন বিলাত যাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। সে বি, এ পাশ করিয়াছে—এইবার বিলাত যাইয়া হিন্দুর ছেলে একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব হইয়া আসিতে তাহার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইল। জননী কত প্রকারে তাহাকে নিষেধ করিলেন। অন্ধের নড়ী, কাণা মায়ের ধন, সে বিলাত যাইলে গৌরীদেবী আর বাঁচিবেন না, বলিয়া কত কাঁদিলেন কিন্তু শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্ক দেবেনের হৃদয় মায়ের কান্নায় গলিল না, সে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিল না। প্রথমে মায়ের নিকট টাকা চাহিল, জননী তাহা দিতে অস্বীকার করায় সে মনে করিল—মাধুরীর বিষয় বিক্রয়

করিয়া টাকা লইবে—সে ত তাহার পিতারই দেওয়া। এই বলিয়া সে বীডন ষ্ট্রীটে গিয়া দেখিল—নিখিল তথায় নাই, বাড়ী চাবী দেওয়া পড়িয়া রহিয়াছে। লোকের নিকট শুনিল—মাধুরী মারা যাইবার পর নিখিল কয়েকদিন এখানে ছিল, তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান জানে না কিন্তু সকলের মুখেই শুনিল—বাড়ীখানি মাধুরী নিখিলকে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছে—সেই দানপত্রে তাহারা সাক্ষী আছে ; লোকমুখে এই কথা শুনিয়া দেবেন আর কোন কথা কহিল না। বাড়ী ফিরিয়া পুনরায় মার নিকট আবদার ধরিল। গৌরীদেবী বলিলেন—বাবা! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, তিনি মারা গিয়াছেন—এক্ষণে আমি তোমার মুখ চাহিয়াই জীবিত আছি, আমার ভরণপোষণের ভার তোমার উপর, বিলাত না যাইলেই কি নয়? এখানে থাকিয়া কি আর কোন কাজ করা যায় না? এত লোক ত বি, এ পাশ করিয়াছে—সকলেই কি বিলাত যাইতেছে? আমার যদি আর পাঁচটা থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে সেই দূরদেশে যাইবার জন্য অনুমতি দিতাম, তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য, অর্থ দিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু আমার কেহ নাই ; বাপের বাড়ীর মাসহারা টাকাও এখন আর মাসে মাসে ঠিক পাওয়া যায় না। বাবা স্বর্গগত হওয়ায় ভাইয়েরা তাহা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার শেষ সম্বল কয়েকখানি গহনা মাত্র আছে বটে কিন্তু কেমন করিয়া তাহা নষ্ট করি, এই বাল-বিধবা অভাগিনী আমার স্কন্ধে পড়িয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য, এবং বাঁচিয়া থাকিলে আমাকেও ত একবেলা একমুঠা খাইতে হইবে—সেজন্য যাহা আছে—

সেত বেশী নয়, অতএব আমি প্রাণ থাকিতে তাহা তোমাকে দিতে পারিব না। তুমি আমার একমাত্র সম্বল, এই কলিকাতায় থাকিয়া যাহা পার একটা কাজকর্ম্ম করিয়া উন্নতির চেষ্টা কর, আর আমাকে জ্বালাইও না, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না। মাতা কিছুতেই বাগ মানিলেন না,—কথা শুনিলেন না, দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ কয়েকদিন চুপ করিয়া শান্ত-শিষ্ট ছেলের মত গৃহে রহিল। জননী মনে করিলেন—দেবেন দুষ্ট সংকল্প ত্যাগ করিয়াছে, বিলাত যাইবার ইচ্ছা আর তাহার নাই। কাজেই অবিশ্বাস কি, সেত আর তেমন দুষ্ট ছেলে নয়! সমস্ত বিশ্বাস—সমস্ত নির্ভর—তাহার উপর যেমন ছিল, সেইরূপ রহিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেবেন সময় বুঝিয়া গভীর রাত্রে মায়ের জড়োয়া তাবিজ জোড়াটী চুরী করিয়া চম্পট দিলেন, বাজারে বিক্রয় করিয়া একেবারে জাহাজে উঠিলেন।

পুত্রের দুইদিন অদর্শনে মায়ের মনে সন্দেহ হইল—তিনি বাক্স খুলিয়া দেখিলেন,—দেবেন সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি আর কি করিবেন—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবা! এই কি তোর ধর্ম্ম হইল, আমাদের পথে বসাইলি—যাহা হউক, তুই সুখে থাক্! এত কষ্টে জননী পুত্রকে অভিসম্পাত করিলেন না। তারপর পুরাতন ভৃত্য বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—বৈদ্যনাথ দেবেনের কাণ্ড কারখানা শুনিয়াছ, সে আমার ভাল দুইখানি গহনা,—চুরী করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ শুনিয়া বলিল—গিন্নী মা, তবে কি হবে—আপনাদের চলিবে কিসে? গৌরীদেবী বলিলেন—চালাইবার কর্ত্তা ভগবান, এখন তুমি এক

কাজ কর; এই বৃহৎ বাটীর এত টাকা ভাড়া আর মাসে মাসে দিতে পারিব না; আর কেনই বা দিব—এত বড় বাড়ীতে এখন আর আমাদের দরকারই বা কি! তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন, দেবেনও কাহার মুখ চাহিল না, এই দুঃসময়ে আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গেল, তবে আর এত বড় বাড়ী রাখা কেন? তুমি কোন নির্জ্জন স্থানে সামান্য ভাড়ায় খুব ছোট একখানি বাড়ী দেখ—আমরা দুই তিন দিনের মধ্যে সেখানে উঠিয়া যাইব।

বৈদ্যনাথ তাহাই করিল। দুই একদিনের চেষ্টায় শাঁখারী টোলার একটী নিভৃত গলিতে একখানি ছোট একতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদের লইয়া গেল। বৈদ্যনাথই এখন এই দুঃস্থ পরিবারের অভিভাবক, বাস্তবিক সে তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া অভিভাবকরূপে প্রাণপণে কাজ করিতে লাগিল। দুই পয়সার জায়গায় একপয়সায় সংসার চালাইয়া তাহাদের ব্যয়ভার লাঘব—সংসারের সাশ্রয় করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ কুড়ান ছেলে—এলাহাবাদে সে কোন গরীব কায়স্থ পরিবারে জন্মিয়াছিল, শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ইহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে; গৌরীদেবী তাহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া এত বড় করিয়াছেন। সে তাঁহাকে মা বলিয়াই ডাকিত, মায়ের সমস্ত স্নেহ মমতা সে গৌরীদেবীর নিকট হইতেই পাইত। কাজেই যাহাতে এই পরোপকার-পরায়ণ সংসারটী একেবারে রসাতলে না যায়—, বৈদ্যনাথ তাহা করিবে না—সে গরীব হইলেও নিমক্‌হারাম ত নহে?

গৌরীদেবী বড়ই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক—তার উপর হিন্দুধর্ম্মের

পবিত্রভাব তাঁহার অস্থি মজ্জায় জড়িত। তখনও তাঁহার হাতে যাহা আছে, ভাইয়েরা মাসহারা বন্ধ করিলেও বুঝিয়া চলিতে পারিলে—জীবনে কোন কষ্ট হইবে না। তিনি যেমন যেমন বলিয়া দেন, যেরূপ কাজ করিতে ইঙ্গিত করেন, বৈদ্যনাথ তাহা ত করেই, সময়ে সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে এমন সুন্দরভাবে কার্য্য করিয়া আসে—যাহা দেখিয়া গৌরীদেবী তাহাকে কত সুখ্যাতি করেন—কত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—বাবা! সকলের সব হইল—এ সংসারে আসিয়া কর্ত্তার দৌলতে অনেকেই মানুষ হইল কিন্তু তোর ত কিছু হইল না? তা বাবা! তুই জোগাড় সোগার করে একটী বিয়ের চেষ্টা দেখ; যা খরচ লাগে আমি দিব। বৈদ্যনাথ গিন্নী-মায়ের কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া বলিত—মা; এখন যেন তুমি আছ; তাই বিয়ের খরচা দিলে; কিন্তু তার পর আমি কি করিব—কেমন করিয়া চালাইব? মা, উহার জন্য আমাকে অনুরোধ করিবেন না, আমি বেশ আছি! বাস্তবিক বৈদ্যনাথের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইলেও, কলিকাতার ন্যায় প্রলোভনময় স্থানে থাকিলেও—আমরা যতদূর জানি—তাহার চরিত্র গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল ছিল, মনে কখন কোন পাপ প্রবৃত্তির উদয় হইত না; যাহাতে ঐরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, সে তাহার দিক দিয়াও যাইত না। সমস্তদিন সে একটা না একটা কাজে এমন নিবিষ্ট থাকিত, যাহাতে তাহার মন অন্য কোন প্রকার চিন্তার অবসর পাইত না। বৈদ্যনাথ শূদ্র হইলেও যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ব্রহ্মচারী ছিল, এইজন্য তাহার সেই গোলগাল সুন্দর আকৃতি প্রকৃতিতে গৌরীদেবী দেবেনের চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

(১)

রজনী প্রায় অবসান—ঊষার আগমন প্রতীক্ষায় নিশার নির্ম্মল বাতাস তখন ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া যাইতেছে; কামরূপে ব্রহ্মপুত্র নদের ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালায় একটী সন্ন্যাসী উমানন্দের মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রভাতালোকের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বহু শাক্ত-ভক্ত সন্ন্যাসী মহাপীঠ কামাখ্যাদেবীর দর্শনের পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালায় ভৈরবেশ্বর উমানন্দের পূজা করেন। এখানে পূজা না করিলে কামাখ্যাদেবীর পূজায় কোন ফল হয় না, দেবী ভক্তের প্রতি প্রসন্না হন না। তাই দণ্ড কমণ্ডলুধারী এই দেবকল্প সন্ন্যাসী পবিত্র ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া একটী উপলখণ্ডে বসিয়া আছেন, মরি মরি কি আনন্দময় মূর্ত্তি! আনন্দময়ী ভগবতীর প্রিয় পুত্র না হইলে—শক্তি সাধনায় বিশেষ ভাবে সিদ্ধ না হইলে এমন আনন্দময় ভাব জীবহৃদয়ে কখনও উদয় হয় না। কেহ কোথাও নাই; নিশাবসানে সকল স্থানের লোকজন এখন জাগরিত হয়

নাই—উঠি উঠি করিয়া এখনও অনেক লোক শয্যার কোলে পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে। জনস্থানই যখন জনহীন তখন এ নির্জ্জন পাহাড়ে লোক সমাগম হইবে কোথা হইতে? তখন কোম্পানী বাহাদুরের কৃপায় এ তীর্থ-স্থান সঙ্কটহীন হয় নাই—বলিয়া নানা স্থান হইতে এত লোক সমাগম হইত না; প্রাণের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া বড় কেহ এ জঙ্গলময় স্থানে দেবী দর্শনে যাইত না, তবে যাহারা মায়া মমতার অতীত হইয়াছে—মরণটাকে যাহারা কেবল অবস্থা পরিবর্ত্তন বলিয়া বুঝিয়াছে—আত্মা অজর অমর—জীবনে মরণে সমান—এই জ্ঞান যাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, এমন মুক্ত পুরুষই তখন এইরূপ তীর্থ যাত্রী হইত, প্রাণময় পুষ্পে প্রাণময়ীর পূজা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিত। এ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর, তাই এত আনন্দময় ভাব—চিত্ত তাই এত নির্ভীক; সন্ন্যাসী এই মনোহর মন্দিরদ্বারে বসিয়া মনোহর সুরে একান্ত মনে গাহিতেছেন :—

(আমি) এই নিবেদন করি শ্যামা তব চরণে।
একবার মনোময়ী হয়ে নাচ আমার হৃদি-অঙ্গনে॥
ও রাজীব পদভরে, মনের মলা যাবে দূরে,
ভাসিব আনন্দ-নীরে চির জীবনে॥
(আমার) ভজন সাধন বল, যাগ যজ্ঞ পূজা ফল
না আছে কিছু সম্বল পাপী জীবনে॥
তাই বড় আশা করে এসেছি তব দুয়ারে
দেখা দিয়ে পুরাও আশা ডাকি সঘনে॥

ভক্তের ভক্তির স্রোত চক্ষু বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। গান

শেষ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তন্ময়ভাবে বসিয়া রহিলেন, তারপর অরুণের অরুণিমায় যখন চারিদিক উদ্ভাসিত হইল—উষার রক্তিম রশ্মিতে যখন নিশার অন্ধকার মুখ লুকাইয়া পলায়নপর হইল—পর্ব্বত গুহার পিচ্ছিল পথ যখন বেশ দেখা যাইতে লাগিল—পাণ্ডাগণ আসিয়া যখন ভগবান উমানন্দের পূজার জন্য মন্দিরপথ পরিষ্কার করিল, তখন ভক্তবীর ধীরে ধীরে সে মন্দির গহ্বরে প্রবেশ করিয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা করিলেন। সে এক স্বতন্ত্র ধরণের পূজা; ভক্তের প্রাণের পূজায় ও সাধারণ পূজায় প্রভেদ অনেক। ইহাতে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নাই—সবই আভ্যন্তরিক—সমস্তই মনে মনে মানস পূজা! সাধনার সময়ে এই পূজাতেই সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া—আপনহারা হয়, এই আপনহারার নামই সমাধি-যোগ! কত লোক আসিল, পূজা করিয়া চলিয়া গেল, সন্ন্যাসীর কিন্তু পূজা আর ফুরায় না, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই! প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে সাধক মত্ত মাতঙ্গের মত সুধাপানে বিভোর চিত্তে হেলিতে দুলিতে, উপরে আসিয়া নিজ কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে শাল্মলী বৃক্ষতলে সন্ন্যাসীর আশ্রম—গৌহাটী যাইবার পথে ক্ষুদ্র তপোবনে এই সুন্দর আশ্রমে সন্ন্যাসী সমস্ত দিন অতিথি সৎকার করিয়া সন্ধ্যার পর কিছু আহার করেন।

সে বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল মুখব্যাদান করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার করাল দংষ্ট্রে কত শত নরনারী যে চর্ব্বিত হইয়া উদরসাৎ হইতেছে—তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দেশে অন্ন নাই—

দেশবাসী অন্নকষ্টে ম্রিয়মান—যাহা পাইতেছে তাহাই খাইতেছে; পেটের জ্বালায় মানুষের অভ্যক্ষ ভক্ষণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইতেছে, দু'একদিন ক্ষুধায় প্রাণফাটা কষ্ট, তারপর রোগের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটু আধটু খাবি খাইবার পর বুকে হাত দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। একদিন এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অতি ভীষণভাবে আমাদের দেশকে গ্রাস করিয়াছিল। কত লোক যে এই মন্বন্তরে প্রাণ হারাইয়াছিল—কত শিশু মাতৃপিতৃহারা হইয়াছিল—কত জনক-জননী প্রিয় পুত্রকন্যার মুখে একগ্রাস অন্ন দিতে না পারিয়া কালের করাল গ্রাসে তুলিয়া দিয়াছিল—কত সতী পতিহারা হইয়াছিল, কত পতি পত্নীবিয়োগে অসহ্য মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

আসাম অঞ্চলেও ইহার প্রকোপ খুব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর সাধন-মন্দিরে তাই দলে দলে অভুক্ত ক্ষুৎপিপাসা কাতর অন্নহীনের দল আসিয়া দাও অন্ন, দাও জল বলিয়া কাতর-স্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী দেশের অবস্থা দেখিয়া যোগ-তপস্যা ভুলিয়া কি উপায়ে এই অভুক্তদের অন্ন দিতে পারেন, কি উপায়ে ভগবানের সৃষ্ট এই জীব সকলের কিছু কিছু উপকার করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্নহীনে অন্নদান যে সেবা-ব্রতের প্রধান কর্ম্ম; ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর কি আছে? ভগবানকে প্রসন্ন করিতে হইলে—দরিদ্রের সেবা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যোগ-তপস্যায় যে ফল না হয়; ক্ষুধিতের অন্ন সংস্থান করিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে

পারিলে, অতি সহজেই তাহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করিতে পারা যায়।

দেশের যখন এই অবস্থা, চারিদিকেই হাহাকার রব—তখন ঘরে বসিয়া কেবল পূজায় বিব্রত থাকিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না। তখন ক্ষমতানুসারে সেবাব্রতে যোগদান করা প্রয়োজন। দিন দিন ক্ষুধিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসীর সাধন-মন্দিরে আসিলেই—কিছু না কিছু খাবার পাওয়া যাইবে, পূর্ব্বাপর সকলেই জানিত,—সন্ন্যাসীর দয়ার অন্ত নাই! তাঁহার "সাধন-মন্দির" দরিদ্রের জন্যই স্থাপিত; যে কোথাও খাইতে পায় না, পিপাসার জল পায় না, পরণের জন্য কাপড় পায় না, সাধন-মন্দিরে আসিলেই তাহার প্রতিকার হয়, অভাব অভিযোগ এক প্রকার মেটে, তাই এ দুর্দ্দিনে দলে দলে আরও বেশী লোক সমাগম হইতে লাগিল।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী হুঙ্কার ছাড়িয়া চারিদিকে ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেশের চারিদিকেই ত হাহাকার—ক্ষুধিতের মর্ম্মন্তুদ রোদন; শুধু তাই নয়, পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আবার বিষম ঝড়ে দেশ উলট-পালট করিয়া দিল; লোকের ঘরবাড়ী চুরমার হইয়া গেল; কত শত বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইল, ব্রহ্মপুত্র নদ অতি প্রবল হইয়া সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত—গৃহশূন্য হইল; কত গৃহ-পালিত পশু ডুবিয়া মরিল—কে তাহার সংখ্যা করে!

সকলে জানে—সন্ন্যাসীর "সাধন-মন্দির" দ্বার দরিদ্রের জন্য চির-উন্মুক্ত, তাহার সেবক সন্ন্যাসীপ্রবর দরিদ্রের মা বাপ; তাই কাতারে কাতারে লোক সমাগম হইতে লাগিল। দেশের অবস্থা

দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আশ্রমের পূর্ব্বধারে যে সুবৃহৎ আটচালা খোলা ছিল—তাহা লোকজনে ভরিয়া গেল; তারপর কত ভদ্রঘরের স্ত্রী পুরুষ সন্তান সন্ততি লইয়া আসিত, যদি আহার পাইত—করিত, নতুবা হতাশ হইয়া বৃক্ষতল সার করিত, কিন্তু হায়! তাও কি আছে, জনস্থান, বন্য উপবন যে তরুশূন্য হইয়াছে। "সাধন-মন্দিরের" আশে পাশের সমস্ত বৃক্ষও ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল একটী বৃহৎ শিমূল বৃক্ষ, তৎপার্শ্বে একটী বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ—মাথা তুলিয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তারপর চারিদিক ধূ ধূ প্রান্তর—সীমাহীন শস্যশূন্য ক্ষেত্র সকল পড়িয়া হা হা করিতেছে।

সন্ন্যাসীর নিদ্রা নাই—দেশের অবস্থা দেখিয়া একদিন গভীর রাত্রে প্রাণের দুঃখে সেই বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া রজনী যাপন করিতেছেন। মনে ভাবিতেছেন—দেশে অনেক রাজা মহারাজ আছেন—পূর্ব্ববঙ্গে ধনী লোকের অভাব নাই কিন্তু দেশের এ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের প্রাণ কি কাঁদে নাই?—স্ত্রী পুত্র লইয়া তাহারা ত বেশ সুখে আছে, দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন তাহাদের তত অনিষ্ট করিতে পারে নাই—কাজেই আর কেন? অন্যে মরিল কি বাঁচিল তাহাতে তাহাদের যায় আসে কি? বড় লোকের হৃদয় এমনি ছোট, প্রাণ এমনি নির্ম্মম। দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা যিনি—ইংরাজ রাজ তাঁহারও প্রাণ কাঁদে নাই, কাজেই প্রজার অবস্থা শোচনীয়! দরিদ্র সন্ন্যাসীর সাধন-মন্দিরের অবারিত দ্বার, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উন্মুক্ত, কিন্তু অর্থ কোথায়! এ সময় যে

বহু অর্থের প্রয়োজন। বিল্ববৃক্ষমূলে এই গভীর রজনীতে বিনিদ্র ভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া সন্ন্যাসী বড়ই মর্ম্মযাতনা অনুভব করিতেছেন। হায়! এতদিনে বুঝি তাঁহার সাধন-মন্দিরের নাম ডুবিল—আর বুঝি পারিলাম না—বুঝি এইবার সকলে নৈরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে—ভিক্ষা করিয়া যাহা করিতাম, তাহার দ্বারা আরত চলে না, আরত কেহ ভিক্ষা দেয় না; দেশ ভিখারী হইয়াছে, তবে ভিখারীকে কে ভিক্ষা দিবে? যে সকল গৃহস্থ মুক্তহস্ত ছিল—তাহারাই এখন ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কেহ কেহ বা লজ্জায় গৃহের বাহির না হইয়া উদ্বন্ধনে মরিতেছে; তবে ভিক্ষা দেয় কে? ধনী জমীদারগণের প্রাণ কি এ স্বাত্ত্বিক দানে হস্ত প্রসারণ করিবে না?

চিন্তায় বিভোর, সন্ন্যাসীর চিন্তার কূল কিনারা নাই—কি করি, কোথায় যাই—কিসে এই অভুক্তদের প্রাণ বাঁচাই, মা! ভগবতী, উপায় বলিয়া দাও, যাহাতে তোমার এই ক্ষুধিত সন্তানগণ আহার পায়!

পরের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, এ জগতে সেই মানুষ এবং তাহার কান্না শীঘ্রই মায়ের কর্ণগোচর হয়! ছোট বড় অনেক প্রকার সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করিলে একেবারে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মায়ের দুয়ারে পৌছান যায় না! তাই শক্তি সাধকের শক্তি অসীম—হৃদয়ের প্রশস্ততাও অসীম অনন্ত—সে যাহা দেখে—তাহাতেই মায়ের বিভূতি দেখিয়া চমৎকৃত হয়; এ সকলি যে মায়ের—ইহারা যে মায়ের সন্তান, আমার সহোদর ভাই; আমি থাকিতে ইহারা কষ্ট পাইবে—কোন উপায় করিতে পারিব না!

বিল্ববৃক্ষ হইতে উত্তর হইল—শ্যামানন্দ চিন্তা করিও না, দুই তিন দিনের মধ্যে ইহার উপায় হইবে—তুমি অজস্র টাকা পাইবে; তেজপুর রাজের একমাত্র পুত্রকে আমি অধিকার করিয়াছি। রাজা পুত্রের আরোগ্য জন্য প্রথমে বহু চিকিৎসক ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ রোগ নিরাকরণ করিতে পারে নাই—সকলেই একেবাক্যে বলিয়াছে—ছেলেটাকে ভূতে পাইয়াছে। আর বাস্তবিক তাই; আমি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছি, তজ্জন্য অনেক রোজা-বৈদ্য আসিয়াছে কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না। তুমি আমার পরম ভক্ত, বহুদিন আমাকে এস্থানে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছ, আমার পূজা করিতেছ। তজ্জন্য আজ আমি তোমায় এক উপায় বলিয়া দিতেছি; প্রসন্নময়ী যার প্রতি প্রসন্ন, বৎস! সদিচ্ছা যার হৃদয়ে এত প্রবল—মা তাহার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিয়া থাকেন! যাও বৎস! প্রাতঃকালে রাজবাটীতে গিয়া চিকিৎসা কর, তুমি গিয়া উপস্থিত হইলেই—দুই একটা ঝাড় ফুক করিলেই আমি রাজপুত্রকে ছাড়িয়া দিব। তাহা হইলে তুমি অজস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে! পুত্রের আরোগ্য কামনায় রাজা পঞ্চসহস্র মুদ্রা ঘোষণা করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী শ্যামানন্দ চমকিত হইলেন—সেই বৃক্ষে যে একটা ব্রহ্মদৈত্য থাকিতেন—তাহা তিনি জানিতেন—এবং তাঁহার পূজার জন্য তিনি নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অপর লোক হইলে তাহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিত কিন্তু শাক্ত-সাধক এ সকল উপদেবতাকে ভয় করেন না, বরং মায়ের অন্তরঙ্গ সন্তান বলিয়া

মান্য করেন, একত্র অবস্থান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আজ ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে সন্ন্যাসী বলিলেন—প্রভু, আপনি টাকা উপার্জ্জনের সরল পন্থা দেখাইয়া যে কি উপকার করিলেন—তাহা বলিতে পারি না; আজ আমি ধন্য হইলাম। শ্যামানন্দ অভিবাদ করিয়া রাত্রি অবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(২)

তেজপুর রাজবাটীতে আজ সকলে ম্রিয়মান, মহারাজের পুত্রের জন্য সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, আর হইবার আশা নাই! যেরূপ উপদেবতার আক্রমণে সে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে আর বাচিবার আশা নাই। এইরূপে কিছুদিন গোঁয়াইয়া নিশ্চয়ই পুত্রটী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—যখন আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে, তখন আর জীবনের আশা কোথায়? কল্য রজনীযোগে একটু ভাল ছিল—কিন্তু আজ প্রাতঃকালের আক্রমণ অতি ভীষণ, রোগী কেবল মুখ ঘষিতেছে; অতিরিক্ত যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, এই বুঝি শেষ, রাণী পুত্রের জন্য ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন—রাজবাটী শোকে দুঃখে মূহ্যমান! রাজা কেবল অন্দর বাহির করিতেছেন যাহাকে দেখিতেছেন, কাতর স্বরে, তাহাকেই বলিতেছেন—দেখ, তোমরা একটা ভাল বৈদ্য আনিয়া দাও আমি তাহাকে আশাতীত পুরস্কার দিব, এবং তাহার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব—তোমরা ইহার একটা

উপায় বলিয়া দাও। সকলেই বলিতেছে—মহারাজ! আমাদের যাহা কিছু জানা ছিল—ভাল ভাল যে সকল বৈদ্যের সহিত আলাপ ছিল, সমস্ত আনিয়া দিয়াছি; আর কি করিব!

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন শ্যামানন্দ সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সন্ন্যাসীর তপ প্রভাব বিশিষ্ট দেহ জ্যোতি দেখিয়া প্রণাম করিয়া শশব্যস্তে বলিলেন—প্রভু! আপনি কি উপদেবতা ছাড়াইবার কোন উপায় জানেন?

সন্ন্যাসী বলিলেন—হাঁ, তাই শুনিয়াই আমি আসিতেছি; চলুন একবার রোগীকে দেখিয়া আসি,—মায়ের কৃপায় বোধ হয় তাহাকে রোগ-মুক্ত করিতে পারিব! রাজা হাতে স্বর্গ পাইলেন—সন্ন্যাসীকে লইয়া অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। মায়ের কৃপায় এবং ব্রহ্মদৈত্যের কথায় তিনি সকল প্রকার সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছেন। দুই একবার ঝাড় ফুঁক করিবামাত্র রাজপুত্র পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লজ্জায় অধো-বদন হইল উলঙ্গ অবস্থায় কত কি বকিতেছিল—এক্ষণে লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিল না, বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

রাজা সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা, অত্যাশ্চর্য্য তপ প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে বলিলেন—প্রভু! যাহা ঘোষণা করিয়াছি, তাহাত দিবই, তাহা ছাড়া আপনার আর কি অভিপ্রায় আছে—বলুন?

শ্যামানন্দ বলিলেন—দেখুন! আমি সন্ন্যাসী, অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, আপনারা দেখিয়াও তাহা দেখেন না; নিজের সুখ ভোগ-

লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, এই জন্য ভগবতীর প্রকোপে আপনার এত ভীষণ বিপদপাত হইয়াছিল। আপনি যে এখানকার একজন বড় ধনী, এ সময় আপনার মুক্ত হস্ত হওয়া উচিত নয় কি!

গৌহাটীর পথে মায়ের "সাধন-মন্দিরের" আমি একজন সামান্য সেবক; দলে দলে তথায় আজ লোক সমাগম হইতেছে, আমি তাহাদের রীতিমত আহার ও বাসস্থান দিতে পারিতেছি না। আপনি তথায় আরও কয়েকখানি পান্থ-নিবাস ও তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিন।

রাজা সলজ্জায় অবনত মস্তকে তাহা পালন করিলেন। আরও কয়েকখানি বৃহৎ আটচালা নির্ম্মাণ হইলে রাজা তাহার ভাণ্ডার গৃহে অজস্র খাদ্যদ্রব্য পুরিয়া দিলেন—পাচক ব্রাহ্মণেরও ব্যবস্থা হইল, বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা হইল। শ্যামানন্দ মনের উল্লাসে, প্রত্যহ দীন দুঃখীর অভাব মোচন করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

দিন দিন লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু শ্যামানন্দ তাহাতে দিকপাত করিলেন না—মা যখন উপায় করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনিই যে অন্নপূর্ণারূপে সমাগত দরিদ্রগণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন—তাহাতে সন্দেহ কি?

যতই লোক সমাগম হইতে লাগিল—"সাধন-মন্দির" ততই দরিদ্র সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্বামী শ্যামানন্দ শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা তৎপর হইলেন, শুধু কি আহার্য্য ও বস্ত্র প্রদান; কোন নর নারী পীড়াগ্রস্ত হইলেও সাধক শ্যামানন্দ ঠিক পিতার মত তাহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া

সেবাশুশ্রূষায় রত হইলেন। এই সময়ে শ্যামানন্দের সাধন-মন্দিরের নাম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই জানিল—সাধন-মন্দিরের মত সেবাশ্রম বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশে কেন—সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলেও বুঝি এমন যত্ন, এমন সেবা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না; "সাধন-মন্দির" এ বিষয়ের আদর্শ। এখানে খোঁড়া, কাণা, আতুর, অনাথের অনাদর নাই—এখানে আসিলে সকলেই ঠিক গুরুর মত পূজা পাইয়া থাকেন। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করাই, এই আশ্রমাধ্যক্ষ শ্যামানন্দের উদ্দেশ্য, ইহার মধ্যে স্বার্থের নামগন্ধ নাই। কেবল পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর, ক্ষুধিতকে অন্ন দাও, বিপন্নের সেবা কর—ইহাই যখন সাধন-মন্দিরের মূলমন্ত্র, তখন ইহার নাম জগৎ বিখ্যাত হইবে না কেন?

সাধকের একটা আকর্ষণী শক্তি ত আছেই, তাহার উপর সৎ-কার্য্য জনিত অনুরাগ একবার হৃদয়ে জাগিলে অতি বড় পাষণ্ডও গলিয়া যায়, তখন সে সর্ব্বস্ব দিয়াও পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। পুত্রের আরোগ্য লাভের পর রাজা শ্যামানন্দের প্রেমে এতদূর মজিয়া গিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিতেছেন—রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া মনে করিতেছেন।

রাজা কৃপণের অগ্রগণ্য ছিলেন। খাওয়া অপেক্ষা খাওয়ানতে যে এত সুখ, এরূপ বিমল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার ধারণায় ছিল না। এখন বুঝিতে পারিয়া তিনি প্লাবন-পীড়িত; দুর্ভিক্ষ-তাড়িত দেশবাসীর জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন—এবং

নিজে স্বজনগণে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের তত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামানন্দ রাজাকে উদ্যোগী দেখিয়া এক্ষণে আবার সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সমস্তদিন বিশ্বজননীর সাধন-ভজন করিয়া সন্ধ্যাকালে দুস্থ পীড়িত ব্যক্তিগণের শিয়রে উপস্থিত হইয়া ঠিক পিতার মত অতি মধুরস্বরে সকলের নিকট রোগ বিবরণ শ্রবণ করেন। যে রোগী অশেষ যন্ত্রণা পাইতেছে; তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দেন, রোগীগণ এই মধুর স্বর্গীয় স্পর্শ সুখে সমস্ত রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে।

একদিন বহু দূরদেশ হইতে কতকগুলি কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষ-জীর্ণ ব্যক্তি "সাধন-মন্দিরের" সুনাম শুনিয়া আশ্রয় লইতে আসিল। শ্যামানন্দ তখন প্রাতঃস্নান করিয়া মন্দিরে মায়ের আরাধনায় নিযুক্ত, রাজা তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাহারা সকলে তাহার মধ্যে গমন করিল। তাহাদের মধ্যে একটী খঞ্জ বৃদ্ধা, একটী বৃদ্ধ অন্ধের হস্ত ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহারা বলিল—বাবা! আমাদের একটু স্বতন্ত্র স্থান দাও, আমরা সকলের সঙ্গে একত্র থাকিব না। বৃদ্ধের গলদেশে মলিন যজ্ঞসূত্র দেখিয়া রাজা তাঁহাদিগকে বিপন্ন ব্রাহ্মণ-দম্পতী বুঝিয়া অপেক্ষাকৃত একটু সুন্দর বাসস্থান প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অন্ধের হস্ত ধারণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিল।

দেখিয়া বোধ হইল—অন্ধ নিশ্চয়ই বৃদ্ধার স্বামী। অগ্নি ভস্মাচ্ছা-

দিত হইলে যেমন মলিন হয়, ইহারাও সেইরূপ ; নিশ্চয়ই কোন ভদ্র-গৃহস্থ, দুর্ভিক্ষ প্লাবন-পীড়িত হইয়া এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা পরিচয়ে জানিলেন—ইহারা পশ্চিম বঙ্গের লোক—সাধন-মন্দিরের নাম শুনিয়া আসিয়াছে, তিন চারিদিন তাহাদের খাওয়া হয় নাই। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন,—যাহাতে তাহাদের সেবার কোনরূপ ক্রটী না হয়। ভদ্রলোক বিপন্ন হইয়াছে, সহজে ত কিছু চাহিবে না, তাই কাছে লোক রাখিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ শুনিতে লাগিলেন।

অনাহার ও পথশ্রমে বৃদ্ধ এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে—আশ্রয় পাইবামাত্র শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা তাহার পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ব্যথা বিদীর্ণ, রোগশোক জীর্ণ কঙ্কালসার এই ভদ্র দম্পতীকে দেখিলে বাস্তবিক প্রাণ ফাটিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশকে কিরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়!

শুইয়া পড়িয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল, দৃষ্টিহীন অন্ধের চক্ষুদ্বয় হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইয়া বুক ভাসাইতে লাগিল, বৃদ্ধ বিষম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হায়! এত কষ্টের জীবন কেন যায় না ; এখনও বাছার অদর্শনে কেন দেহে প্রাণ আছে? কি সুখ ভোগের জন্য বিধাতা আর আমাদের জীবিত রাখিয়াছেন ; এখনও কি কর্ম্মফল ভোগের বাকী আছে ; বাবা! কোথায় তুমি! দারুণ প্লাবনে পড়িয়া তুমি কি আর জীবিত আছ? কিন্তু দেখ তোমার

নিষ্ঠুর পিতা মাতা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মরে নাই—বুঝি শোকে দুঃখে অস্থি পঞ্জর এক একখানি করিয়া খসিয়া না গেলে প্রাণপাখী তাহাদের দেহ পিঞ্জর ছাড়িবে না! বৃদ্ধ হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল; যেন দারুণ মহাপাপের দংশন-জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। আর বৃদ্ধা যে ভোগ ভুগিতেছে, যে জ্বালা সহিতেছে, হৃদয়ের মাঝে যে অনুতাপের আগুন জ্বলিতেছে, নয়নের জল বুঝি সে আগুণে পড়িয়া শুখাইয়া যাইতেছে, গড়াইতে পারিতেছে না। সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—দেখ; সমস্তই আমার দোষ, মহাপাপিনী আমি, আমার সঙ্গে পড়িয়া তোমার এত কষ্ট, আর কেঁদোনা; তোমার কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না।

পরিচারিকাটী অন্তরাল হইতে তাহাদের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া দ্রবীভূত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন-পীড়নই কি ইহাদের কষ্টের একমাত্র কারণ, না আরও কিছু আছে; যেন পুত্রহারা উন্মাদ উন্মাদিনীর ন্যায় ইহাদের প্রাণের ভাব! বোধ হয় ইহাদের পুত্র এই দারুণ জল-প্লাবনে কাল কবলে পতিত হইয়া ইহাদের প্রাণে বিষম শোক-শেল হানিয়াছে,:তাই ইহাদের কষ্টের সীমা নাই—হায় ভগবান্! তুমি কখন কাহাকে কিরূপ কর—কে বলিতে পারে?

যথা সময়ে আহারাদি আসিল। সকলের আহারাদি অপেক্ষা ইহাদের আহারীয় দ্রব্য একটু স্বতন্ত্র প্রকার, ইহা একটু ভদ্র-জনোচিত। অন্ধ আহারে বসিল—দুই তিনদিন আহার হয় নাই—পেট মরিয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই গুরুপাকদ্রব্য

এ সময়ে সহজ-পাচ্য হইবে কি? বৃদ্ধ আহার করিয়া উঠিলে বৃদ্ধা রমণী সেই গৃহকোণে আহার সমাপন করিল, পরিচারিকা স্থানটী পরিষ্কার করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল।

(৩)

অপরাপর ভিক্ষুকগণ আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে; যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছে, তাহারাই কেবল আটচালার মধ্যে বিশ্রাম করিতে গমন করিল। বেলা যখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিল—আমাদের কথিত বৃদ্ধটির উদরের পীড়া আরম্ভ হইল—ভুক্ত দ্রব্য আদৌ পরিপাক হয় নাই। বৃদ্ধা খঞ্জ, চলিতে অশক্তা হইলেও স্বামীর এই উদর পীড়ায় বিশেষ সেবা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা মনে করিয়াছিল—দুই একবার দাস্ত হইয়াই সারিয়া যাইবে—কিন্তু তাহা হইল না, ইহা বিসূচিকায় পরিণত হইয়া হাতে পায়ে খিল ধরিতে লাগিল; বিষম পীপাসার সহিত বমনের ভাব দেখা দিল। ভেদ ত হইতেছে—তাহার উপর দুই তিন বার বমন হইয়া যাতনায় বৃদ্ধ অবসন্ন হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা প্রমাদ গণিল—স্বামীর আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যেখানে অনেক লোক অবস্থান করে—সেখানে এইরূপ সংক্রামক ব্যাধি হইলে—তাহাকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া দেওয়া উচিত—নতুবা অপর পাঁচজন এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু এই সেবাশ্রমে রোগীকে বাহির করিয়া দিবার নিয়ম নাই। এখানে শ্যামানন্দ স্বহস্তে রোগীর সেবা করেন,—রোগ বিষ যাহাতে ছড়াইয়া

না পড়ে, তাহার জন্য বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করেন, নতুবা এসময় রোগীকে কষ্ট দিয়া সরাইয়া দিলে, তাহার জীবনের আশা সন্দেহ-জনক ; স্থানে স্থানে থাকেও না।

বৃদ্ধের ভেদ বমন হইয়াছে শুনিয়া শ্যামানন্দ সমস্ত দিনের পর আহারাদি করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন, রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তখন বিকারের ঝোঁকে রোগী শয্যার এ পাশ ও পাশ করিতেছে, শ্যামানন্দ ঔষধ দিলেন—তাহাতে কোন ফল হইল না। রোগীর শেষ অবস্থা বুঝিয়া শ্যামানন্দ মাতৃ-চরণামৃত দানে তাহার বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র করিতে লাগিলেন, পরম আত্মীয়ের মত এই দীনহীন বৃদ্ধকে কোলে টানিয়া গায়ে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রাণপাখী যাহার দেহ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় যে অস্থির হইয়াছে, সে সময় তাহাকে শেষ বিদায়ের জন্য শুশ্রূষা করা একান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে পরমাত্মার আশীর্ব্বাদ ভাজন হওয়া যায়। শ্যামানন্দের পবিত্র স্পর্শে বৃদ্ধের মৃত্যু সময়ে যেন কথঞ্চিৎ শান্তি আসিয়াছিল। বহুদিন হইল—এমন প্রাণের টানে কেহ তাহাকে সেবা করে নাই—অতীব আগ্রহের সহিত তাহার ওষ্ঠাগত প্রাণে এমন করিয়া কেহ শান্তি শুশ্রূষার পবিত্র বারি ঢালিয়া দেয় নাই।

বৃদ্ধের বিকার ভাব কতকটা কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছে—এই তাহার শেষ। তাই পত্নীকে ডাকিয়া বলিল—অম্বিকা, অভাগিনী, নিজদোষে আমরা শেষ দশায় এত কষ্ট পাইলাম, নানাস্থানী হয়ে শেষে ছত্রে আসিয়া দেহের অবসান

করিতে হইল। যাহা হউক বহু ভাগ্যবলে কিন্তু এই শান্তিময় "সাধন-মন্দিরে" এই মহাপুরুষের শীতল ছায়ায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম—তাই আমাদের সদ্গতি হইবে—এইরূপ আশা করা যায়। তোমার শেষ ভরসা পাঁচুকে ভগবান সেদিন কাড়িয়া লইয়াছেন; ঝড়জলে গৃহ ভগ্ন হওয়ায় সে নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে। এক্ষণে আমিও তাহার সাথী হইতে চলিলাম, তুমি পশ্চাতে আইস কিন্তু যে কয়দিন থাকিবে—এই মহৎ আশ্রম ছাড়িও না, ভগবান দয়া করিয়া আমাদের ন্যায় ভ্রাতৃঘাতী মহাপাপীকে এই পবিত্র আশ্রমে আনিয়া ফেলিয়াছেন—ইহাই আমাদের শেষ জীবনের আরাম ভবন! এমন সেবা, এমন শুশ্রূষা, এমন মহাপ্রাণতা, আর কোথাও পাইবে না। যাহা হইবার তাহা ত হইল, কৃত কর্ম্মের ফল ত যথেষ্ট ভোগ করিলাম, এখন এ প্রাণ গেলেই বাঁচি কিন্তু মরিবার সময় প্রাণের ভাই ধার্ম্মিকপ্রবর অমরের সঙ্গে একবার দেখা হইলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মরিতে পারিলেই যেন প্রাণের ভার অনেকটা লাঘব হইত কিন্তু সে কোথায়—আর আমি কোথায়? এ অবস্থায় সে সাধু দর্শন এ হতভাগ্যের ভাগ্যে ঘটিবে কেন? নিখিলের দর্শনও ভাগ্যে আর ঘটিল না! তাহার দর্শন তত চাই না, কারণ সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, যেখানে থাকুক ভগবান তাহাদের সুখী করুন! কিন্তু প্রাণের ভাই অমরকে যে আমরা ইচ্ছা করিয়া বহু কষ্ট দিয়াছি, নিজেদের সুখের জন্য তাহাদের অশেষ রকমে নির্য্যাতীত করিয়াছি; ধার্ম্মিক ভাই আমাদের এত অত্যাচারেও একটী দিনের জন্য মুখ তুলিয়া

কথা কয় নাই! ভাই অমর রে! দেখে যা; আজ তোর সেই পাষণ্ড মহাপাপী দাদার কি দুর্গতি হইয়াছে! মা সাবিত্রী; তুমি জমীদারের দুহিতা, জমীদারের পুত্রবধূ! কিন্তু পাষণ্ড আমি, তোমাকে নিতান্ত হতভাগিনী দরিদ্রা রমণীর মত কুটীরে রাখিয়া সাপের মুখে তুলিয়া দিয়াছি! তুমি সে অসহ্য কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়া পিতার মত এ পাষণ্ডের প্রতি একদিনের জন্য বিরূপ হও নাই, অম্বিকার অশেষ গালাগালি খাইয়াও তুমি প্রাণের পাঁচুকে কোলে লইতে কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ! দেবী! আজ তুমি স্বর্গে, আর তোমার পাঁচুও বুঝি—খুঁড়ীমার কোল ছাড়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া—তোমার কোলে চলিয়া গিয়াছে! মা—মা! তাহাকে আদর কর;—সে জমীদারের ছেলে হয়ে শেষ দশায় বড় কষ্টে জীবলীলা শেষ করেছে!

বৃদ্ধের আজীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই মৃত্যু সময়ে মনে পড়িয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। সে সময়কার বদন ভঙ্গিমা দেখিলে বোধ হয়—বৃদ্ধ অনুতাপের আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে, চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুজল পতিত হইয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, আর বুঝি কথা কহিতে পারে না; নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি টানিয়া টানিয়া বলিল—প্রাণের সোদর, অমর, ক্ষমা কর ভাই—যাই!

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধাও আর থাকিতে পারিল না, কৃত-পাপের দংশনে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—প্রাণের দেবর, অমর! তোমায় যন্ত্রণা দিয়াই আমাদের আজ

এই দুর্দ্দশা, এখন বুঝিলাম—ভগবান আছেন, চুপে চুপে পাপ করিয়া মানুষের চক্ষু এড়াইতে পারা যায় কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানের চক্ষু কেহই এড়াইতে পারে না। স্বামী আমার নিষ্পাপ, তিনি যথার্থই ভ্রাতাঅন্ত জীবন, কেবল আমার মত পাপিনীর তাড়নায়, এই পাপ সঙ্গ দোষে পড়িয়া তিনি এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন! ভাই! কত ছলনা করিয়া তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া ছিলাম; বড়বউ মাতৃসমা বলিয়া জীবনে আমার প্রতি কখন তুমি কোপ-দৃষ্টি কর নাই, কিন্তু মহা পাপিনী আমি, সেই দেব-সদৃশ তোমাকে প্রহারের অপবাদ দিয়া লোকের নিকট কত হেয় করিয়াছি, এ সকল পাপের ফল হাতে হাতে পাইলাম, পাঁচু আমার সেই অভিমানে বুঝি আমাদিগকে ছাড়িয়া, তাহার প্রাণের কাকীর কাছে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে! মেজোবউ! পাঁচু চিরদিনই তোর, আমার নয়, তাকে কোলে করিস্, সান্ত্বনা দিস্! আর কি বলিব—ভাই, তুই স্বর্গের দেবী, স্বর্গ আলো কর, আমি নরকের কীট, নরক গুলজার করিতে চলিয়াছি। কর্ত্তা বোধ হয় ছাড়িয়া চলিলেন—আমি হয়ত শেষ বেড়া-আগুণে পুড়িয়া—তাহার অনুসরণ করিব! বৃদ্ধা স্বামীর পদতলে বসিয়া নীরব-রোদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল, আর এক একবার পায়ে ধরিয়া প্রাণভেদী স্বরে বলিতে লাগিল—কর্ত্তা চলিলে, আমি যে তোমার পদ সেবার যোগ্য নহি, তথাপি আমায় বক্ষে করিয়া রাখিয়াছিলে, কয়লার মত এ ময়লা রূপকে তুমি কষিত কাঞ্চন বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে, তোমার মত পত্নী অনুরাগী এমন পুরুষ জগতে

দুর্লভ, দেবতা তুমি দাসীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর! বলিয়া স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুজলে বিদায়-অভিষেক করিতে লাগিল।

শ্যামানন্দ এতক্ষণ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মৃত্যু কালীন তাহার সমস্ত খেদোক্তি শুনিতে ছিলেন, দেহ কণ্টকিত হইতেছিল, কি জানি সন্ন্যাসী কি একটা অন্তর্ভেদী দুঃখে সময়ে সময়ে চমকিত হইয়া একি! একি! তিনিও যে অশ্রুসিক্ত হইলেন। সাধন ভজনাসক্ত, মায়ার অতীত শাক্ত ভক্ত সন্ন্যাসীর আবার এত মায়ার টান কেন? তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে একবার এই রোগ-ক্লিষ্ট বৃদ্ধের প্রতি আর একবার বৃদ্ধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে ছিলেন। তাঁহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বুঝি কোমল প্রাণ, পরদুঃখ কাতর শ্যামানন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

আবার বিকারের ঝোঁক আসিয়া বৃদ্ধকে চঞ্চল করিয়া ফেলিল, শয্যায় পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণায় সে ছট ফট করিতে করিতে বলিল—অমর! অমর! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, যাই যাই—বৃদ্ধের অন্ধ চক্ষুদ্বয় হইতে অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল—মৃত্যুর অশেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কেবল—অমর! ভাই, আমায় ক্ষমা কর; যাই যাই ভিন্ন অন্য বুলি আর মুখে বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী শ্যামানন্দ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না—প্রাণ ফাটা দুঃখে, মর্ম্মান্তিক অন্তর্জ্বালায় উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বৃদ্ধের গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন—দাদা, দাদা! কোথা যাও, এই যে তোমার অধম অমর তোমার পদতলে বসিয়া রহিয়াছে—

দাদা! যদি এত দিনের পর দেখা দিলে—ত ফাঁকি দিয়ে পালাইও না, ভাই! ছোট হইয়া কে কবে বড়কে ক্ষমা করিয়াছে, তুমি ক্ষমার নও—পূজার সামগ্রী,—যতই কিছু করিয়া থাক, তথাপি মাথার মণি, প্রাণেব দেবতা, দাদা, দাদা। তোমার প্রাণের অমব এই যে তোমার গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে—উত্তব দাও দাদা! এমন হরিষে বিষাদ করিয়া, অন্তরে শোকশেল বিঁধিয়া ফাঁকী দিয়া যেও না, ভাই কথা কও! এই যে তুমি অমর অমর করিয়া স্নেহেব ডাকে আমার বহুদিনেব পিপাসিত হৃদয়ে শান্তি দিচ্ছিলে—আবাব কেন চুপ করিলে ভাই!

এইবার অমর বৃদ্ধার পানে চাহিয়া বলিলেন—বৌদি! এ কি অবস্থা। রাজরাণীব এমন ভিখারিণীর বেশ কেন, চন্দন-চর্চ্চিত রাজার কার্ত্তিকের মত সুন্দর দেহ এমন কালিমাময় কেন?

বৃদ্ধা যখন বুঝিল—"সাধন-মন্দিবেব" অধ্যক্ষই তাহার স্বামীর পরিত্যক্ত নির্জ্জীত দেবর অমর। তখন তিনি বিষম খেদে, অন্তহীন বিষাদভরে বলিলেন—রাজারাণী একসময়ে ছিলাম বটে, কিন্তু প্রজাপীড়ক হইয়া কোন্ রাজারাণী চিরদিন সুখভোগ করিয়াছে! পুত্র সম তোমাদের ফাঁকি দিয়া, মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইয়াই আমাদের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। বিধাতা আছেন—অন্যায় পীড়নের ভোগ যাইবে কোথায় ভাই! এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী আমি, দাদা তোমার নির্দ্দোষ, তবে সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার এই কষ্ট; ভাই! আজ এ কালামুখ তোমায় দেখাইতে লজ্জা হয়, তুমি তবে সাধক অতুল শক্তিশালী, এক্ষণে আমাকে কোন

দৈবশক্তিবলে তোমার দাদার সঙ্গিনী করিয়া দাও, আমরা জীবনে কখন ছাড়াছাড়ি হই নাই—এ শেষ জীবনেও একসঙ্গে চলিয়া যাই!

বড়বধূ অম্বিকা কাঁদিতে কাঁদিতে যেন স্বামী শোকে চৈতন্য-হীনের মত হইলেন। তাঁহাদের পাপের পরিণাম দেখিয়া অমর কাঁদিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রাণপাখী তখনও দেহ পিঞ্জর ছাড়ে নাই— তখনও যাই যাই করিয়া প্রাণটা বুকের মাঝে ধুক ধুক করিতেছিল। মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহার পিপাসা আর মেটে না, কেবল জল জল করিতেছেন। অমর অতি ত্রস্তভাবে, অতি সন্তর্পণে দাদার সেই শুষ্ক বদনে একটু একটু করিয়া দেবীর চরণামৃত ঢালিয়া দিতেছেন। ভবব্যাধি বিনাশের সেই মহৌষধ পান করিয়া নরেন্দ্রনাথ যেন ক্ষণেকের জন্য তৃপ্তি বোধ করিতেছেন—প্রাণ যেন শীতল হইতেছে।

নরেন্দ্রের অবস্থা শেষ হইয়া আসিতেছে। নিশ্বাস জোরে পড়িতেছে; শ্লেষ্মায় কণ্ঠস্বর রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। তথাপি বহুদিনের পর, বহু দুঃখের পর এ মিলনে মৃত্যুর সময়েও তিনি অশেষ সুখবোধ করিতেছেন। চক্ষু নাই, দেখিবার উপায় বহুদিন হইতে লোপ হইয়াছে! তথাপি সেই শীর্ণ দুর্ব্বল হস্তে ধীরে ধীরে অম্বিকার হস্ত ধরিয়া অমরের হস্তে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন—ভাই! আমি ত চলিলাম, এখন অভাগিনীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তাকে এই শেষের কটাদিন প্রতিপালন করো! অমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—দাদা! তুমি না বলিলেই কি আমি আমার কুলের কুলবধূ—মাতৃসমা বড়বউকে ফেলিয়া

অমর আটচালা হইতে নরেনকে দেবালয়-চত্বরে লইয়া গিয়া দেবীর চরণামৃত মুখে দিতে লাগিলেন। অম্বিকা পদতলে বসিয়া কাঁদিতে

দিব! মা ত পুত্রকে তাড়নাই করে থাকেন—তা বলে পুত্র কবে মাতৃঘাতী হয়েছে! মা যাই আছেন—যতদিন বাঁচিবেন, তাই থাকিবেন। যখন দেখা হইয়াছে, তখন এ সকল চিন্তা আর করো না, এখন চিন্তাময়ীর চরণ চিন্তা কর!

শেষের মিলন-সুখে নরেন্দ্র প্রাণে খুব শান্তি পাইলেন—ধীরে ধীরে মাতৃনাম জপ করিতে করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাধকোত্তম অমরেন্দ্রনাথের কোলে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। শক্তি-সাধক শ্যামানন্দ মায়া-মোহের অতীত হইলেও জেষ্ঠের এ শোক সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আর অম্বিকার যে কি হইল, পাঠক তাহা অনুভব করুন। তিনি স্বামী বিরহ কখন জানেন না, আজ বৃদ্ধ বয়সে বিরহ-বিধুরা হইয়া মর্ম্মভেদী শোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ বক্ষঃস্থল হইতে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতে লাগিল।

(৪)

মানুষ মরিবার জন্যই জগতে আসে—এ জগতে মৃত্যুই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা। অমরেন্দ্র বড়ই মনোকষ্টে দাদার আগুকৃত্য সমাপন করিলেন। শ্রাদ্ধে যে খরচের অল্পতা হইল—তাহা নহে। যখন রাজা তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছেন—তখন এ সকল কার্য্যে যে সমারোহের ত্রুটী হয় নাই—তাহা বলাই বাহুল্য। আর অমরেন্দ্র যখন সকল কার্য্যে দরিদ্র সেবাই মোক্ষ কর্ম্ম বলিয়া

জ্ঞান করেন—তখন দাদার পারত্রিক কর্ম্মে তাহার কিছু মাত্র ক্রটী হইল না। তবে এ সময় পাঁচু যদি থাকিত তবে তাঁহার কত আমোদ হইত। আর অন্তিমে পুত্র-পিণ্ডের প্রয়োজন আছে বলিয়াই লোকে বিবাহ করিয়া এত কষ্ট ভোগ করে, হায়! দাদার ভাগ্য কি মন্দ, এমন সুপুত্র লাভ করিয়াও শেষের দিনে তাঁহার সে সৌভাগ্য উদয় হইল না;—পুত্রটী অকালে লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গেল?

দাদা ও বউদিদির হস্তে যথেষ্ট টাকা ছিল কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের অবস্থা কিরূপে এরূপ হীন হইল; দারিদ্রের প্রকোপে পড়িয়া কেমন করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল, অমর বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—বসন্তপুর ছাড়িয়া আমরা কিছুদিন গঙ্গার অপর পার চাণকে আসিয়া যখন বাস করিতে লাগিলাম। অর্থ আমাদের হস্তে যথেষ্ট ছিল—কিছুরই অভাব ছিল না। চাণকে আসিয়া একখানি অট্টালিকা ভাড়া করিয়া রহিলাম। ক্ষীরোদা ছাড়া আরও দুইজন দাস দাসী নিযুক্ত হইল। ক্রমে পাড়ার লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল—অনেকেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া তোমার দাদার নিকট আসিতে লাগিল। তেজারতী কারবার যাহা আমাদের ছিল—সেখানে গিয়া পূর্ণ মাত্রায় চালাইতে লাগিলাম—আয়ও যথেষ্ট হইতে লাগিল।

তারপর ভগবানের কোপ-দৃষ্টি দেশের উপর পতিত হইল। দেশ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পড়িয়া গেল, খাতক সকল বিপন্ন হইয়া পড়িল, কেহ আর টাকা দিতে পারিল না। যে চিৎহস্ত করিল,

উপুড় করিবার সময় আর তাহাকে পাওয়া গেল না। তথাকার লোক অধিকাংশই কৃষিজীবী, চাষ-আবাদ হইল না, দেনা পরিশোধ করিবে কিসে? একটী বেতনভোগী সরকার ছিল—তিনি দুই এক নম্বর নালিশ করিলেন—টাকার কিস্তিবন্দী হইল কিন্তু আদায় হইল না। সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিয়া পেট চালাইতে, লোকের মাহিনা দিতে হইল—তারপর তোমার দাদার বাবুয়ানা কেমন ছিল—তাহা ত জানই। তাহাতেও অচল হয় নাই কিন্তু দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না, আর আমরা অর্থ লইয়া বসিয়া আছি, আমোদ—আহ্লাদে কাল কাটাইতেছি—লোকের চক্ষে ইহা সহ্য হইল না।

আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে—ইহা সকলেই জানে। একদিন গভীর রাত্রে বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। কোথাকার লোক—তাহা কে জানে, ছদ্মবেশে আসিয়া আমাদের বাঁধিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। প্রায় চল্লিশ জন ডাকাত হৈ হৈ রৈ রৈ করিতেছে, দেখিয়া গ্রামবাসী কেহ ভয়ে আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না; অবাধে তাহারা আমাদের সর্ব্বসান্ত করিয়া চলিয়া গেল—পরদিন কি খাইব এমন সংস্থান পর্যন্ত রহিল না। থালা ঘটী পর্য্যন্ত পরের বাড়ী হইতে চাহিয়া চালাইতে হইল।

পুলীশ তদন্ত করিল কিন্তু দস্যুদল কোন দেশীয় তাহার নিরাকরণ হইল না—বা সে ডাকাতীর কোন প্রকার আস্কারাও হইল না। বাড়ীওয়ালা একমাস আমাদের রাখিয়াছিল—তারপর ভাড়া দিতে না পারায় উঠাইয়া দিল। আমরা নদীর ধারে একটী সামান্য

কুটীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম—ভগবানের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া চকিতের ন্যায় অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাহাতে তত কষ্ট হয় নাই, কিন্তু তারপরে প্লাবন উপস্থিত হইল, একদিন রাত্রে নদীর জল বাড়িয়া আমাদের ঘর দুয়ার ভাসাইয়া লইয়া গেল। হায়! সে ভীষণ প্লাবনে পাঁচু আমার কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার কিনারা হইল না। হতভাগ্য আমরা একটী ঘরের চাল ধরিয়া বাঁচিলাম—বাছা আমার বাণের তোড়ে কোথায় ভাসিয়া গেল—আর তাহাকে পাইলাম না। দেবর! সেইদিন হইতে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্টে তোমার দাদার চক্ষু নষ্ট হইল। আমি পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিলাম। হায়! তখন বুঝি নাই যে পাপ করিলে তাহার ফল হাতে হাতে ভুগিতে হয়। ভাই! তোমাদের ফাঁকী দিয়া—ধার্ম্মিক তোমরা, তোমাদের অনিষ্ট করিতে গিয়া—রাজা হইয়াও আজ পথের ভিখারী হইতে হইল। ধন গেল, মান গেল, শেষে প্রাণের পাঁচুকে পর্য্যন্ত হারাইয়া এই দুর্ব্বহ জীবন এখনও বহন করিতে হইতেছে। তোমাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ফলে যে আমাদের এই দুরবস্থা—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এখন বুঝিয়াছি, পাপ করিয়া বড়লোক হইতে যাওয়া—নিজের বিপদকে ডাকিয়া আনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বজন্মের সামান্য সুকৃতিবলে আজ যে আবার তোমাকে পাইয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্য, আর ইহার জন্য ভগবানের পদে শত শত নমস্কার!

দুঃখে ক্ষোভে অম্বিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, নয়ন হইতে

দরদরিত ধারে অনুতাপ-অশ্রু পতিত হইয়া বুক ভাসিতে লাগিল। তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। অমর বলিলেন—বউদি! থাক আর কাজ নাই। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আর বৃথা শরীরকে কষ্ট দিও না। বিধাতার মনে যাহা ছিল—তাহা হইয়াছে, এখন প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাইয়া দেন!

অম্বিকা।—তোমাকে পাইয়া তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে; শেষ জীবন যদি সুখে না কাটিবে—ত, এতদিন পরে তোমাকে পাইব কেন? ধর্ম্মের সঙ্গে থাকিয়া কে কবে দুঃখ পাইয়াছে? তুমি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম; তোমার আশ্রয়ে দুঃখ হইতে পারে না। কিন্তু স্বামী পুত্র বিহীন হইয়া এ সুখে লাভ কি ভাই! বৃদ্ধার অন্তস্থল হইতে একটী দারুণ দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল।

অমরেন্দ্রও আপনার সমস্ত কাহিনী বউদিদির নিকট একে একে বলিতে লাগিলেন। সাবিত্রী মারা যাইবার পর—অরুণাচল-বাসী যোগানন্দ যোগীর কৃপা; তারপর গৃহ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ শেষ করত এখানে বসিয়াছি। চিরকাল দরিদ্র সেবা—আমার ব্রত তাহা তুমি জান; গুরুদেব আমার অন্তর্যামী; আমার মনের ভাব বুঝিয়া এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে আদেশ দিয়াছেন! প্রথম প্রথম এ কার্য্যে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তারপর ঐ বিল্ববৃক্ষস্থিত ব্রহ্মদৈত্যের কৃপায় রাজার কৃপাভাগী হওয়ায় এখন আর কোন কিছুর অনাটন নাই—খুব সুখে চলিয়া যাইতেছে।

আমার "সাধন-মন্দিরের" খুব সুনাম হইয়াছে, তাই দরিদ্র নারায়ণগণ আমাকে কৃতার্থ করিতে এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলে আমাকে অমরেন্দ্র বলিলে—কেহ চিনিতে পারিবে না, গুরুদত্ত নাম—শ্যামানন্দ নামেই আমি এখানে পরিচিত! বৌদিদি! মৃত্যু কাহারও হাতধরা নয়! সময় হইলেই সকলকে যাইতে হইবে, দাদার সময় হইয়াছিল—তিনি চলিয়া গেলেন—তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু ছোঁড়াটা যে অকালে আমাদের বংশ লোপ করিয়া চলিয়া গেল—এই দুঃখই বড় দুঃখ! আচ্ছা বউদি, নিখিলের কোন সংবাদ পাইয়াছিলে কি ?

অম্বিকা।—না ভাই আমরা কেমন করিয়া সংবাদ পাইব। আমরা ত মদগর্ব্বে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, তারপর সে দেশে গিয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিব! আর দেশে গিয়াই বা কি করিবে! আমরা যে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার আস্তানা টুকুও ফাঁকি দিয়া বিক্রয় করিয়াছি ; সে গিয়া থাকিবে কোথায়! নূতন করিয়া সংসার পাতিতে হইলে—ঘর বাড়ী করিতে হইলে নিখিল কি আর দেশে করিবে ? সে কল্‌কাতাতেই চলিয়া যাইবে। যা হবার তাত হইয়া গিয়াছে, ভগবান শেষ দশায় তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, এখন সে ছোঁড়া-ছুঁড়িটার সন্ধান পেলে যেন মনটা আরও একটু নাচিয়া উঠে!

অমর।—সে সমস্ত মায়ের ইচ্ছা বউদি! ঘটনা চক্রে তিনি তাহাকেও আনিয়া দিতে পারেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় জগতে কি না হয় ?

অম্বিকা।—মা যেন তাই করেন!

সন্ধ্যার পর শ্যামানন্দ "সাধন-মন্দিরে" প্রবেশ করিলেন। এ কয়দিন অশৌচের জন্য মায়ের আরাধনা হয় নাই। আজ প্রাণ ভরিয়া জবা বিল্বদলে তাঁহার পূজা করিবেন—বলিয়া তিনি আর কাল বিলম্ব করিলেন না।

বড়বউ অম্বিকা সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না—যখন সময় ভাল ছিল বিলাসিতা লইয়াই দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু আজ প্রায় ছয়মাস হইতে—দুঃখের দাবদাহে পড়িয়া সে মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে। ভগবান এখন তাঁহাকে সব সহ্য করাইয়া দিয়াছেন—সকল কাজেই অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ধাক্কা পাইলেই মানুষ এইরূপ করিয়া কাজের লোক হয়।

"সাধন-মন্দিরে" অতিথি সেবার জন্য আর শ্যামানন্দকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। হুকুম করিলেই রাজবাটী হইতে অর্থাগম হয়—আর জিনিস-পত্রের অভাব-অভিযোগ অম্বিকাই দেখিয়া থাকেন। কোন্ দ্রব্য নাই—কি কি আনাতে হইবে, অম্বিকা অতি যত্নের সহিত সমস্ত দেখিয়া ভৃত্যের দ্বারা ভাণ্ডার-গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন। পূর্ব্বে ছিল না—এখন অম্বিকার এ সকল কার্য্যে মতিগতি বিশেষভাবে সংবদ্ধ হইয়াছে। অতিথিগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার কর্তৃত্বে প্রশংসা করিতেছেন দেখিয়া শ্যামানন্দ এখন আপন সাধন-ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।

মন্দিরের অনতিদূরে নদীতটে নন্দন পাহাড়ে তাঁহার গুরুর আসন, প্রতি আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় কালরূপে দেবী দর্শনে

আসিয়া যোগানন্দ এই আসনে প্রায় একমাসকাল অবস্থান করেন—তাহার পর অরুণাচলে চলিয়া যান। শ্যামানন্দ এই সময় ঠিক পিতার পশ্চাতে পুত্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান। পিতা অধ্যাত্মধনে—ধনবান—ঐশ্বর্য্যশালী, রাজ্যেশ্বর বলিলেই হয়—আবদারে ছেলের মত তাই শ্যামানন্দ পাছুপাছু থাকিয়া যাহা কিছু আদায় করিবার করেন। শ্যামানন্দের ভক্তিভাব, তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখিয়া গুরুদেব প্রতি বৎসরই তাঁহাকে কিছু না কিছু ঐশ্বর্য্য দান করিয়া যান, এইজন্য শ্যামানন্দ এই সামান্য দিনের মধ্যে হৃদয় মধ্যে এত ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়া—এত বড়লোক হইয়াছেন, এ ধন অর্থ নহে—পরমার্থ! গুরুর কৃপা হইলে শিষ্যের সৌভাগ্য বাড়িতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না!

অম্বুবাচী অতীত হইয়া গিয়াছে। গুরুদেবও চলিয়া গিয়াছেন; শ্যামানন্দ কিন্তু এখনও নন্দন পাহাড় ছাড়িতে পারেন নাই, এখনও সাক্ষাৎ শঙ্কর সদৃশ শ্রীগুরুর পদরজে সেই আসন পবিত্র; তাই আরও কিছুদিন না যাইলে তিনি "সাধন-মন্দিরে" আসিতে পারিবেন না। আর এখন যাইবারও ত তত তাড়াতাড়ি নাই, তাঁহার স্থানে অম্বিকাদেবী যে নিযুক্তা হইয়া অতি সুন্দররূপে কাজ চালাইতেছেন, অতিথি সেবার কোনও গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই তিনি যাই যাই করিয়াও অপেক্ষা করিতেছেন। এই সাধন-পীঠে আরও কিছুদিন থাকিবেন—এই ইচ্ছা! অন্যান্য সময় দুই একদিন অন্তর তিনি এখানে গমনাগমন করিতেন—বৌদির আগমনে এখন প্রত্যহই আসেন। তারপর সম্প্রতি গুরুদেব

আসিয়াছিলেন ;—কাজেই একেবারে অনন্যশরণ হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও দুই একদিন থাকিয়া "সাধন-মন্দিরে" যাইবেন। তাই প্রাণ ভরিয়া আসনে বসিয়া জপে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন!

শ্যামানন্দের প্রাণে এখন আর অন্য বাসনা, অন্য কামনা নাই—তাহা সদাই মাতৃময়, মাকে ডাকা। আপনার হৃদয়মন্দিরে মাকে স্থাপন করিয়া মনে মনে পূজা করাই এখন তাঁহার কাজ, বাহ্যিক পূজা এখন আর তিনি করিতে পারেন না, যতদিন নন্দন পাহাড়ে থাকেন, ততদিন তিনি এইরূপই করিয়া থাকেন। তবে "সাধন-মন্দিরে" আসিলে বাহ্যিক পূজার আয়োজন করিতে হয়। এখানে সেখানে পূজার প্রভেদ অনেক হইলেও দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। শ্যামানন্দ এখন আর পঞ্চ-তন্মাত্রে বশীভূত নহেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়ী, অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী মাকে যখন চিনিতে পারিয়াছেন, তখন ত তিনি আত্মজয়ী! বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সংগ্রামে তিনি পরাভূত হইবেন কেন? যতদিন ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ-তন্মাত্রের, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের আকাঙ্ক্ষা করিবে, ততদিন জীব অতৃপ্ত—ততদিন বাসনা-বাতিক তাহার নষ্ট হইবে না—ততদিন সে সাধক কোন কাজের লায়েক হইবে না।

শ্যামানন্দের এ সকল বহুদিন আয়ত্ত হইয়াছে, তাই যোগানন্দ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া প্রতি বৎসর মানবের যথার্থ ধনৈশ্বর্য্য কিছু কিছু প্রদান করিয়া বড়লোক করিয়া যান। আধ্যাত্মিক জগতে সাধারণ সাধক অপেক্ষা শ্যামানন্দ এইজন্য খুব বড়লোক হইয়াছেন! তার অন্তর শুদ্ধ হইয়াছে, মা আছেন বলিয়া

তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, তাই সকল বিষয়েই তিনি মায়ের অস্তিত্ব, মায়ের কর্তৃত্ব অবলোকন করেন। মায়ের একান্ত কৃপা না হইলে জীবের এ অবস্থা হয় না।

(৫)

আজ সন্ধ্যাকালে শ্যামানন্দের "সাধন-মন্দিরে" ফিরিয়া যাইবার দিন। মাসাবধি হইল তিনি তাঁহার সাধের "সাধন-মন্দির" ছাড়িয়া আসিয়াছেন—আর না যাইলে নয়! তবে সেখানে এমন মনে প্রাণে মাকে ডাকা হয় না—সেস্থান এমন নির্জ্জন নয়, সে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইলে মন কাজেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যখন প্রাণ একান্ত কর্ম্মক্লান্ত হইয়া একটু শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে, সাধক সেই সময়েই এই শান্তিময় স্থানে আসিয়া প্রাণের অবসাদ ভাব দূর করিয়া থাকেন। কিয়দ্দিন মায়ের কাছে কাছে থাকিয়া, জীবনে নূতন বল সঞ্চয় করিয়া আবার নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গুরুদেবের এ সাধন-পীঠে মা যেন সর্ব্বত্র বিদ্যমান— এমন মনোরম স্থান কি আর আছে?

নন্দন পাহাড়ের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা চা-বাগানে দেশ বিদেশ হইতে অনেক নরনারী কাজের জন্য চালান হইয়া আসে। পাহাড় ও চা-বাগানের মধ্যে একটা বৃহৎ অরণ্য ব্যবধান মাত্র! সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রাতঃকাল হইতেই প্রকৃতির কেমন জড়ভাব, কাজেই মানবেও তাহা সংক্রামিত হইয়াছে। শ্যামানন্দ প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ আনচান্ করিয়া সাধক ধ্যানস্থ হইলে বাহিরের জড়তা আর তাঁহাকে জড়ীভূত করিতে পারিল না।

বেলা কত হইয়াছে ঠিক বুঝিবার উপায় নাই—অনুমান মধ্যাহ্ন-কাল, ঠিক সেই সময়ে একটী রোগগ্রস্ত বালক বনের ঋজুপথ অতিবাহিত করিয়া অতি গোপনে সেই পর্ব্বত পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সে ভয়ে কাঁপিতেছে, দেখিলে বোধ হয় সে কুলীদের সঙ্গে চালান হইয়াছিল, কিন্তু রোগগ্রস্ত বলিয়া কোন মহাত্মা তাঁহাকে এই বনের পথ দেখাইয়া সরাইয়া দিয়াছেন। বালক তাই প্রাণের ভয়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে, ভয় তিরোহিত হইলেও কম্পন এখন থামে নাই! শরীর অসুস্থ—শোথ রোগগ্রস্ত, হাত, পা, মুখ ফুলিয়াছে, ভাল পথ্য না পাইয়া সে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, তাই পীড়াও তাহাকে ছাড়িতেছে না, রক্তহীন শুষ্ক অস্থিপঞ্জর চর্ব্বণ করিতেছে। বালকের কোমল অস্থি-মাংস চর্ব্বণে রোগ-রাক্ষসের লালসা খুব বেশী! এই দুর্ব্বল শরীরে কি জানি কেন বালক সেই পাহাড়ে উঠিবার প্রয়াস পাইল। উঠিবার শক্তি নাই—পদে পদে পদস্খলন হইতেছে—তথাপি উঠিপড়ি করিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল—এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন!

সেই জটাজুটধারী পবিত্র সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া বালকের মনে সাহসের সঞ্চার হইল, কম্পান্বিত কলেবরে ভয়চকিত নয়নে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে সন্ন্যাসীর সম্মুখে কিছু দূরে অতি দীনহীনের মত উপবেশন করিল। পাছে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হয়, সেইজন্য অতি কষ্ট হইলেও কোন প্রকার বিষাদ ভাব ব্যক্ত করিল না।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল—মা মা রবে ধূলায় পড়িয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ প্রাণের ডাকে সেই নির্জ্জন গিরিকন্দর ভীষণ শব্দায়মান করিলেন। সেই নাদগম্ভীর সুরের মাতৃ আবাহন শুনিলে, বাস্তবিক অতি বড় দুর্ব্বল ক্ষীণ-প্রাণ লোকের প্রাণেও শক্তির সঞ্চার হয়, বালক সেই ভুবনপাবন স্বর আকর্ণন করিয়া যেন সকল চিন্তা, সকল ভাবনা ভুলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর সেই প্রশান্ত গম্ভীর বদনখানি দেখিয়া সে বার বার তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—যেন কত দিনের লুপ্ত স্মৃতি তাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া গেল। বালক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, সে ত প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসীর জাগ্রত সাধন-পীঠে কখন আসে নাই, আর কখনও এমন সজাগ মানবমূর্ত্তি, সাধন-প্রদীপ্ত এমন তেজস্বী শরীরধারী মূর্ত্তি কখন অবলোকন করে নাই। এতদিন সংসারে যাহা দেখিয়াছে—তাহা ঝুঁঠা, তাহা কৃত্রিম মলামাটী মাখা, সাধকের ভাণে দস্যু তস্করের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সে দেখিয়াছে। এ অকৃত্রিম মাতৃভক্ত সাধক সংসারে কখনও দেখে নাই—তাই বালক মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। এ মুখখানি যেন আরও কত জানা-জানা ভাবে তাহাকে সবিস্ময়ে অভিভূত করিতে লাগিল। আবার মনে করিল—তা কি হয়—এ যে অসম্ভব!

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন—তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে বালক! এখানে যে মানুষ আসিতে পারে না—এ বন যে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ!

বালক।—ভগবান আনিলে—তিনি রক্ষা করিলে—হিংস্রজন্তু তার কি করিতে পারে প্রভু?

বালকের মুখে ভগবদ-বিশ্বাসভরা কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তুমি বালক, কিসের জন্য এখানে আসিয়াছ, আহারাদি হইয়াছে কি?

বালক।—প্রভু! আমি বহুদিন শোথ রোগে ভুগিতেছিলাম, পথে পথে ঘুরিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম—কিন্তু হঠাৎ একদিন এক আড়কাটীর হস্তে পড়িয়া আমি এই কাছাড়ের চা-বাগানে চালান হইয়া আসি। আমাকে এই রোগগ্রস্ত দেখিয়া এবং কার্য্যে অক্ষম ভাবিয়া এক মহৎ ব্যক্তি দয়া করিয়া এই বনের নিভৃত পথে পলাইবার জন্য দেখাইয়া দিলেন, আমি তাহার নির্দ্দেশ মত প্রাণভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়াছি!

সন্ন্যাসী।—ভালই করিয়াছ, এখানে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই, মায়ের এ সাধন-পীঠে যমের অধিকার নাই—তা আড়কাটী কি?

সন্ন্যাসীর কথার স্বর কিছু গম্ভীর হইলেও বালকের মনে যেন তাহা চেনা চেনা বলিয়া বোধ হইল; সন্ন্যাসীর সেই মমতাময় আদর আপ্যায়নে সে গলিয়া গেল। "এখানে যমের অধিকার নাই" সন্ন্যাসীর এ তেজোগর্ব্ব আশ্বাস বাক্য শুনিয়া সে সকল ভয়—সকল বেদনা ভুলিয়া গেল, অশ্রুসিক্ত নয়নে, ম্লান বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—প্রভু! আপনার মত আমার একজন মেজ কাকা ছিলেন—তিনিও আমাকে শিশুকালে কোলে লইয়া আদর করে

বল্‌তেন—"যার নামে গণ্ডী দিয়েছি—আর কি যমের ভয় রেখেছি" প্রভু! আজ আপনার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার প্রতি মেজ কাকার সেই আত্মদানের কথা মনে পড়িতেছে, আপনা ভুলিয়া তাঁহার সেই প্রাণের ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া আমাকে যেন কোন্ সুখের রাজ্যে লইয়া যাইতেছে!

বালকের দেহ দেখিয়া, আকৃতির বিকৃতি দেখিয়া যদিও চিনিবার উপায় নাই—তথাপি তাহার গলার স্বর আর তাহার প্রাণের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া আবেগভরে বলিলেন—কেরে বৎস! তুই; তুই কি আমার প্রাণের পাঁচু, আমার বংশের দুলাল!

বালক আর থাকিতে পারিল না, তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছে দেখিয়া—কাকা! কাকা! মেজো কা, আমিই তোমার অধম পাঁচু, বলিয়া পদতলে লুটিয়া পড়িল।

পাঁচুরে, প্রাণের পাঁচু! তুই জীবিত, মা বিশ্বজননী, তোমার অদ্ভুত দয়া,—বাবা পাঁচু! আবার যে তোর সঙ্গে দেখা হবে, তার আশা ছিল না,—বাবা! তোর মেজো কাকী ত ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে; দাদা তোকে এতদিন আমার কাছে দিলে—আমার এত কষ্ট হতো না, এস বুক জুড়ান ধন, বুকে এস, বলিয়া সন্ন্যাসী আবেগভরে বালককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মস্তকাঘ্রাণ, মুখচুম্বন করিলেন।

পাঁচু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মেজো কাকা! আমিও তোমাকে হারা হয়ে জীবন্মৃত হয়েছিলাম; এক্ষণে ধড়ে প্রাণ পাইলাম কিন্তু আমার কাকীমাকে ত আর দেখিতে পাইব না, বাবা

মাকেই বা আর পাইব কোথায় ; এ অনন্ত বিশ্বমাঝে যে তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

শ্যামানন্দ।—বাবা! তোর পিতামাতা এইখানেই ছিলেন—ভগবান শেষ দশায় তাঁহাদিগকে "সাধন-মন্দিরে" আনিয়াছিলেন ; মনে করিয়াছিলাম—দুই ভাই বহুদিনের পর মিলনে সুখী হইব কিন্তু তাহা হইল না বাপ! তোর বাপ এ দারুণ দুঃখের ভীষণ শেল সহ্য করিতে না পারিয়া আজ দুইমাস হইল স্বর্গগমন করিয়াছেন। তোমার মা এখন আমারই কাছে আছেন—তোমার শোকে তিনি প্রত্যহই জীবন ত্যাগের জন্য উদ্যত হন—আজ বিধাতা তাঁর সে দুঃখ দূর করিলেন—চল্ বাপ, দুঃখিনী জননীর প্রাণ শীতল করবি চল। সন্ন্যাসী সেই রুগ্ন, কৃশ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে "সাধন-মন্দিরে" দৌড়িয়া আসিয়া ডাকিলেন—বড় বৌ! বউদি!

আজ কয়েকদিন হইল,—পুত্রসম দেবর "সাধন-মন্দির" ছাড়া হইয়া তপস্যায় গিয়াছেন। অম্বিকা তাঁহার স্থলাভিষিক্তা হইয়া প্রাণপণে অতিথি সেবায় নিযুক্তা হইয়াছেন—আহার নিদ্রা তাঁহার নাই, এ কার্য্যে অম্বিকা এখন মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন।

প্রাণের দেবরের আহ্বান শুনিয়া অম্বিকা ধস্তপদে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনে করিলেন—বুঝি কোন বিশেষ আবশ্যক আছে, নতুবা এমন ডাকের উপর ডাক পাড়িবেন কেন? আসিয়া দেখিলেন—দেবরের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব, অমিয় জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দ-বিভোর, আর তাঁহার কোলে একটী রুগ্ন বালক! দেখিয়া বলিলেন—

ভাই! তুমি এতও পার—ইহাকে আবার কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিলে ?

শ্যামানন্দ এইরূপ প্রকারে অনেক দুঃস্থ বিপন্ন ব্যক্তিকে কুড়াইয়া মন্দিরে স্থান দেন, সেবা করিয়া তাহাদের সুস্থ-আরোগ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাহাই মনে করিয়াছেন, কারণ পাঁচুর সে রূপ, সে শরীর কান্তি নাই; রোগে দেহ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার পোড়া ভাগ্যে পাঁচু যে আবার ফিরিয়া আসিবে, সেই ভীষণ প্লাবন হইতে প্রাণ পাইবে—ইহা কখন সম্ভব নয়, তাহার মত পাপিনীর ভাগ্যে এরূপ সুখোদয় হইতেও পারে না, এইজন্য অপর কেহ মনে করিয়া বলিলেন—ভাই! তুমি এতও পার!

শ্যামানন্দ।—বউ! যাহার জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছ, মা বিশ্বজননী আজ বিনায়াসে আমাদের সে ধন মিলাইয়া দিয়াছেন—এ যে আমাদের বংশের দুলাল—প্রাণের পাঁচু!

অম্বিকা আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিতা হইয়া মহা আবেগভরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুত্রের গলা ধরিয়া "পাঁচুরে আমার এতদিন কোথায় ছিলি বাবা" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কোলে লইয়া বুকের মাঝে আবরিয়া বলিলেন—ধর্ম্ম সত্য, মা সত্য, বাবা পাঁচুরে! কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হলো না, তিনি কেবল তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে প্রাণ বাহির করেছেন।

পিতার সহিত দেখা হইল না, তিনি তাহার শোকে কাঁদিয়া

কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া এ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন—শুনিয়া পাঁচুর আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। সে দারুণ মর্ম্মদুঃখে অভিভূত হইয়া কেবল কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিল। মা'ও কাঁদে—পুত্রও কাঁদে—এ কান্নার আর অন্ত নাই, এ যে সুখ-শোক মিশ্রিত কান্না। অক্লান্ত দুঃখের পর সুখের উচ্ছ্বাস, আনন্দের রোদন—এ রোদনে হৃদয় বেদনার লাঘব হয়—এ মিলনে অবসাদ ঘুচিয়া যায়—প্রাণ শান্তিময় হয়।

সেইদিন হইতে রাজবৈদ্য আসিয়া পাঁচুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। "সাধন-মন্দিরের" একটা কক্ষ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা তাহাকে রাজবাটী লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন কিন্তু পাঁচু বলিল—কাকার এ সাধন-মন্দির রাজবাটী অপেক্ষাও শত গুণে শ্রেষ্ঠ—শান্তিময়! আমি ইহারই শীতল কোলে, কাকার চরণতলে, জননীর স্নেহ-শ্যাম অঞ্চলে অতি শীঘ্র আরাম হইব। মহারাজ! রাজবাটীর সে কোলাহলময় কক্ষ আমার এই ওষ্ঠাগত প্রাণে আরাম-আরোগ্য প্রদান করিতে পারিবে না। জগতে ধর্ম্মই যখন সকলের রক্ষাকর্ত্তা, মা'ই যখন বিশ্বের মূলাধার, তখন এখান আর সেখান কি?

রোগীর ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইল। শ্যামানন্দের নিঃস্বার্থ সেবা ও জননীর প্রাণ-দেওয়া যত্নে পাঁচু অতি সামান্য দিনের মধ্যে শোথ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল, কঠিন রোগের পর শরীর কান্তি অতি সত্বর খুব সুন্দর—সুশ্রী হইয়া উঠে ইহা স্বাভাবিক! পাঁচুর রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইল। তাহার

উপর গৈরিক রঞ্জিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া পাঁচু যেন নবীন ব্রহ্মচারীরূপে "সাধন-মন্দিরের" শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

শ্যামানন্দ সাধকাগ্রগণ্য এবং পণ্ডিত চূড়ামণি—মা যাহাকে কৃপা করিয়াছেন, সকল সিদ্ধি যাহার করতলগত,—গুরুদেব যাহাকে প্রাণ খুলিয়া কর্ম্মযোগ ও যোগাঙ্গ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অভাব কিসের? যাহা লইয়া বেদ—যাহা লইয়া শাস্ত্র—তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই মানব বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিত পদবাচ্য হইতে পারে—নতুবা বাহিরের কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়া পাণ্ডিত্য লাভ কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, পরমার্থ বিষয়ে তাহা কোন কাজে লাগে না। পাঁচু এ হেন কাকার কাছে যখন শিক্ষিত হইতে লাগিল, তখন তাহার আর সুশিক্ষা লাভের জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই।

(৬)

কামরূপে আজকাল শ্যামানন্দের নামে সকলেই মস্তক অবনত করে। কামাখ্যাদেবীর মন্দিরেও শ্যামানন্দের পূর্ণ প্রভাব। যোগীবর প্রতিদিন গভীর রাত্রে আসিয়া দেবীর পূজা করেন, তারপর উমানন্দের মন্দিরে গমন করিয়া প্রাতঃকালে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করত সাধন-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। শ্যামানন্দ প্রতিদিন কামাখ্যার মহাপীঠ পূজায় একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকেন।

এই নিত্য প্রত্যক্ষ মহাপীঠে মোক্ষদা নিত্যবিহার করিয়া থাকেন, শক্তি-সাধক এই যোনীপীঠ দর্শন করিয়া মনে প্রাণে

দেবীর পূজা করিলে অসীম শক্তিশালী হইয়া থাকে—ইহসংসারে সকল সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিণামে মুক্তিপথের পথিক হইতে তাহার আর কোন ভাবনা থাকে না।

"সাধন-মন্দির" এখন বেশ চলিতেছে, শ্যামানন্দের সদাব্রতের জন্য সকলেই সাহায্য করেন, রাজা মহারাজা ত আছেনই; সামান্য ব্যক্তিও দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে "সাধন-মন্দিরের" জন্য একটা চাঁদা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যাহার আয়ে এই পবিত্র সদাব্রত চিরস্থায়ী হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে।

কোন গৃহস্থ বিপন্ন হইলে, অদৃষ্টক্রমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে এই "সাধন-মন্দিরে" আসিলে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। তাহার জন্য প্রায় পঁচিশ ত্রিশখানি গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা প্রায়ই শূন্য পড়িয়া থাকে না। তাহাদের অবস্থানের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত রাজবাটী হইতে হইয়া থাকে। প্রতিদিন যত দরিদ্র নরনারী আহারের জন্য আসিবে—কাহাকেও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না; মন্দিরের ব্যবস্থা এমনি পাকা, তাহার বন্দোবস্ত এমনি সুনিয়মে পরিচালিত।

সাধক না হইলে দেশসেবক হইতে পারে না। দেশের এবং দশের সেবা বড় সহজ কাজ নহে, মনে করিলেই ইহা করিতে পারা যায় না—সাধনসিদ্ধ যোগী ভিন্ন এ কার্য্যে ব্রতী হইলে কেহই বেশী দিন লাগিয়া থাকিতে পারে না, সামান্য ধাক্কা খাইলেই সরিয়া পড়ে—দেশের কাজ বড় কঠিন কাজ, ত্যাগই ইহার ভিত্তি, যিনি যত বেশী ত্যাগ-ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে পারিবেন—এ কার্য্যে তিনিই তত

পাকা হইবেন। ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া এ কার্য্য করা চলে না, বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী জগতের পিতা মাতা, আর বিশ্বের নরনারী তাঁহার সন্তান-সন্ততি—অতএব সকলেই ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধ, এই মহাজ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে, দেশ সেবা তাঁহারই সাজে—অন্যে জোর করিয়া এ ব্রত গ্রহণ করিলে প্রায়ই শেষরক্ষা করিতে না পারিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন।

শ্যামানন্দ জীবনের উষাকাল হইতে এই মহাব্রতে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আজ জীবন-সন্ধ্যায় সে ব্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সাধক না হইলে—শক্তিশ্বরীর শক্তি না পাইলে—এত ধৈর্য্য, এত ত্যাগস্বীকার কি যাহার তাহার হইতে পারে? এই ব্রতে পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য তাঁহার সংসার গেল, অমন পতিব্রতা প্রণয়িনী অকালে কালকবলিত হইল—সমস্ত বিষয় আশয় হইতে বঞ্চিত হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইল—তথাপি অচল অটল; এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ফলেই ত আজ শ্যামানন্দ মাতৃ-আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মদৈত্যের সাহায্যে রাজাকে হস্তগত করিয়া দেশে এত বড় একটা সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—যাহাতে অসংখ্য নরনারী, প্রত্যহ প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে! এ জয়ের মূলে সাধন-শক্তি অপ্রতিহত রহিয়াছে—আর মাই ইহার মূল।

ছোট ছেলেটী আজ বড় হইয়াছে। প্রাণের ক্ষুদ্র আশায়—যাহা এতদিন একটু একটু করিয়া অঙ্কুরিত হইতেছিল, আজ তাহা বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। জগতে যে কার্য্যই হউক, ছোটকে বড় করিবার সময়ই যত কষ্ট, একবার বড় হইলে আর

তত কষ্ট করিতে হয় না, সহজেই চলিয়া যায়। শ্যামানন্দের "সাধন-মন্দির" এখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে এখন চারিদিকেই তাহার সুনাম বিঘোষিত হইতেছে; দেশের লোক সকলেই যখন তাহার স্থায়ীত্বের জন্য মুক্তহস্ত হইয়াছে, তবে আর ভাবনা কিসের?

সাধক এইবার বড়বউয়ের উপর ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়া জীবনের ঈপ্সিত বস্তুর দর্শন জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই হিন্দুর প্রত্যেক পীঠস্থান দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বড়বউ বড় লোকের মেয়ে, কর্ত্তৃত্ব করিতে, কোন বৃহৎ কার্য্যে সুবন্দোবস্ত করিতে তিনি চিরদিনই পাকা; তার উপর রাজপুত্র যখন এ কার্য্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া লাগিয়াছেন, তখন যে উহা ভালরূপে পরিচালিত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পাঁচুও এখন বড় হইয়াছে; স্বর্গীয় রামনাথ রায়ের বংশের তিলক এখন নবজীবন লাভ করিয়া এই মহাব্রত পালনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; সে মানুষ হইয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও শিক্ষা দীক্ষায় এই সামান্য দিনের মধ্যে বেশ মতিমান হইয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, আর অর্থেরও অভাব নাই, এ কার্য্য সে বেশ সুখ্যাতির সহিত চালাইয়া লইতে পারিবে—এইজন্য শ্যামানন্দ অবসর লইয়া এখন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতাই সকল সিদ্ধিমূল; তাই সাধক সেই মূলে জলসেক করিতে অগ্রসর হইলেন।

শ্যামানন্দের সাধন-মন্দিরে এক স্বতন্ত্র রকমের সদাব্রত বলিয়া এখানে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যাহারা দীনভিখারী অন্ধ, খঞ্জ, অতুর তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা ত প্রত্যহ এখানে আসিয়া আহার করিয়া চলিয়া যায় কিন্তু যাহারা এই আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে, যাহারা এখানে অবস্থান করে—তাহাদিগকে কেবল বসিয়া বসিয়া খাইতে দেওয়া হয় না। নিজের ঘরের মত কাজ কর্ম্ম করিয়া এই সদাব্রতের সাহায্য করিতে হয়। বৃহৎ বাগান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে হয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে চাষ-আবাদের জন্য জমী দেওয়া হইয়াছে। বিধবাগণ বসিয়া সময় নষ্ট করিতে পান না, কেহ বিপন্ন হইয়া পড়িলে তাহার সেবা করিতে হয়। যখন সে সকল কার্য্য না থাকে—তখন চরকায় সূতা কাটিতে হয়—ঐ সূতায় বস্ত্রাদি বয়ন হইয়া আশ্রমবাসীর লজ্জা নিবারণ করে, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্র প্রস্তুত হয়। এ সকল বিষয়ের শিক্ষা দিবার ভার লইয়াছেন—অম্বিকাদেবী। তিনি চরকা চালনায়, সূতা কাটায়, তুলা পেঁজায়, নলি পাকানা প্রভৃতি কার্য্যে বড়ই অভ্যস্থা, বড়লোকের গৃহিণী হইলেও তিনি এ কার্য্যে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন এ কার্য্যে অনভ্যস্থা থাকিলেও এখন "সাধন-মন্দিরে" এই কার্য্য শিক্ষা দেওয়া তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম হইয়াছে। তাঁহার প্রাণের দেবর যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, পুত্রসম সাধকপ্রবর শ্যামানন্দের আশ্রম যাহাতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, অম্বিকা ও পাঁচুর তাহা একান্ত করণীয়। সব গিয়াছে, তাহাদের প্রাতঃস্মরণীয় বংশের নাম লোপ হইতে বসিয়াছে—তবে মহামনা কাকাই এখন

তাহা কতক পরিমাণে বজায় রাখিয়াছেন—তাঁহার সাধন প্রভাবেই তাই আবার তাহারা লোকের নিকট, সমাজের নিকট গণ্যমান্য হইতেছেন—এখন অম্বিকাদেবীকে ভক্তি করে না, পাঁচুকে মান্য করে না, এমন লোক কামরূপে কয়জন আছে? এই যে পূজা-মান্য তাহাদের লাভ হইতেছে—তাহা কাকার জন্য নয় কি? অতএব কাকার এই মহৎ কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়ী এবং চিরস্মরণীয় হয়—তাহা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য!

কাপাস তুলার একটী ক্ষেত্র ছিল, তাহাতে যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হইত। ইহার দ্বারা "সাধন-মন্দিরের" স্ত্রীলোকেরা তুলা প্রস্তুত করিতেন এবং তাহার দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আশ্রমবাসীর লজ্জা নিবারণ ত হইতই, অপরাপর যাহাদের অভাব হইত, তাহারাও এই আশ্রমজাত বস্ত্রে আপনাদের অভাব পূর্ণ করিয়া লইত। তখন বিদেশ হইতে এদেশে এত বস্ত্রের আমদানী হইত না; তাই এই গৃহজাত শিল্পের এত আদর ছিল, এখন আমাদিগকে ইহার জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, কখন তাহারা বস্ত্র আনিয়া দিবে, তবে আমরা লজ্জা নিবারণ করিব! আমরা এখন গৃহশিল্প ছাড়িয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত কষ্ট, তাহার জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে! একদিন ভারতের বস্ত্র, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া সকলে অবাক হইত—ভারত হইতে শিক্ষা করিয়া কত দেশ উন্নত হইল—আর আমরা এমন শিল্প কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কত অধিক মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছি; হায়! অধঃপতন আর কাহাকে বলে?

সাধন-মন্দির

"সাধন-মন্দিরের" বস্ত্রবয়ন কার্য্য দেখিয়া একদিন আসামের সকলে এই কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তুলার চাষ, চরকার প্রচলন ঘরে ঘরে হইয়াছিল। তারপর চা-করগণের চা-বাগান নির্ম্মিত হইয়া এখন সে কার্য্য প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বিনা আয়াসে চা-বাগানে মজুরী করিতে পাইয়া এখন লোক তাহাতে কার্য্য করিতেছে—আপনাদের স্বাধীন ব্যবসা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় আড়কাটীর অত্যাচারে গৃহে বাস করা দায় হইয়াছিল। একটু অসাবধান হইলেই পাষণ্ডেরা কুলের কুলবধূকে পর্য্যন্ত চালান দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। চা-কর ও নীল-করদের অত্যাচার এক সময় দেশকে জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজের সভ্য রাজত্বে তাহা প্রশমিত হইয়া গিয়াছে, তত আর নাই বলিলেই হয়।

শ্যামানন্দের নাম যখন এখানে খুব বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল—তখন অনেক চা-কর ও নীল-কর সাহেবও তাঁহাকে মান্য করিত। শ্যামানন্দ অনেক বিপন্ন ভদ্র নরনারীকে সে সময় এই রাক্ষসদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া গৃহস্থের কুলমান রক্ষা করিতেন। এ সকল কার্য্যে কুমার সর্ব্বেশ্বরের সাহায্যই প্রধান ছিল। কুমারের চিত্ত বড়ই দয়ার্দ্র কোমল ছিল; তিনি কাহার দুঃখ কষ্ট বা আর্ত্তনাদ শুনিতে পারিতেন না। গুরুদেব শ্যামানন্দের উপদেশ প্রভাবে তাঁহার চিত্ত এত সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল যে অজস্র অর্থব্যয়েও তিনি দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

(৭)

আজ কয়েকদিন হইল—শ্যামানন্দ "সাধন-মন্দিরের" ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ কার্য্যে যখন সকলে উপযুক্ত হইয়াছে, সেবাব্রত যখন পাঁচু ও কুমার প্রভৃতির প্রাণের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে আর রাজা বাহাদুর যখন এ কার্য্যে উৎসাহ-দাতা হইয়াছেন, ভাণ্ডার রক্ষার ভার যখন অম্বিকাদেবী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর কূপমণ্ডূকের ন্যায় একস্থানে বসিয়া জীবনভার বহন করা কেন! মা আমার কোথায় কি ভাবে আছেন —রাজ্যেশ্বরী হইয়া কিভাবে রাজ্য রক্ষা করিতেছেন—একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া, অন্যান্য পীঠস্থানাদি দর্শন করা উচিত বিবেচনা করত তিনি কাশীধামে গমন করিয়াছেন। কাশী হইতে কালীঘাটে আসিবেন—নকুলেশ ও কালিকাদেবীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। তারপর গুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ঐহিক পারত্রিক নিস্তারের উপায় করিয়া লইবেন এই তাহার ইচ্ছা। মানুষ যতই উন্নত হউক, মূলে গুরু-কৃপাহি কেবলম্! বিশেষতঃ সাধন বিষয়ে জীবনের পথ মুক্ত করিতে গুরুর সাহায্য একমাত্র সম্বল!

কাশী স্বর্ণময়ী পুরী—এখানকার জলে স্থলে মরিলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, ভগবান শঙ্করের ইহাই ঘোষণাবাণী! এখানে দেবী অন্নপূর্ণারূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া জীবের অন্ন সমস্যা পূরণ করেন—এখানে কেহই ক্ষুধাতুর থাকে না; মা আমার চারিহাতে সকলের প্রাণের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া ভব-ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকেন।

আর প্রভু আমার কালভৈরবরূপে জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়া শিবত্ব প্রদান করেন। কাশীর যেস্থানে সতীদেবীর মণিময় কুণ্ডল পড়িয়াছিল, সেই স্থান মণিকর্ণিকা নামে অভিহিত, সেই ঘাটে স্নান করিলে মানব সদ্যমুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। শুনা যায়—কাশী পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, ইহা ত্রিশূলীর ত্রিশূলের উপর অবস্থিত—অন্যান্য পীঠস্থান অপেক্ষা বারাণসীধাম এইজন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, কাশীখণ্ডে শঙ্কর স্বয়ং এই ধামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন; এই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় যোগী সন্ন্যাসী এবং মহা মহা মুক্তপুরুষ আসিয়া ইহার মহিমা উপলব্ধি করেন। শ্যামানন্দ ভদগতচিত্তে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেশ ভ্রমণের জন্য তাঁহার এত আকাঙ্ক্ষা, তীর্থ পর্য্যটনের জন্য প্রাণের পিপাসা এত বলবতী ছিল না। তিনি জানিতেন—দেবতা কোথাও নাই, নিজ হৃদয়-মন্দিরই প্রাণের দেবতার প্রকৃত আসন, তাঁহাকে নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইলে পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে শিখিয়া থাক, যদি খুঁজিয়া বাহির করিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে নিজের ভিতর অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে চতুর্হস্তা-লোল-রসনা মা তোমার হৃদয়ে চিরবিরাজিতা! তবে তাঁহার জন্য দেশ ভ্রমণে যাইবার এত সাধ কেন?

সকলে আসিয়াছে, সকলে মিলিয়াছে—তবে তাঁহার প্রাণের ভাই নিখিল কোথায়! তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে যাহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া পালন করিয়াছেন—যাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন—সে লেখাপড়া শিখিয়াছে কিন্তু এখন

গেল কোথা! তাহার ত সন্ধান আর পাওয়া যাইতেছে না, তবে কি প্রাণের নিখিল জীবিত নাই? কালকীট কি জীবনের কোরক অবস্থাতেই তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে? হায়, কোথা সে; বড় দাদাকে স্বর্গপথে রওনা করাইয়া দিয়া, পাঁচু ও বড়বউকে মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া এখন ছোট ভাই ও ছোট ভ্রাতৃবধূর জন্য তাঁহার প্রাণ বড় উতলা হইয়াছে। এইবার তাহাদের আনিয়া এই "সাধন-মন্দিরে" মিলন করিয়া দিতে পারিলেই যেন তিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। সাবিত্রী ত চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আনিয়া একত্র মিলনের ত আর উপায় নাই? সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের বাস্তু পর্য্যন্ত পরহস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সোণার সংসার, সেই ভাঙ্গা বাগান জোড়া লাগাইয়া পিত পিতামহের নাম বজায় করিতে পারিলেই যেন অমরেন্দ্র—শ্যামানন্দের প্রাণে শান্তি হয়, এইজন্য তীর্থ ভ্রমণের নাম করিয়া একবার কলিকাতায় নিখিলের সন্ধান করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে যে তীর্থ দর্শন না করিবেন—এমন নহে। এইজন্য প্রথমেই সর্ব্ব তীর্থের সার কাশী আসিয়াছেন।

অনেকে হয় ত শ্যামানন্দকে এখনও সংসারভাবে এত বিভোর দেখিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সাধক বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন কিন্তু আমরা জানি—যিনি আপনাকে একবার গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন, সাধন-সিদ্ধি লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়াছেন; পরের জন্য আপনার প্রাণ বিলাইয়া দিয়া যিনি সকল সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিতে পারিয়াছেন—তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই

করুন, সকল স্থানই তাঁহার পীঠস্থান—সকল স্থানই তাঁহার মায়ের আসন—আর সকল কার্য্যই তাঁহার মায়ের কার্য্য বলিয়া মনে হইবে। সংসার ও অরণ্য, ঘর ও বার সকলই যখন তাঁহার সমান, তখন দেহের শোণিত মাংসের সহিত জড়িত প্রাণের সোদর নিখিলের অন্বেষণ করিয়া "সাধন-মন্দিরে" আনিবার জন্য প্রয়াস না পাইবেন কেন? জগৎ সংসারের জন্য যখন তাঁহার প্রাণ কাঁদে, দুঃখ দেখিলে মনকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন নিখিলের জন্য হইবে—ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

প্রথম দুই একদিন কাশীতে আসিয়া শ্যামানন্দ দেবতার দর্শনেই তন্ময় হইয়া রহিলেন। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কাশীর শোভা-সৌন্দর্য্য, তাহার প্রাণারাম ভাব সাধক-প্রাণে বড়ই আনন্দের তুফান তুলিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যাকালীন আরতির ঘটা, তথায় সুললিত কণ্ঠে হিন্দুর হৃদয়োন্মাদকারী বেদ-গান শুনিয়া শ্যামানন্দ কয়েকদিন বিভোর হইয়াছিলেন—বাহ্যজ্ঞান তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না; আহার-নিদ্রায়ও বুঝি তাঁহার ভুল হইয়াছিল। সাধক হৃদয়ের সাধন-ক্ষেত্রে প্রবল ভাব-বন্যা প্রবেশ করিয়া সমস্তই ভুল করিয়া দিয়াছিল। আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তিনি স্বর্গ সদৃশ কাশীর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই কাশী যায় এবং আসে কিন্তু এভাব সাধক ভিন্ন আর কাহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকে?

সপ্তাহ পরে তিনি কাশী হইতে কালীঘাটে আসিবার জন্য মণিকর্ণিকায় স্নান করত সন্ধ্যার সময় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃ

পদে শেষ বিদায় লইতে যাইতেছেন—এমন সময় কাহার কঙ্কালসার দেহ তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। সেও সেই সময় তাড়াতাড়ি মন্দির হইতে বাহির হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে আসিতেছে।

রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিবেন—শ্যামানন্দ প্রাণের আবেগে মাতৃদর্শনে যাইতেছেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই, দেব-মন্দির তখনও আলোকোজ্জ্বল কিছু বিলম্ব আছে; কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময়ী নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া নক্ষত্রমালিনী, নবযৌবনসম্পন্না নিশাসুন্দরী যখন প্রথম অভিসারে আসিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে আলোক-আঁধারে শ্যামানন্দের নয়ন সম্মুখে এই মূর্ত্তি পড়িবামাত্রেই যেন তাঁহার হৃদয়ের শতদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, কতদিনের পুরাতন স্মৃতি যেন নয়নের সম্মুখে খেলা করিতে লাগিল। জীর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিলেই দরিদ্রের প্রাণবন্ধু শ্যামানন্দের প্রাণ উথলিয়া উঠিত—তাহার অবস্থা কিরূপ, কেমন আছে, কি করে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িতেন না, অবস্থাবৈগুণ্য হইলে তাহাকে সাদরে নিজ আশ্রমে আনিয়া রাখিতেন, সেবা করিতেন, ইহাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল।

আজ এই দরিদ্রকে দেখিয়া তবে কি শ্যামানন্দের সেই ভাব উথলিয়া উঠিয়াছে? না—না, এ দর্শন সে দর্শন অপেক্ষা আরও নিবিষ্ট—দৃঢ়-সংবদ্ধ, লোক সমাগম হইবে বলিয়া দরিদ্র ততই সরিয়া যায়, সঙ্কীর্ণপথে পলাইবার চেষ্টা করে—যাহাতে কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়! শ্যামানন্দ ততই তাহাকে বাধা দিয়া বলেন—তুমি কোথা যাইবে—একটু দাঁড়াও না?

সন্ন্যাসীর আপন-করা প্রাণের টান দেখিয়া দরিদ্র দাঁড়াইল। শ্যামানন্দ বলিলেন—তোমাকে দেখিতেছি—সদ্বংশজাত, বোধ হয়—কোন কর্ম্মদোষে এমন কষ্ট পাইতেছ—তোমার বাড়ী কোথা, তুমি কোন্ শ্রেণী ?

শ্যামানন্দ মানুষ দেখিলেই তাহার প্রাণের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন। ব্রহ্মদৈত্যের কৃপায় আর সাধন-ভজনবলে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার এমনি অমানুষিক শক্তি জন্মিয়াছিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া বলিল—আমি রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, এখন আমার বাড়ী ঘর নাই—ভবঘুরের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—যেখানে যা পাই, তাই খাই—তবে একসময় আমার বাড়ী ছিল—হুগলী জেলায়।

সন্ন্যাসী।—নাম কি, বলিতে বাধা আছে কি ?

দরিদ্র।—প্রভু! ক্ষমা করুন, এ হতভাগ্যের নাম শুনিয়া কাজ নাই—আর আমি কাহারও নিকট নাম প্রকাশ করিতে রাজী নহি ?

মায়ামোহের অতীত—সাধকাগ্রণ্য শ্যামানন্দের প্রাণ এই দরিদ্র কঙ্কালসার যুবককে দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি প্রাণের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—নিখিল, নিখিল, প্রাণের ভাই! নিখিল, কি কর্ম্মফলে তোর এই দশা, আমরা যে তোকে শেষের সম্বল পর্য্যন্ত দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া-ছিলাম, মনে করিয়াছিলাম—তুই কলিকাতায় বউমাকে লইয়া বেশ সুখে, অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছিস্, তাই আর তোর দাদাদের কথা মনে নাই কিন্তু ভাই, একি, এ কি দশা তোর দেখিলাম!

তোর সংসার-সঙ্গিনী আমার কুললক্ষ্মী বউমা কোথা! তারও কি এই দশা করিয়াছিস?

শ্যামানন্দ নিজ শক্তিবলে প্রাণের ভাই নিখিলকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। স্বর্ণ যতই মলিন হউক না কেন, স্বর্ণকার যেমন তাহা চিনিতে পারে, যতই মলামাটী মাখা হইলেও মণিকারকে যেমন মণি চিনিয়া লইবার জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হয় না, অতিরিক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও ভাইকে চিনিতে ভাইয়ের তেমনি বিলম্ব হইল না, বিশেষতঃ শ্যামানন্দের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ভাই যে তাহাকে সহজে চিনিবেন ইহার আর বিচিত্র কি? হউক না সে রোগজীর্ণ, দুঃখদীর্ণ, ব্যথাবিদীর্ণ, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, তথাপি শ্যামানন্দের নিকট সে যে এখনও কষিত কাঞ্চনের মত অমূল্য, প্রাণে প্রাণে গাঁথা, রক্তে রক্তে বাঁধা —প্রাণের ভাই! সংসার ত্যাগ করিয়া, তাহার সমস্ত মায়া মমতা ভুলিয়া এখনও যে শ্যামানন্দ প্রাণের কনিষ্ঠ সহোদর নিখিলের কথা তোলাপাড়া করেন—এখনও যে তাহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদে? মা মারা যাবারপর—সে অপগণ্ড শিশুকে যে তিনিই কোলে পীঠে করিয়া বড় করিয়াছিলেন—লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাকে মানুষ করিবার জন্য তিনি যে নিজের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন। এ টান কি কখনও যাইতে পারে?

নিজ কর্ম্মদোষে নিখিলের অদৃষ্ট ভাঙ্গিবার পর হইতে তিনি আর কাহাকে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিলেন না—সাহস করিয়া কাহারও মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল, পাছে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া

তাঁহার কুকর্ম্মের জন্য লাঞ্ছনা প্রদান করে—তীব্র কটূক্তি করিয়া তাঁহার প্রাণে বেদনা দেয়। নানাবিধ মতিভ্রমে একে ত মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার উপর লাঞ্ছনারূপ লবণ প্রক্ষিপ্ত হইলে জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে—তাহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য! তাই নিখিল আর পরিচিত স্থানে বা পরিচিত লোকের কাছে বাস করেন না—প্রাণের মধ্যে একটা ধিক্কার জন্মিয়াছে, হায়! কি করিলাম, এত লেখাপড়া শিখিয়া কোথায় মানুষ হইব—দশজনের একজন হইয়া সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব—বংশের মুখোজ্জ্বল করিব, না সামান্য বুদ্ধির দোষে একেবারে অধঃপাতে গেলাম; সমাজে আমার মুখ দেখান দায় হইল! কিন্তু আমি কি করিয়াছি! মাধুরীর প্রেমে মজিয়াছিলাম—এই অপরাধ, হায়! মাধুরী কি সামান্যা, সে বেশ্যাপুত্রী হইলেও অনেক কুলিনাতা বধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!—ভগবান জানেন—মাধুরী আমার কত পুণ্যের, কত পবিত্রতার আধার। সে স্বর্গে গিয়াছে—আর আজ আমি নরকে? তবে আমার দোষ হইয়াছে—সরযূকে অবহেলা করা, সে সোণার প্রতিমাকে কষ্ট দেওয়াই আমার কাল হইয়াছে, আর সেইজন্যই বিধাতার অভিসম্পাতে পড়িয়াছি কিন্তু সে ত আমার কিছুমাত্র দোষ গ্রহণ করে নাই? এতদিনের পর সেদিন দেশে যাইয়া, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণ অস্থির হইল; মনে করিলাম—কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। সঙ্গে রাখিলে বোধ হয়—সোহাগ-লালিতা, জমীদার-দুহিতা এমন শুখাইয়া মরণের পথে অগ্রসর হইত না, কিন্তু এখন কি করি? অর্থ নাই—সামর্থ নাই—বিদ্যা বুদ্ধি দরিদ্রতা হেতু

এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে, যাহা আছে তাহারও কেহ আদর করে না, উপেক্ষা করিয়া তাড়াইয়া দেয়; কে জানে শেষে এমন হইবে? মাধুরী রাজরাণীর মত চলিয়া গিয়াছে, জীবনে কোন কষ্ট পায় নাই, কিন্তু অভিমানিনী সরযূর দশা কি হইল? এত লেখাপড়া শিখিয়া শেষে নিজের সহধর্ম্মিণীর সামান্য অভাব অভিযোগও মিটাইতে পারিলাম না। এতদিনের পর দেখা পাইয়া এত কষ্টে সতী এক প্রকার আরোগ্যের পথে আসিতেছিল—রোগ যন্ত্রণা এক প্রকার ভুলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমি সে কষ্ট চক্ষে দেখিতে না পারিয়া কাশী পলাইয়া আসিয়াছি, এত কষ্টের পর যে আনন্দটুকু পাইয়া ধীরে ধীরে সে আরোগ্য লাভ করিতেছিল—এ সংবাদে হয়ত সে দারুণ ব্যথা পাইয়া নানা চিন্তায় জড়িত হইয়া পড়িবে—তাহা হইলে এবার আর তাহার জীবনের আশা নাই! যাক, এক হতভাগার মত স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাক্—জীবনে কোন সুখ পায় নাই—তবে বৃথা জীবনধারণে ফল কি? সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্তিত্ব লোপ হউক; পরকালে অনন্ত নরকে গিয়া আমিও তাহার শাস্তি ভোগ করি!

সাধারণ লোকের মুখের প্রতি চাহিতেও যখন নিখিলের ভয় হয়, তখন এ দেবজ্যোতি পবিত্র মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে নিখিলের সে সাহস কোথায়? সে বদনের প্রতি চাহিয়া দেখে সে ভরসা তাহার নাই, তাই নিজের প্রাণের দাদাকে চিনিতে পারে নাই.—সে জানিত মেজ বউদিদির মৃত্যুর পর মেজ দাদাও বুঝি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু আজ চক্ষের সম্মুখে তাঁহার সেই দয়ার্দ্রচিত্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, সাধু প্রকৃতি দাদাকে

দেখিয়া ভয়ে লজ্জায় জড়িভূত হইয়া পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—মেজদা! কেন, ভাই দেখা দিলে,—সত্যসন্ধ পরম ধার্ম্মিক হইয়া কেন এ অসাধু মহাপাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত হইতে আসিলে? এ নিখিল সে নিখিল নহে, তোমার মত ধার্ম্মিক ভাইয়ের ভাই যে নিখিল—সে মরিয়াছে, এ তাহার প্রেতমূর্ত্তি—আমার মত নরাধমকে স্পর্শ করিলেও তোমার মত ধার্ম্মিকের তপঃক্ষয় হইবে,—দাদা! মেজদা! সরিয়া যাও—পথ ছাড়—আমি পলায়ন করি—এ কালামুখ আর দেখাইব না!

নিখিল যেমন উঠিয়া পালাইতে যাইবে—শ্যামানন্দ অমনি তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ভাই! পাপীকে কোলে তুলিয়া লওয়াই ত সাধুত্ব—সাধুর মহত্বই ত এখানে; যে প্রকৃত সাধু—সে ত পাপীকেই কোল দিবে—শ্রীচৈতন্য মার খাইয়াও মহাপাপী জগাই মাধাইকে বুকে তুলিয়া লইয়া নিজ মহত্ব দেখাইয়াছিলেন। সে ত তাঁহার পর—আর তুই প্রাণের ভাই—তোকে কোল দিব না। তুই পাপী কিসের—যখন এত অনুতাপ, তখন পাপ ধ্বংস হইয়াছে—সোণা আগুনে পুড়িয়া খাঁটি হইয়াছে, চেষ্টা করিলে—এইবার মাতৃ অঙ্কের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারিস্! আয় ভাই কোলে আয়! মার নিকট যে সকল ছেলেই সমান—বিশেষতঃ যে পতিত তার যে বড় আদর! ভয় কি ভাই—মা আছেন! এখন আমার কুললক্ষ্মী মা সরযু কেমন আছেন—ভাই বল! বহুদিন যে তাঁকে দেখিনি?

নিখিল।—ভাই! সে বুঝি আর নাই, আমার অবস্থা মন্দ

হইবার পর—একবার দেখিতে গিয়াছিলাম—সে দেবীপুরে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় আছে; তাহাদের অর্থের অভাব, আমারও দিবার শক্তি নাই বলিয়া এই দূরদেশে পালাইয়া আসিয়াছি। কঠিন পীড়াগ্রস্ত—বোধ হয় সেই কষ্ট, আর আমার অদর্শন জনিত কষ্টে এতদিনে তাহার সকল কষ্টের শেষ করিয়াছে?

শ্যামানন্দ মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন—বলিস্ কি নিখিল! তোর শিক্ষার কি এই পরিণাম, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই—চল দেবীপুরে যাই।

(৮)

দেবীপুর এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। সরযুর পিত্রালয় এই দেবীপুর গ্রাম এক সময় তাহার পিতৃকীর্ত্তিতে কীর্ত্তিময় ছিল,—অতি শৈশবে তাহার পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও অনেক সৎকার্য্য করিয়া বংশের মানবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনিও স্বর্গগত হইয়াছেন, সরযু পিতা মাতার স্নেহাদর প্রাপ্ত হন নাই—অতি শৈশবে তাঁহারা স্বর্গগত হওয়ায় সরযু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দ ও উমাসুন্দরীর দ্বারাই কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। তাই তিনি জেঠা মহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া দেবীপুরে আসিয়াছিলেন। অন্তিমে কন্যার মত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে পরিণত বয়সে ইহসংসার হইতে বিদায় দিয়াছেন। উমাসুন্দরীও প্রকৃত সতী ছিলেন—স্বামী-বিরহ বেশীদিন ভোগ করিতে না

পারিয়া এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহগামিনী হইয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী বংশে এখন আছে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারী, এবং গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামধন ও সরযু। কলিতে ভাল বংশের উন্নতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের বাড়বাড়ন্ত প্রায় থাকে না, ইহা ভগবানের অভিশাপ। এখন যে দিকেই দেখা যায়—প্রাতঃ স্মরণীয় বংশের উচ্ছেদ সাধন হইতেছে, তাহার স্থলে নূতন বংশ মাথা তুলিয়া আপনাদের পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতেছে। কলিতে প্রায় সকল স্থানেই এই নিয়ম অপরিহত—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না বলিয়া আজ দেবীপুরের চক্রবর্ত্তী বংশ লোকজন শূন্য কেবল শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় দুইটী যুবক নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় ধিক ধিক করিয়া জ্বলিতেছে, এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই—তবে আরও একটু জোর বিপদ-বাতাস আসিলে কি হয়, বলা যায় না।

সরযূ জেঠা মহাশয়ের পীড়ার সময় দেবীপুরে আসিয়াছিলেন—আর তাহাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হয় নাই। সে বংশেরও উপর্য্যুক্ত পরিণতি হইয়াছে। কে কোনদিকে চলিয়া গিয়াছেন—পূজনীয় বড় ভাসুর ও মেজো ভাসুরের কোন সংবাদ নাই। শিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়িয়া সরযূ জীবনে কত সুখের আশা করিয়াছিল—জীবন ভরিয়া কত স্বাচ্ছন্দ ভোগ করিবার আশা করিয়াছিল—কিন্তু একদিনের জন্য তাহার কণিকামাত্র ভোগ ত হইল না বরং আজীবন মর্ম্মান্তিক

দুঃখ দাবানলে পুড়িয়া জীবন মরুভূমি হইয়া গেল। সুখ যত হউক আর নাই হউক, উহা ভাগ্যের কথা, কিন্তু সতী স্ত্রী দিনান্তে স্বামীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া, তাঁহার সহিত বৃক্ষতলে বাস করিতে পারিলেও যে স্বর্গের সুখ উপভোগ করে—হায়! সরযুর ভাগ্যে তাহাও হইল কই? এ জীবন যে বৃথায় অতিবাহিত হইল—স্বামী-দেবতার দর্শন, পূজন, স্পর্শন বিনা নারীজন্ম কি এমনি করিয়া চলিয়া গেল! রামধন ও বিনোদের দ্বারা তিনি অনেকবার কলিকাতায় তাঁহার প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা কোন সন্ধান আনিয়া দিতে পারে নাই, তাই সতী অকস্মাৎ তাঁহার এইরূপ নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে একেবারে হতাশ হইয়া বিষম মর্ম্মযাতনা অনুভব করিয়াছিলেন—তাই দুশ্চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিনোদ ও রামধন একমাত্র ভগ্নীর পীড়ার জন্য অবস্থানুসারে কত চিকিৎসা করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। শরীরের অসুখ হইলে—চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষধের ব্যবস্থা আছে, মনের মধ্যে অসুখ হইলে তাহার ঔষধ কোথায়? কাজেই সরযু দিন দিন রূপ-লাবণ্যবিহীন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুর কবলস্থ হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। রামধন ও বিনোদের কেহ নাই—দিদিমাত্র ভরসা, তাহারা সরযুর অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল।

এত কষ্ট এত মনঃপীড়া—নানাপ্রকার ব্যাধিতে দেহ-বৃক্ষ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি সরযু একদিনের জন্য শয্যাশায়িনী হন নাই, প্রত্যহ ভ্রাতাদের রন্ধন করিয়া দেওয়া, গাভী-পরিচর্য্যা, প্রভৃতি

গৃহকর্ম্ম সকলই করিতেছেন। গৃহস্থের কুলবধূ এ সকলে কবে হতাদর করিয়াছে? জীবনের শেষদিন অবধি খাটিয়া খাটিয়া তাহারা দেহপাত করে—তথাপি বলে না—যে এ কার্য্য আমি পারিব না—হিন্দু সতীর এমনি সহ্যগুণ, সংসার পরিচালনের তাহাদের এমনি একনিষ্ঠা ঐকান্তিকতা! বিনোদ ও রামধন তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেও—সরযূ সে কথায় কাণ দেন না। বুঝি মনে করেন—এ দেহ যত শীঘ্র পতন হয়—ততই মঙ্গল!

বিনোদ ও রামধনের সংসার চালাইবার পক্ষে কিছু অনাটন নাই, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, শাক-শব্জী ভরা বাগান, কিছুরই অভাব নাই। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে পথে বসাইয়া যান নাই—পল্লীগ্রামে একজন ভাল গৃহস্থের মত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু লোক কই—অল্প বয়স্ক যুবক, করে কে—আর থাকেই বা কাহার দ্বারা; বিনোদ ও রামধন সংসার কার্য্যেও তত পরিপক্ক নহে। সরযূ পাকা গৃহিণী হইলেও—সাবিত্রীর শিক্ষায় ভাল রকমে সংসার কার্য্যে নিপুণা হইলেও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে—সংসার কার্য্য আর তাঁহার দ্বারা ভাল চলে না। স্ত্রীলোক হইয়া বাহিরের কাজ কেমন করিয়া দেখিবেন? তাই সমস্ত পাঁচভূতে খাইতেছে—অবশিষ্ট যাহা গৃহে আসিতেছে, তাহা অতি সামান্য—ইহাতেও একপ্রকার চলিয়া যায়—যদি সরযূ ভাল করিয়া বুক দিয়া সংসার করিতে পারেন, কিন্তু হায়! ভগবান তাঁহাকে যে সেবিষয়েও শক্তিহীনা করিতেছেন, কাজেই সংসারে কষ্টের একশেষ!

একে মানসিক চিন্তা, তার উপর সংসার চিন্তা, এই দুই বিষম চিন্তা একত্র হইয়া সরযুকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল, তিনি বসিলে আর উঠিতে পারেন না, দাঁড়াইলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন—দেহ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় কোথা হইতে একদিন বিদ্যুতের মত নিখিল আসিয়া দর্শন দিল; তাহার সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্যও গিয়াছে, সে দেহ লাবণ্যহীন, রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ—দেখিয়া সরযু কাঁদিয়া আকুল হইলেন; তারপর বলিলেন—আমি কাছে না থাকিয়া—সেবা করিতে না পারিয়া তোমার এমন দেহ হইয়াছে কিন্তু আমার অপরাধ নাই, আমি বিনোদ ও রামধনকে কতবার তোমার অন্বেষণে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। যাহা হউক, আমার অপরাধ নিও না—দোষ আমারই সব। তোমার আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নাই—এখানে জেঠার যা আছে, দেখে খেলেই আমাদের বেশ চল্‌বে—তুমি আর কোথাও যেও না, এইখানেই থাক। সেই রুগ্ন দেহে, কয়খানা হাড়ে সরযু উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্বামীকে বহুদিনের পর প্রাণের মতন রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন। আজ যেন সে জীবনের সমস্ত কষ্ট, সমস্ত অবসাদ—সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছে। নড়িতে পারিতেছে না—পাড় পড়ি করিয়াও তবু সমস্ত করিতেছে, একটা আগ্রহ—একটা উত্তেজনা যেন তাঁহার সেই কয়খানা কঙ্কালসার দেহের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সজীব কাঠের পুতুলের মত তাঁহাকে নাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিখিল সেই অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, কঙ্কালসার সতীর প্রাণপুরা

ভালবাসা দেখিয়া, এত কষ্টে, তাঁহার প্রতি প্রাণের ভীষণ টান দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন—হায়! আমি করিয়াছি কি? স্বর্গের দেবীকে এমন করিয়া কষ্ট দিয়াছি, তাচ্ছল্য করিয়াছি খাইতে পরিতে দিই নাই—কেবল নিজের সুখ-সচ্ছন্দে ব্যস্ত হইয়া প্রাণের এমন মহীয়সী শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছি? উঃ আমার দুর্গতি হইবে না ত হইবে কাহার? এত কষ্ট দিয়াছি—এত লাঞ্ছনা করিয়াছি—তথাপি তাহার জন্য একটা অনুযোগ নাই—একটা রূঢ় কথা নাই; সোণার দেহ কালী হইয়া গিয়াছে, উঠিবার শক্তি নাই—তথাপি আমার সন্তোষের জন্য প্রাণভরা আগ্রহে উঠিপড়ি করিয়া লাগিয়াছে, যাহাতে আমি সুখী হই। হিন্দু সতীর সহিত দেবীর কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ যে ইহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়! হিন্দু সতী স্বামীর জন্য যে হেলায় প্রাণ দিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। নিখিল লজ্জায়, ক্ষোভে, মর্ম্মদাহে একটী কথাও কহিতে পারিল না, অথবা কথা কহিতে যেন তাহার মুখ আট্‌কাইয়া যাইতেছিল।

নিখিল রিক্তহস্তে আসিয়াছে, হাতে এক কপর্দ্দকও নাই—নিজের চরিত্র দোষে সব নষ্ট করিয়াছে, চাকুরী বাকুরী গিয়াছে, এত বড় একটা শিক্ষিত অধ্যাপক হইয়া আজ অন্নের কাঙ্গাল, পথের ভিখারী, হায়! চরিত্র দোষ! তুমি যত বড়ই শিক্ষিত, ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী হও না কেন, চরিত্রহীন হইলে তোমার কিছুই থাকে না,—তুমি সকলের হেয় হও; কিন্তু কিছু থাক্ আর নাই থাক্—

চরিত্র থাকিলে সকলই পাওয়া যায়—চরিত্রই মানবের অমূল্য সম্পত্তি!

মাধুরী মারা যাইবার পর নিখিল কিছুদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া চাকুরীর সন্ধান করিয়াছিল কিন্তু কলিকাতার সকলেই তাহাকে জানে চিনে, কাজেই কেহ তাহাকে চাকুরী দিল না, অথবা সে লজ্জায় কাহারও নিকট যাইতে পারিল না। মাধুরী বলিয়া গিয়াছিল—আমি চলিলাম—কিন্তু তুমি আর দেবী সদৃশা দিদি সরযুর সঙ্গ ত্যাগ করিও না, তিনি স্বর্গের দেবী—আমি তাঁহার পদতল স্পর্শ করিবার উপযুক্তা নই—তবে যে তুমি আমাকে পদতলে স্থান দিয়াছিলে—আমি যে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের পবিত্র প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলাম—সে তোমার দয়া এবং আমার পূর্বজন্মের সুকৃতি! নতুবা বেশ্যাপুত্রী কবে দেবতার চরণতলে স্থান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে? আমি কৃতকৃতার্থা হইয়াছি, তাই এত শীঘ্র আমার ভোগের অবসান হইল, তোমার কৃপায় আমি স্বর্গে চলিলাম, এক্ষণে দিদিকে আমার মত প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গে এস—আমরা একত্রে দুইজনে তথায় তোমার পদসেবা করিব।

নিখিল সরযুর প্রেম এতদিন ভুলিয়াছিল, মনে করিয়াছিল—বুঝি মাধুরীর মত ভালবাসা দিতে আর কেহ পারিবে না কিন্তু সরযুর ভালবাসা যে মাধুরীর চেয়েও শতগুণে শ্রেষ্ঠ! মাধুরী আমাকে পাইয়া, আমাকে দেখিয়া, আমার সহবাস করিয়া আমাকে ভালবাসিয়াছিল—আর সরযু যে না পাইয়া, না দেখিয়া, না সহবাস

করিয়া, চিরদিন তিলমাত্র উপকার না পাইয়া বরং ঘোরতর অপকার লাভ করিয়া যেরূপ ভালবাসা দিয়াছে, তাহা অতুলনীয়; মাধুরীর ভালবাসায় স্বার্থ ছিল, সরযূর ভালবাসা নিস্বার্থ;—কামনা-বাসনার গন্ধ নাই—ইহা স্বর্গের—মর্ত্ত্যে এমন ভালবাসা পাওয়া যায় না, হায়! আমি কি করিতে কি করিয়াছি! মহাপাপী আমি—এ দেবীর সহিত মিলন আমার মত হতভাগ্যের উপযুক্ত নয়! যদি কখন উপার্জ্জন করিয়া অর্থবান হইতে পারি—যদি কখন প্রাণের প্রকৃত ভালবাসা দেখাইয়া হৃদয়াসনে বসাইয়া এই দেবীর পূজা করিতে পারি—তবেই আমি সরযূর সম্মুখে দাঁড়াইবার উপযুক্ত, নতুবা আমি ইহার উপযুক্ত নহি! নিখিল চকিতের ন্যায় আসিয়াছিল—অন্ধকারময়ী রজনীর শেষযামে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া, কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া কোথায় পলায়ন করিল।

হরিষে বিষাদ হইয়া মহারাজা দুর্য্যোধনের যেমন অচিরে জীবন নাশ হইয়াছিল। আজ সরযূ বহুদিনের পর স্বামী সন্দর্শন পাইয়া হঠাৎ তাঁহার অদর্শনে তেমনি মরমে মরিয়া একেবারে নিরাশ হৃদয়ে শয্যাশায়িনী হইল আর উঠিতে পারিল না; অবশিষ্ট হাড় কয়খানা দারুণ শেলাঘাতে গুঁড়াইয়া পিষিয়া গেল। পরদিন বিনোদ কবিরাজ আনিয়া জানিল—তাহার জীবনের আশা কম—নাড়ীর গতি বড় খারাপ, বোধ হয় এ ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না। হইলও তাই—ক্রমশঃ তাহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। আহার দিলে আর খায় না—নিদ্রা তাহার চক্ষু হইতে চিরতরে

পলায়ন করিল ! শেষে কেবল প্রলাপ বকুনী আরম্ভ হইল—এলেন ত দাসীর শেষ দিন অবধি অপেক্ষা করিলেন না, আমি ত আর বেশী দিন তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতাম না, তবে কেন তিনি চলিয়া গেলেন—কটা দিন আর এ চিরদাসীর প্রতি দয়া করিয়া থাকিতে পারিলেন না ? হায়, আমি কেন নারী হয়ে জন্মেছিলাম ; জীবনের একমাত্র সাধ, পতিসেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম না ! প্রভু ! এ জীবনে ফাঁকি দিলে কিন্তু মরণ সময় এই আশা-বাতি বুকে করিয়া মরিতেছি, পরজীবনে যেন ও রাজীব পদে বঞ্চিতা না হই—যেন ওপদে চিরবিক্রীতা হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, সতীর গতি ভগবতী মা, আমাকে এবার সেই সৌভাগ্য দান করো !

সরযূ শয্যাশায়িনী—পাড়ার পাঁচজন এই স্বভাবসতী গুণবতী রমণীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া কত স্তোকবাক্য প্রদান করিতেছেন—কত বুঝাইতেছেন—সরযূ ! তুই ভাবিসনে—নিখিল আবার আসবে—আবার তোকে দেখবে ; সে বোধ হয় কোন কাজের জন্য হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে নতুবা সে ত এমন অবাধ্য নয় ! সরযূ তাহাদিগকে বলিল—তিনি অবাধ্য নন্ তবে অভাগিনীর ভাগ্যদোষে এমন হইয়াছেন। আমি কাঁদিবার জন্য জন্মিয়াছিলাম—চিরজীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেলাম। এখন তিনি যদি ফিরিয়া আসেন—আমাকে না দেখিতে পাইয়া আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যদি কাঁদেন—তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে হাসাইও—তাঁহার অশান্ত প্রাণে শান্তি দান করিয়া বলিও—সরযূ চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু অতৃপ্ত প্রাণ লইয়া গিয়াছে, পরজন্মে আবার তোমার দাসী

হইবে। তুমি কাঁদিও না এ কয়টা দিন এক প্রকার হাসিমুখে কাটাইয়া যাও—সরযূ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! তোরা দেখিস্ ভাই! তাঁর সুখের জীবন আমার মত দুঃখে দুঃখেই যেন কাটিয়া না যায়!

নিঃস্বার্থ প্রেমের পসরা লইয়া সরযূ কেবল এই কথা বলে—আর স্বামীর জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়; এ দৃশ্য যে দেখে, সেও প্রাণ ফাটা দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়; এ দৃশ্য, বিরহ-বিজড়িত এ বিষম চিত্র দর্শন স্ত্রীজাতির পক্ষে অসহ্য—তাই তাহার সমবয়সীগণ আসিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—সরযূ দিদি! তোর ভাগ্য বিধাতা কেন এমন নির্ম্মম হস্তে গড়েছিলেন, তুই যে চিরদিন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মর্‌লি—তার কি এই প্রতিফল! সরযূ ক্ষীণ প্রাণ লইয়া বেশী কিছু বলিতে পারিত না, কেবল বলিত—ভাই বিধাতার দোষ কি? তারপর নিজের কপালে হাত দিয়া বলিত—এ দোষ এই ভাগ্যের; পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় কাহারও প্রাণে এইরূপ দাগা দিয়াছিলাম—কাহারও বাড়া ভাতে ছাই ফেলিয়াছিলাম, তাই আমার এ জন্মে এত দুর্গতি! বেশী উত্তেজনা ভাল নয়, এ ক্ষীণ দেহে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা—তাই সকলে নীরব হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সে দিনের মত চলিয়া যাইত।

এইরূপে প্রায় একমাস গেল। জীবনের আর কোন আশা নাই, সরযূর বয়স খুব বেশী না হইলেও নিতান্ত কম নহে। মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ সমস্ত একে একে দেখা দিতে লাগিল। রামধন ও বিনোদ দিদির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—সরযূ ব্যতীত

আর যে তাহাদের কেহ নাই—হায়! দিদি তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে—আর তাহারা কাহার কাছে থাকিবে, কাহার নিকট আবদার করিবে—এ দেবীপুরে আর তাহাদের আপনার বলিতে কে আছে? প্রাণ যায় যায়, তথাপি সরযূর কোন কষ্ট নাই, মৃত্যু-কালীন জীবের যে সকল কষ্ট হয়—সরযূর আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তাহার কিছু বুঝিতে পারা গেল না! এ পুণ্যবতী সতীর আবার কষ্ট কিসের হইবে—পাপেই ত কষ্ট, পাপীই ত মৃত্যুর কোলে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; এ সাধ্ব্যাসতী পতিব্রতার পাপ কোথায় যে কষ্ট হইবে—এ যে পুণ্য-প্রতিমা, ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি, হিন্দু সতী! সতী-সিমন্তিনী ভগবতীর পাদপদ্ম যে ইহার বিশ্রাম স্থল—যমকিঙ্কর কি এখানে ঘেঁসিতে পাবে—তাই যাতনা প্রদান করিবে? তাহারা এ জলন্ত অগ্নিশিখার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না—তাই সতী মনের আনন্দে ধীরে ধীরে মাতৃপদতলে বিলীন হইবার চেষ্টা করিতেছেন—ইচ্ছা নাই, আরও একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য প্রাণ আন্‌চান্‌ করিতেছে, যদি একান্ত মরিতে হয়—মা, তবে আর একবার আমার বাঞ্ছিত ধনকে সম্মুখে আনিয়া দাও, আমি তাঁহার পাদপদ্ম বুকে করিয়া তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।

বাটীতে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই—এই বন্ধনের মধ্যে মরিতে তাহার প্রাণ চাহিতেছে না; প্রাণপাখী পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর পবিত্র কূলের খোলা বাতাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া মহামায়ার পদতলে চির বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিল। তাই সরযূ একদিন রামধন

ও বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন—ভাই! তোরা আমাকে ঘরে কেন মার্‌বি, এখন ত চৈত্র মাস—আমাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে চ না? রামধন ও বিনোদ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দিদি! তবে কি তুমি আমাদের মায়া একেবারে কাটালে?

সরযুর শেষ নিশ্বাস প্রশ্বাসটা যেন জোর বহিতেছে, তাই মনে করিয়াছিলেন—এই বুঝি শেষ, তিনি বলিলেন—ভাই! ভয় কি, ধর্ম্মপথে থাক, ভগবান রক্ষা কর্‌বেন, আমি এত চেষ্টা করিয়াও ত থাকিতে পারিলাম না, যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও—সময় হইলে থাকিবার ক্ষমতা নাই,—কি কর্ব্বো, তবে ধর্ম্মপথে কোন বিপদ নাই—হইলেও ভগবান উদ্ধারকর্ত্তা আছেন। কোন চিন্তা করিও না, দুই ভাইয়ে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার কর! আমি বিদায় হই।

রামধন ও বিনোদ দিদির শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিল না, তাহারা পাড়ার আরও কয়েকজন লোক ডাকিয়া সতী প্রতিমা সরযুকে দেবীপুরের বাধা ঘাটের চাঁদনীতে আনিয়া রাখিল। সতী সরযু মায়ের কুলে আসিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল—মা! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, অভাগিনী পতিতাকে কোল দাও!

তখন গঙ্গায় জুয়ার আসিয়াছিল—নদী কুলে কুলে ভরিয়া গিয়া তালে তালে নাচিতেছিল। যেন সরযুর মত পবিত্র সতী-প্রতিমার দর্শন পাইয়া, এরূপ সাধ্বী সতী বহুদিন তাঁহার কুল পবিত্র করেন নাই—ভাবিয়া, নদী যেন আজ আনন্দে ভরিয়া কুলে কুলে উছলিয়া—তাঁহার তরঙ্গরূপ হস্তে সতী সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে গঙ্গার দুর্গম জুয়ার ভেদ করিয়া একখানি নৌকা পালভরে দ্রুত আসিয়া সেই ঘাটে লাগিল। তরণীতে আরোহী বেশী ছিল না; একজন মাত্র প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর বেশে— আর একজন অতি দীন বেশ, জীর্ণ-শীর্ণ-কায় যুবক নৌকা হইতে নামিয়া ঘাটে উঠিল। সন্ন্যাসীর প্রশস্ত বদন হাসি রাশি ভরা— আর যুবক যারপর নাই ম্রিয়মান। সোপান বাহিয়া দুইজনে উপরে উঠিলেন।

সন্ন্যাসী নৌকা হইতে নামিয়া এই স্থানের পবিত্র সলিলা গঙ্গার শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সারিতে গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। তাঁহার কতদিনের লুপ্ত স্মৃতি যেন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সরযূকে গঙ্গাযাত্রা লইয়া পাড়ার যাহারা আসিয়াছিল—তাহারা চলিয়া গিয়াছে। কেবল রামধন ও বিনোদ তাহাদের প্রাণের দিদিকে খাটের উপর রাখিয়া দুইজনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। স্বর্গের এই মহাযাত্রী কখন তাহাদিগকে কি আদেশ করেন—অবনত মস্তকে তাহাই প্রতিপালন করিবে বলিয়া উৎকণ্ঠ হইয়া আছে! তাহারা জড়ের মত হইয়াছে, দিকবিদিক জ্ঞান নাই—ঘাটে কেহ আসিতেছে কি না সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই।

সন্ন্যাসী গঙ্গাগর্ভে আর যুবক উপরে উঠিয়া চাঁদনীর মধ্যে সেই দৃশ্য দেখিয়া—শোক বিহ্বল চিত্তে দৌড়িয়া গিয়া—রামধন, বিনোদ! একি! আমার সরযূ; আমার প্রাণের দেবী সরযূ, আমার ঘৃণিতা, উপেক্ষিতা, অনাদৃতা সরযূ কি আর নাই; হায়! হায় মূঢ়, পাষণ্ড

আমি হেলায় এ অমূল্য ; অপার্থিব ধন হারাইলাম ! বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল ! রামধন ও বিনোদ—এতক্ষণ দিদির মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিল—হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চিনিতে পারিয়া বলিল—রায় মশাই, রায় মশাই ! তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে, সেদিন আসিয়া অমন করিয়া চলিয়া না গেলে, দিদি এত শীঘ্র আমাদের ছাড়িয়া যাইতেন না ! ভাই ! এই কি তোমার ধর্ম্ম ; সহধর্ম্মিণী করিয়া তেত্রিশ কোটী দেবতা সাক্ষী রাখিয়া যাহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলে—তাহাকে এত হতাদরে বিদায় দিলে—ছি ছি ! করিলে কি ? জীবনে এ জিনিষ কি আর পাইবে ? আজ যাঁহারা ঘাটে উঠিলেন, তাঁহারাই যে আমাদের শ্যামানন্দ ও নিখিল, পাঠক বোধ হয় তাহা অবগত হইয়াছেন।

নিখিল।—বিনোদ, রামধন ! আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী—তোদের নিকট লাঞ্ছিত হবার, বিতাড়িত হবার উপযুক্ত পাত্র, তা এরপর করিস্ এখন বল্—সরযু কি আমাকে বাস্তবিক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ? আর এ জীবনে কি সে প্রাণের ধনের দেখা পাব না,—নিখিলের এ সময়কার মুখের ভাব ও চেহারা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য !

রামধন সাগ্রহে কাছে গিয়া ডাকিল—দিদি ! দিদি ! রায় মশায় এসেছেন, তুমি যা মনে করেছিলে—তাই হয়েছে ! সরযুর জীবন-প্রদীপ এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই—তবে তিনি মাতৃসমীপে আসিয়া একটু আনন্দানুভব করিয়া মনেপ্রাণে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন—তাই দেবতা সদয় হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

সেদিন কাশীতে যখন শ্যামানন্দের সহিত নিখিলের দেখা হয় উভয় ভ্রাতায় দেখাদেখি, চেনাচেনী হইয়া যখন নিখিল দাদার নিকট নিজ অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা বলে, তখন তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন—ছোটবউ মা কোথায়! নিখিল বলিয়াছিল—তাহার অবস্থা খারাপ; আমি অভাবগ্রস্ত বলিয়া আর তাহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্যামানন্দ মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—এই জন্যই কি এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলে নিজ অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ, তাহার যত্ন করিতে পার না, চল দেখি—বলিয়া সেইদিনই তাঁহারা একেবারে দেবীপুরের দিকে রওনা হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে শ্যামানন্দ সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া উপরে আসিলেন, মর্ম্মপীড়িত নিখিল হৃদয়ভেদী কাতরস্বরে বলিল—দাদা! আর দেবীপুরে যাইতে হইবে না। এই পাষণ্ড হতভাগা ভ্রাতার অনাদরে অবহেলায় ঐ দেখ, তোমাদের সংসার-ললাম, ফুটন্ত কুসুম কৃতান্ত-কীট দষ্ট হইয়া কিরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রাণের সরযূ আজ শ্মশান শয্যায়! দাদা দাদা! আর কিসের জন্য। বড় কষ্টে, বড় দুঃখে, বড় মর্ম্মযাতনায় সতী চলিয়া গিয়াছে; দাদা! দাদা! আমিও আজ গঙ্গার পবিত্র সলিলে এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া দেখি, যদি উহার সঙ্গলাভ করিতে পারি। এই বলিয়া নিখিল অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া জলে ঝম্প প্রদানোদ্যোগ করিতে লাগিল।

শ্যামানন্দ তাহাকে বাহুবেষ্টন করিয়া বলিল—নিজে দোষ করিয়া এখন অত উতলা হইলে চলিবে কেন ভাই! স্থির হও দেখি—মা আমার ফাঁকি দিয়াছেন কি না?

নিখিলের প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর তাহাতে ছিল না; কাজেই প্রাণহীন দেহ লইয়া একধারে বসিয়া রহিল। শ্যামানন্দ আসিয়া রামধন ও বিনোদকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন—নাড়ীর অবস্থা এখনও কোন প্রকার গোলমাল হয় নাই। তিনি নানা প্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা সরযূর তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপকে তৈলসিক্ত করিলেন! শাক্তভক্ত নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে আবার মহাযাত্রার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। সরযূর রোগ ত তাদৃশ কিছু ছিল না, তবে আশাহীন হইয়া তিনি ক্রমশঃ মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছিলেন—আশা গেলে প্রাণের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই ভাবে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন।

শক্তিসেবক শ্যামানন্দ—মাতৃনাম মহামন্ত্রের অমোঘ শক্তি দানে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিলেন। সরযূ কোঠরগত চক্ষু মেলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার পুজনীয় স্বামী ও দেবোপম তেজো ভাস্বর তাঁহার নয়নের সম্মুখে; পাংশুবর্ণ অধরের জ্যোতি মৃদু হাসি রাশিতে বিস্ফারিত হইল।

তখন সন্ধ্যাকালে সকলে গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিল—সন্ন্যাসীর এই অসীম ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—এ তাহাদেরই চির পরিচিত অমর আজ শ্যামানন্দ হইয়া এই অপূর্ব্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। নিত্যানন্দপুরের জমীদার রতনবাবুও আসিয়াছিলেন—বহুদিনের

পর অমরকে দেখিয়া—তাঁহার এই অসীম শক্তি সামর্থ বুঝিয়া—তাঁহাকে পুনরায় গ্রামে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাদের বাস্তুভিটা তিনি এখনি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। শ্যামানন্দ কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিলেন—আচ্ছা! বউমাকে একবার কালীঘাট দেখাইয়া আনিয়া বসন্তপুরেই আসিব। আমি এখন আর এক স্থানে স্থায়ী হইতে পারিব না, তবে যাহাতে আপনাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকে—তাহার একটা ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া সেই দিনই সেই নৌকা করিয়া সকলে কালীঘাট চলিয়া গেলেন। গঙ্গাযাত্রার রোগী ফেরৎ হইলে—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তীর্থ দর্শন করাইয়া গৃহে যাইতে হয়—ইহাই নিয়ম।

পঞ্চম খণ্ড।

(১)

একমাস কলির মহাতীর্থ কালীঘাটে বাস করিয়া শ্যামানন্দ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ সহ নিজের জন্মভূমি বসন্তপুরে আসিয়াছেন। জন্মভূমি সকল তীর্থের সার,—তাই শ্যামানন্দ বসন্তপুরে আসিয়া আপন সাধন-পীঠ কালীন্দিতটের সেই পুরাতন ভগ্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহা পড়িপড়ি করিয়াও এখন পড়ে নাই, বোধ হয় এই মহা সাধককে অঙ্কে ধারণ করিবার জন্য আশান্বিত হইয়া সে এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রতনবাবু নরেন্দ্রনাথের উপরই বিরক্ত ছিলেন—তাহার দাম্ভিকতা দেখিয়া বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য এত শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু অমর ও নিখিলের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার জাতক্রোধ ছিল না; তিনি কতবার অমরকে ডাকিয়া তাঁহাদের ভদ্রাসনে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু অমর তাহা করেন নাই। •এখন শক্তিশালী অমরকে পাইয়া রতনবাবু আর ছাড়িতে পারিলেন না, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে তথায় গৃহাদি

নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামের শান্তিবর্দ্ধন করিতে বলিলেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়েও তিনি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

শ্যামানন্দের শক্তিময় দেহ, কান্তিময় তেজপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া তিনি একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন—কিছুতেই তিনি তাঁহাকে ছাড়িলেন না। পাড়ার বর্ষীয়সী স্ত্রী পুরুষ সকলেই অনুরোধ করিল—বাবা! যখন এসেছিস—তখন বাপের ভিটে বজায় রাখ, আহা! বামনদাস দাদার বংশ—তোদের দেখলেও পুণ্য হয়! তুই এতদিন চলে গেছলি—তথাপি এই পবিত্র গৃহে একজন পাগলিনী সন্ন্যাসিনী কয়েকদিন আসিয়াছিল—সে কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না; সে ঠিক যেন আমাদের মেজো বউয়ের মত, তবে অঙ্গে ভস্ম মাখিয়াছে—গেরুয়া পরিয়াছে বলিয়া চেনা যায় না! আহা! এমন বরাৎ কি হবে বাবা! সে সতী সাবিত্রী আবার ফিরে আসবে—মানুষ মরে কি আবার বেঁচে আসে, বাবা! সে আশা আর নাই—তবে ছোট বউমাকে যখন বাঁচিয়েছ, তখন এইখানে থেকে ঘর সংসার কর! সকলেরই আশা অমর ও নিখিল এই বসন্তপুরে পুনরায় ঘর বাড়ী করে—অবস্থান করে। আর জমীদার রতনবাবুও নাছোড়বান্দা হইয়াছেন। এমন একটা পবিত্র বংশ গ্রাম হইতে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তবে নরেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছিলেন! এক্ষণে সে নাই—যে দুইটী ভাই আছে—তাহারা অতি ধার্ম্মিক এবং সৎ, বিশেষতঃ অমরেন্দ্রের সহিত গ্রামের সম্পর্ক থাকিলে—

ইহার পবিত্রতা যে বৃদ্ধি হইবে—সে বিষয় নিঃসন্দেহ! তিনি তাঁহাকে গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

অমর বলিলেন—যদি এখানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার স্বদেশ সেবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে—তাহা হইলে আমি একস্থানে স্থায়ী না হইলেও সময়ে সময়ে এখানে আসিব—কিছু দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইব। রতনবাবু বলিলেন—আমি তাহাতে রাজী আছি; দেশের উপকারের জন্য কোন একটী ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা! তবে উপযুক্ত লোক পাইতেছি না বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি নাই—তুমি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে বল—আমি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী আছি।

সে সময় হুগলী জেলার অবস্থা তত উন্নত না হইলেও তথায় ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। বহু লোক আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। এ সময় এখানে একটী আতুরাশ্রম স্থাপিত করিলে মন্দ হয় না। চিকিৎসার জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নতুবা পীড়ার সময় দেশের লোককে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, এমন কি চিকিৎসাভাবে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্যামানন্দ রতনবাবুকে এই অভাবটী পূরণ করিতে বলিলেন।

রতনবাবু বহুদিন হইতে এইরূপ সঙ্কল্পই করিয়াছিলেন—কিন্তু উপযুক্ত পরিচালক পান নাই বলিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শ্যামানন্দের মুখে উক্ত প্রস্তাব শুনিয়া তিনি আনন্দসহকারে

মত প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নামে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন। শ্যামানন্দ তাহাতে প্রথমে অমত করিলেন, বলিলেন—আমি এখন আর গৃহবাসী নাহ, আমার নাম কোন একটা কার্য্যে জড়িত থাকুক, এমন ইচ্ছা আমার নহে! উক্ত আশ্রম রতনবাবুর নামেই স্থাপিত হউক। শ্যামানন্দ থাকিতে,—তাঁহার মত একজন শক্তিশালী সাধক থাকিতে রতনবাবু কিছুতেই মত দিলেন না। শেষে সকলের অনুরোধে "অমর-নিকেতন" নাম দিয়া একটী অতুরাশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। নিখিল তাহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইলেন।

নিখিল দেশে থাকিয়া—যাহাতে দেশের উন্নতি হয়—দেশের লোক সৎস্বভাব সম্পন্ন হয়—স্বাবলম্বী হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে—তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তখন দেশ এত সুসভ্য এবং বিলাসী হয় নাই, তখন গৃহে গৃহে চরকা ছিল—স্ত্রী পুরুষ সকলেই এ সকল কাজে অভ্যস্ত ছিল, তাহার উপর জমীদারের উৎসাহ পাইয়া তাহারা সকলেই জাতীয় ব্যবসায় মনোনিবেশ করিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে একজন পাশ করা ভাল ডাক্তারের দরকার—নতুবা হাতুড়ের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, কঠিন রোগ হইলে তাহারা সহজে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া রোগীকে হেলায় যমের মুখে তুলিয়া দেয়, এইজন্য একজন ভাল পাশ করা ডাক্তার ও একজন বিচক্ষণ বৈদ্য আবশ্যক। হুগলী সুগন্ধা গ্রাম হইতে একজন বিচক্ষণ বৈদ্য পাওয়া গেল কিন্তু ডাক্তার কলিকাতা হইতে

না আনিলে হইবে না। নিখিল কলিকাতার ঘুণ ছিলেন, তিনি রতনবাবুর অনুরোধে কলিকাতায় আসিলেন। ঔষধাদি খরিদ করিয়া তিনি একদিন বহুবাজারের রাস্তা ধরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন যুবক তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—মাষ্টার মশাই! ভাল আছেন; এখন কি আর আপনি কলিকাতায় থাকেন না; আমি বহুদিন ধরিয়া আপনার অনুসন্ধান করিতেছি!

নিখিল যুবককে চিনিতে পারিয়া শশব্যস্তে বলিলেন—দেবেন! ভাল আছ, তোমার মা গৌরীদেবী ও ভগ্নী মনোরমা কেমন আছেন?

ডেপুটী ব্রজেশ্বরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিলাত গিয়াছিল—তথায় হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু কাজ কর্ম্ম কোথাও মিলিতেছে না এবং নিজের অবস্থাও এখন তেমন নয় যে কলিকাতা সহরে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত ডাক্তারখানা খুলিয়া নিজের পশার প্রতিপত্তি জমাইয়া লইবে। গৌরীদেবীর হাতে যৎসামান্য টাকা আছে, তাই এখনও কোন প্রকারে কলিকাতায় থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে কিন্তু আর বেশীদিন তাহা থাকিবে না, দেবেন্দ্রনাথ কিছু উপায়-উপার্জ্জন করিতে না পারিলে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। তাই সে কোন ডাক্তারখানায় চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতেছে।

আজ বহুদিনের পর হঠাৎ মাষ্টার মহাশয়ের দেখা পাইয়া সে প্রাণের সমস্ত কথা বলিল—মায়ের স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইয়াছে, নানা

প্রকার চিন্তায় তিনি বিশেষভাবে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ভগ্নীটীও আমাদের গলগ্রহ হইয়াছে! শীঘ্র কিছু উপায়-উপার্জ্জন না হইলে তাহাদের অবস্থার ব্যবস্থা থাকিবে না।

দেবেন্দ্র ভাল ডাক্তারী শিখিয়াছে, বিলাত হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছে। আর তাঁহারও একজন ডাক্তারের দরকার—এ অবস্থায় অন্য চিকিৎসক না রাখিয়া উহাকেই নিযুক্ত করা বিধেয়, ইহাতে জননীসমা গৌরীদেবীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে। এক সময় তিনি জননার মত আমাকে না দেখিলে এতদিন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিত না।

নিখিল বলিলেন—দেবেন্দ্র! আমি মেজদার সহিত একজন জমীদারের সাহায্যে দেশে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছি; ইহার সমস্ত ব্যয়ভার জমীদার মহাশয়ই বহন করিবেন। সেইজন্য আজ ঔষধাদি কিনিতে এবং ভাল একটা চিকিৎসক লইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। তোমার সহিত দেখা হইয়া খুব ভালই হইয়াছে, তুমি কি ঐ ডাক্তারখানার কর্ত্তৃত্বভার লইতে ইচ্ছা কর! এক্ষণে মাসিক ৫০৲ টাকা পাইবে,—বাহিরের ডাকও যথেষ্ট আছে, তাহাতেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হইবে; বাসস্থানের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ পাইবে, তাহাতে তোমার জননী ও ভগ্নীকে লইয়া থাকিতে পারিবে!

দেবেন্দ্র চাকুরীর জন্য বড় কষ্ট পাইতেছিল। খুব আশা করিয়া অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ডাক্তারী শিখিয়া আসিল কিন্তু কলিকাতার ন্যায় সহরে ত কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করে না; এখানে কত বড় বড় ডাক্তার আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে অবস্থান করিয়া পশার

জমাইয়াছে। সহরবাসীর দেবেন্দ্রের মত এমন অর্থহীন আড়ম্বরশূন্য ডাক্তারকে পছন্দ হইবে কেন? তাই দেবেন্দ্র হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে ভগবান তাহার মাষ্টারকে মিলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহার মুখে আশার বাণী শুনিয়া, তিনি একটী ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকুরী দিতে পারেন জানিয়া বিশেষ বিশেষ আপ্যায়িত হইল, বলিল—মাষ্টার মশাই! এক্ষণে আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইতে খুব রাজী আছি; আপনি আমাকেই বাহাল করুন। আমি অদ্যই আপনার সহিত যাইব।

নিখিল।—আচ্ছা! তবে তাই হইবে—আজ আর যাওয়া হইবে না; ঔষধ ও যন্ত্রাদি সমস্ত ক্রয় করি চল; তারপর কাল একত্রে তোমার জননী ও ভগ্নীকে লইয়া হুগলী যাইব! তোমার মা ও ভগ্নী যাইতে চাহিবেন ত?

দেবেন।—মাষ্টার মশাই! মা আপনাকে ছেলের মত ভালবাসেন, আপনার সঙ্গে একত্র থাকিব—ইহা শুনিলে তিনি কিছুতেই অমত করিবেন না।

নিখিল।—আচ্ছা! তাহাই হইবে—চল এখন সমস্ত দ্রব্যাদি খরিদ করি, তারপর তোমাদের বাড়ী আজ রাত্রে অবস্থান করিয়া কাল সকালে রওনা হইব।

কলিকাতা সহর আর নিখিলের ভাল লাগে না। এই ধূমধূলি ধূসরিত, কোলাহল আকুলিত সহরে নিখিল আর কিছুতেই থাকিতে ইচ্ছা করেন না। এইস্থানে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এখন পল্লীজননীর নিভৃত শান্তিময় কোলে থাকিয়া ধর্ম্মভাবে দেশের ও

দশের সেবা করিয়া গণা দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারিলেই তিনি জীবন সার্থক বিবেচনা করেন। সহরের উন্নতিকে তিনি এখন আর উন্নতি বলিয়া মনে করেন না; এ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে থাকিয়া ধর্ম্মহীন প্রলোভনময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা, নির্জ্জন পল্লীবাসে আপনার স্বজাতীয় সেবা করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আনন্দে কাল কাটান সহস্র গুণে ভাল!

সেদিন দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া নিখিল জননীসমা গৌরীদেবীর ভবনে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন, গৌরীদেবী বলিলেন—বাবা! তোমাকে আমি আমার বড় ছেলের মত মনে করি, আমাদের এখন যা করিলে মান বাঁচে—প্রাণ রক্ষা হয়—তা তুমি কর। নিখিল বলিলেন—দেখুন যখন ডাক্তারী শিখে এসেছে, আর কলকাতায় পশার জমাতে পারছে না, তখন পল্লীগ্রামে যাওয়া একান্ত দরকার, আমাদের হুগলী জেলায় বহু লোকের বাস—একবার পশার করতে পারলে বরাত খুলে যাবে, আর ভাবতে হবে না। তার উপর একটা আয় ত বাঁধা রইলই—এর তো আর নড়চড় হবে না?

গৌরী।—সেই ভাল বাবা! চল আমরা সেইখানেই যাই; এখানে আত্মীয় স্বজন না পেয়ে যেন সকলে মনমরা হয়ে আছি, বিশেষতঃ মেয়েটার অদৃষ্ট ভেঙ্গে যাওয়া অবধি আর কোথাও নড়তে পায় না; দিন দিন এই বদ্ধ হাওয়ায় আবদ্ধ থেকে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; পল্লীগ্রামে গেলে একটু খোলা হাওয়া পেলেও ওর প্রাণটা জুড়োয়!

নিখিল।—হ্যাঁ মা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে, কলকাতার এই বায়ুতে থেকে প্রাণ যেন সদাই ম্রিয়মাণ, দেহে কিছুমাত্র সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। সেখানে প্রাণে আনন্দ পাওয়া যায়—এখানকার চেয়ে সেখানকার জল বায়ু ভাল, মনোরমা সেখানে থাকলে শান্তিলাভ কর্ত্তে পারবে, আর আমাদের নারীগণ তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে সাথী হইলে ইহজীবনে সুখ ও পরজীবনে শান্তিলাভ কর্ত্তে পারবেই পারবে!

গৌরী।—বাবা, আমার আর অমত নাই, যাহাতে কালই যাওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা কর।

মনোরমার প্রাণ এখন ধর্ম্মময় হইয়াছে। বাল্যকালে পিতার শিক্ষায় সে এক প্রকার বিগড়াইয়া যাইতে বসিয়াছিল। এক্ষণে স্বামী বিয়োগের পর সে মাতার অধীনে আসিয়া, তাঁহার সুশিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া বুঝিয়াছে যে বিধবা জীবনে ব্রহ্মচর্য্যই অবশ্য করণীয়, তাহা হইলে দেবতা সন্তুষ্ট থাকিবেন, পরজন্মে এইরূপ বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। আর পল্লী-জীবন অতি সুখকর, সেখানে কোনও প্রলোভন নাই—নরনারীগণ সকলে ধর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করে—তাহাদের সহবাসে থাকিলে জীবন ধর্ম্মময় হইবে, বিশেষতঃ তাহার শিক্ষক মহাশয় যখন সেখানে থাকিবেন—তাহা ত অতি পবিত্র, শুনিয়াছি ইঁহার সহধর্ম্মিণী খুব পতিব্রতা সতী; তাঁহার নিকট কালক্ষেপ করিতে পারিলে—প্রাণে আর কোন প্রকার সঙ্কোচ, কোন প্রকার অশান্তি আসিতে পারিবে না, এখন আমাদের যে অবস্থা তাহাতে

এই ব্যয়বহুল কলিকাতা সহর ছাড়িয়া পল্লী-জননীর কোলে আশ্রয় লওয়াই উচিত। মনোরমা সরল চিত্তে জননীর মতে মত দিল। আগামী কল্য প্রাতঃকালে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইলেন। ভৃত্য বৈদ্যনাথ গৃহস্বামীকে বলিয়া আসিল—আগামী কল্য তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া দিবে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে কলিকাতা ছাড়িয়া হুগলী রওনা হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ জননী ও ভগিনীসহ যে একটী সুন্দর বাসগৃহ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা রতনবাবুর বাটীর খুব নিকটে। সেখান হইতে চিকিৎসালয় মাত্র দুই মিনিটের পথ! শ্যামানন্দ ডাক্তারটীকে অতি অল্পবয়স্ক যুবক এবং বিশেষ কর্ম্মঠ দেখিয়া সুখী হইলেন—ইহার দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য যে খুব ভালরূপ চলিবে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তাহার উপর পাশ করা ডাক্তার, সকল প্রকার রোগ নির্ণয় করিতেও তিনি সক্ষম হইবেন। দেবেন্দ্র পরদিন প্রাণপণে সমাগত রোগীগণকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, রোগীগণ তাঁহার সরল ও সুন্দর ব্যবহারে সকলেই সুখী হইল।

(২)

অমর-নিকেতনে আসিলে ধনী দরিদ্র সকলেই বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। তবে যাহারা অনাথা—যাহাদের কেহ নাই—পথ্যাপথ্যের ভাল ব্যবস্থা হইবে না, তাহারা আরোগ্য না হওয়া অবধি এখানে চিকিৎসিত হইবে এবং বিনামূল্যে পথ্য

ও থাকিবার স্থান পাইবে। যাহাদের অবস্থা ভাল—তাহারা ডাক্তার মহাশয়কে ইচ্ছা করিলে গৃহে লইয়া যাইতে পারিবেন, তাহার জন্য স্বতন্ত্র দর্শনী আবশ্যক।

রতনবাবুর এই কার্য্যে ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া এবং স্বামী শ্যামানন্দের এই কার্য্যে সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। নিখিলের জন্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মিত হইল, তিনি সরযূ, রামধন ও বিনোদকে লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সতী সরযূ স্বামীকে পাইয়া সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইলেন, দিন দিন সে কঙ্কালসার দেহ আবার কান্তিপুষ্ট হইয়া পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। মন ও শরীর লইয়া মানুষ—মনের অসুখে শরীরের অসুখ, শরীরের অসুখে মনের অসুখ। মন ভাল হইলে রোগ থাকে না, মনই রোগের মূল, মন অশান্তির আগার হইলে মানব দেহ নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। দুশ্চিন্তায় শরীর মাটী হয়—সৎচিন্তায় দেহ সৌন্দর্য্যময় হইয়া থাকে—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য! যাহার মনে দুশ্চিন্তা নাই—সদাই যাহার মন আনন্দপূর্ণ—দীর্ঘজীবন লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। এইজন্য সাধু সন্ন্যাসীগণ কান্তিপুষ্ট দেহে আনন্দময় প্রাণে অনেকদিন বাঁচিয়া থাকেন।

এখন মনোরমার প্রাণের সঙ্গিনী হইয়াছেন—সরযূ! মনোরমা প্রত্যহ আহারাদির পর পল্লীর নিভৃত পথে বৈদ্যনাথকে সঙ্গে করিয়া সরযূর নিকট আসেন, সমস্ত দুপুরবেলা দুইজনে নানা প্রকার গৃহশিল্পে নিযুক্তা থাকেন, তারপর বেলা পড়িবার মুখে বৈদ্যনাথ আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। সরযু ও মনোরমা প্রত্যহ

চরকায় সুতা কাটেন—তুলা পেঁজেন, তাহাতে পৈতা প্রস্তুত করেন। অবশিষ্ট সুতা তাঁতির বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া আনেন। স্বহস্ত প্রস্তুত এই পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিতে তাঁহাদের কত আমোদ—কত আহ্লাদ; দুইজনে আবার সময়ে সময়ে বাজী রাখিয়া সুতা কাটেন—কাহার কেমন ভাল সুতা কাটা হয়, সেই ভাল সুতায় সরযূ স্বামীর কাপড় বুনাইয়া আনেন—মনোরমা ভ্রাতার জন্য কাপড়ের দাদন দেন। এইরূপে তাঁহারা দুইজনে অতি অল্পদিনের মধ্যে সংসারের কাপড়ের খরচ কমাইয়া দিয়াছিলেন।

নিখিল এখন আর চাকুরীর জন্য কাহারও দুয়ারে ঘুরেন না, পল্লীগ্রামে চাষ আবাদে মন দিয়াছেন। রতনবাবুর সাহায্যে প্রায় দুইশত বিঘা জমী গ্রহণ করিয়া তাহাতে এমন আবাদ করিতেছেন—যে তাঁহাতে তাহার সংসার চলিয়াও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হয়। একটী পুষ্করিণী করিয়াছেন—তাহাতে যথেষ্ট মাছ জন্মিয়াছে। আবাদের জন্য ভাল গরু ও লাঙ্গলও আছে—তাহার উপর গো-যানের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। চারিদিকে সুন্দর বাগান—আবশ্যকীয় শাকসব্জী ও ফল ফুলে মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। এজন্য তাঁহাকে এখন আর কোন দ্রব্যের জন্য কাহারও প্রত্যাশী হইতে হয় না, অথচ সুন্দর টাটকা দ্রব্যাদি আস্বাদে দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্ষেত্রের ধান্য গোলাজাত করিয়া দুই তিন বৎসরের চাউল সংগ্রহ করতঃ অবশিষ্ট হাটে বিক্রয় করিয়া নিখিল অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের পতিত জমী সকল

তত্ত্বাবধানের ভার- লইয়া প্রতিপাল্য শ্যালকদ্বয়ের অন্ন সংস্থান করিয়া দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ধনী হইয়া উঠিলেন—বসন্তপুরে সকলেই আবার তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। তিনি দরিদ্রের মা বাপ, এমন দয়ালু, দরিদ্রের বন্ধু আর কেহ নাই—তিনি যথার্থই বামনদাস বাবুর সুপুত্র বটে! কেহ খাইতে না পাইলে—অন্নাভাবে পতিত হইলে নিখিল কিম্বা সরযুর নিকট আসিলে তাহাদের অভাব মিটিয়া যায়। এইরূপে দরিদ্রকে অন্নদান করিয়া তাঁহারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ধনী কাহাকে বলে—কতকগুলা রৌপ্য নির্ম্মিত রূপার চাক্তী থাকিলেই পূর্ব্বে ধনী আখ্যায় আখ্যায়িত হইত না। যাহার ঘরে মা লক্ষ্মী বাঁধা—গোলাভরা চাল, মরাইভরা ধান আছে আমাদের মতে তিনিই বাস্তবিক ধনী—মা লক্ষ্মী ত তারই ঘরে বাঁধা—নতুবা কতকগুলা স্বর্ণালঙ্কার ও রজতখণ্ড কি ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে, না তাহাতে যথার্থ ধনের কার্য্য হয়? মহা দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গিয়াছে—রত্নালঙ্কার তুচ্ছ করিয়া অতি বড় ধনীও অন্নের কাঙ্গাল হইয়া অকাতরে তাহা বিলাইয়া দিয়াছে। তাই বলি টাকা যথার্থ ধন নহে—হিন্দুর নিকট গো-ধন ও ধান্য-ধনই মহাধন!

নিখিলের দেখাদেখি—দেবেন্দ্রনাথও কিছু জমী লইয়া চাষ আবাদে মনোনিবেশ করিলেন। বঙ্গদেশে লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া নাম কিনিতে হইলে—যথার্থ ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে—মা ধরিত্রীর শরণাপন্ন হইয়া চাষের কাজে মন দিতে হইবে—তাহা

হইলে আর অভাব বলিয়া কোন জিনিস থাকিবে না। এখন আমরা এই সকল কাজে অবহেলা করিয়া, গৃহশিল্পে জলাঞ্জলি দিয়াই ত লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। হায়! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে থাকিয়া আজ আমাদের আট দশ টাকা চাউলের মণ কিনিতে হইতেছে, আর ছয় সাত টাকা জোড়া কাপড় কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে! আমাদের বুদ্ধি বিপর্যায় হইতে আরও যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—তাহা কে বলিতে পারে!

সৎকার্য্যে একবার যদি আসক্তি ঝাড়িয়া যায় তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। জগতে আসিয়া মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল শৃগাল কুকুরের মত নিজের পুত্র কলত্রে পরিপোষণ করিলেই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হইল না। বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া মানুষ যে ধরার শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া জন্মাইয়াছে, ইহার পর যে তাহারা দেবত্বের অধিকারী হইবে—তাহা কি পশুর মত ব্যবহার করিয়া? মানুষের মত হৃদয়কে বড় করিয়া—পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া মানুষ মানুষ হয়—ত্যাগ ও সংযম ব্যতীত মানুষ কখন দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অনাবিল প্রেম, গভীর আনন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারী হইতে হইলে, মনে নির্ম্মল-মধুর সুখের আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে—হৃদয়কে বড় করিতে হইবে, ছোট ঘরে বাস করিয়া বড় হইবার আশা দুরাশা—শ্যামানন্দ প্রতিদিন রতনবাবুকে এই সকল উপদেশ দানে তাঁহার চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাই আজ রতনবাবু ত্যাগ ও সংযমের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া "অমর-নিকেতনে" প্রাণাহুতি দিতেও

কাতর হইতেছেন না। দারিদ্রের জন্য তিনি এখন অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এইজন্য তাঁহার অর্থাগমও যথেষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে জমীদারীর মধ্যে চাষ আবাদ ভাল হইত না, দরিদ্র প্রজাগণের হাহাকার ঘুচিত না—এখন প্রতি বৎসর সুবৃষ্টি হইতেছে, চাষ আবাদ ভাল হইতেছে, প্রজাগণ ধাম্মিক জমীদারের কর কড়া-ক্রান্তি আদায় দিয়া তাঁহার সৎকার্য্যে সাহায্য করিতেছে! ধর্ম্মের দিকে একবার নিস্বার্থভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলে—সরল প্রাণে কাজ আরম্ভ করিলে—তাহাতে কখন কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয় না, সৎকার্য্যের সহায় ভগবান তাহা চালাইয়া দেন।

আজ "অমর-নিকেতন" আনন্দ-ভবনে পরিণত হইয়াছে, যেরূপ রোগীই হউক না, এখানে আসিয়া চিকিৎসাপ্রাপ্ত হইলে সে সত্বর নিরাময় হইয়া যায়। রতনবাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠায় এজন্য তাঁহার খোসনাম অতি অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন—ধন সঞ্চয়ে সুখ নাই—তাহার সদ্ব্যয়ে অপরিমিত সুখ—অতুলনীয় আনন্দ, এই অসীম আনন্দ লাভের পরামর্শদাতা তাঁহার গুরুস্থানীয় শ্যামানন্দ স্বামী! শ্যামানন্দ নিশ্চয়ই দেবতা!

নিখিল এখন ভুলেও আর চাকুরীর কল্পনা মনোমধ্যে স্থান দেন না। চাকুরী যে গুখুরী—তাহা এখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন—তাহাতে প্রাণে শান্তি থাকে না, মনের স্বাধীনতা-বৃত্তি একেবারে লোপ পায়—মানুষকে পশুরও অধম করিয়া ফেলে—ব্রাহ্মণত্বের হানি করিয়া দেয়! স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে—নিজের

পায়ে নিজে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে—সুখ কোথায়! আজ মেজো দাদার কৃপায় তাঁহার অতুল সুখের উৎস চারিদিকে খুলিয়া গিয়াছে; তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন চারিটী ডিক্রীধারী, কলেজের অধ্যাপক নিখিল কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত—চাষার দেশে আজ চাষবাস করিয়া অতুল সুখের অধিপতি! এ সুখ, এ নির্ম্মল আনন্দ পল্লীভবনে স্বাধীনভাবে না থাকিলে মিলে না।

সরযূ এতদিন যেমন অসুখে দিন কাটাইয়াছিলেন—মা ভগবতী তাঁহাকে তেমনি অতুল সুখের অধিকারিণী করিয়াছেন। দাস দাসী, রাখাল, গোপাল, আত্মীয় স্বজন লইয়া আজ তাঁহার সংসারে আনন্দের তুফান বহিতেছে; যেদিকে চাও কোনদিকে কষ্টের নাম মাত্র নাই, তথাপি সরযূর মন সময়ে সময়ে যেন কিছু বিমনা হইয়া থাকে—ভাবেন যাঁহার জন্য এত সুখ, এত শান্তি,—সেই পতিপ্রাণা, সতী সিমন্তিনী দিদি সাবিত্রী কোথায়! এ সুখের সময় তিনি থাকিলে যে কি সুখ হইত—তাহা তিনি চিন্তা করিয়া সীমান্তে আনিতে পারেন না! হায়! প্রাণের দিদিকে কি আর দেখিতে পাইব না, তাঁহার পদতলে বসিয়া এ সুখের সময় ধর্ম্মের সেই প্রাণমাতান উপদেশ বাণী কি আর শুনিতে পাইব না? সরযূ-হৃদয়ের অন্তস্থল গভীর বিষাদে দারুণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এ সুখময় অবস্থাকে সময়ে সময়ে দুঃখ-গরলে মাখামাখি করিয়া তুলিত। প্রাণের সঙ্গিনী মনোরমা সতীর সে ভাব দেখিয়া বলিত—আমারও হতভাগ্য কারণ যাঁহাকে তুমি দেবী বলিয়া মান--যিনি এত গুণবতী ছিলেন—আমার এ সময়ে তাঁহাকে

পাইলে ধর্ম্মের আরও কত মনোহর উপদেশ লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইত।

নিখিল আদর্শ সংসার পাতিয়াছেন আজকাল বাঙ্গালা দেশে এমন পবিত্র সংসারের ছায়া-শীতল সহবাসে বাস করিতে মনে কত ইচ্ছা হয় কিন্তু হায়! সেদিন কি আর আসিবে? সোণার বাঙ্গালার সংসার কি আবার সেরূপ প্রাণারাম ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়া স্বর্গের শান্তিধারা বর্ষণ করিবে—বৃথা আশা! আমরা যেরূপ অধঃ-পতনের তলে নামিয়াছি, তাহাতে মনে হয় না যে আর উঠিব; তবে সাড়া পড়িয়াছে, কি হয় ভগবান জানেন!

শ্যামানন্দ চলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া গিয়াছেন—আবার আসিব। শ্যামানন্দ দেশের কাজে পাগল—দেশের উপকার করাকেই তিনি প্রকৃত সাধনা বলিয়া মনে করেন—তাই আজীবন তিনি এই কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজের যিনি সাহায্যকারিণী প্রধান মন্ত্রী সেই সাবিত্রী থাকিলে এত যন্ত্র বোধ হয় আরও ভালরূপ চলিত—শ্যামানন্দ ত প্রাণ দিয়াছেন—সাবিত্রীও প্রাণ দিলে দেশের রমণীমণ্ডলে কত উপকার হইত,—কিন্তু হায়! তিনি ত আর ইহসংসারে নাই!

শ্যামার মা প্রভৃতি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণ বলিত—আমরা গ্রাম ত্যাগ করিবার পর একজন পাগলী ঠিক সাবিত্রীর মত আমাদের পুরাতন ঘরের দাওয়ায় আসিয়া এক একদিন উৎপাত করিত—ধরিতে গেলে পালাইয়া যাইত; তবে কি সাবিত্রী জীবিতা আছে, না সেটা কেবল তাহার প্রেতাত্মা; আসক্তির বশে এখনও মায়া-

মমতা ছাড়িতে পারে নাই তাই দেখা দিতে আসে? সাবিত্রী কি তবে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে? না না তা কখন হইতে পারে না—অমন সতী কি কখন ঐরূপ কষ্টকর কুৎসিৎ দেহ ধারণ করিতে পারে!

শ্যামানন্দ বসন্তপুর ছাড়িয়া কালীঘাটে আসিয়াছেন—সরযুকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে কয়দিন মায়ের ছেলে মায়ের কাছে আসিয়াছিলেন কিন্তু কোন আব্দার করা হয় নাই, মায়ের কাছে আদায়-উসুল করবার যে তাঁহার অনেক জিনিস এখনও বাকী আছে! তাই তিনি আজ নির্জ্জনে এখানে আসিয়াছেন কিন্তু আসিয়া অবধি সাবিত্রীর কথা অনবরত তাঁহার প্রাণে জাগিয়া চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করিতেছে। এতদিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন সে আবার নূতন ভাবে আসিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আসন পাতিয়া বসিল কেন? জন্মভূমি দর্শনে কি তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে? শ্যামানন্দ যতই ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, স্মৃতি যেন তাঁহার প্রাণে ততই গাঢ় হইয়া জাঁকিয়া বসে—এ ত বড়ই বিপদ দেখিতেছি; স্থান ত্যাগ করাই উচিত কিন্তু সম্মুখে অর্দ্ধোদয় যোগ, মায়ের কোলে বসিয়া এই যোগে যোগাবলম্বন করিয়া মাতৃময় প্রাণে গৌহাটীর "সাধন-মন্দিরে" প্রস্থান করিবেন—এই ইচ্ছা; এইজন্য এখনও কলিকাতায় রহিয়াছেন।

আগামী কল্য অর্দ্ধোদয় যোগ—কলিকাতা সহর লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, বিশেষতঃ কালীঘাটে এত লোক জমিয়াছে যে তিল ধারণের স্থান নাই। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক

আসিয়া মায়ের মন্দিরে সমবেত হইয়াছে। বহু জন্মার্জ্জিত পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের এই আশা—মহাপীঠ কালীঘাটের আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্বজননীর মুক্তিমূলাধার পাদপদ্ম দর্শন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইবে—মানব-জন্ম সার্থক করিবে!

কত সাধু সন্ন্যাসী, যতি ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন—আবার কত চোর জুয়াচোরও এই অবসরে কিছু লাভবান হইবে ভাবিয়া ভদ্র-বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে! চোর, গাঁটকাটা, বদ্‌মাইসেরও অভাব নাই, ভগবানের বিশ্ব-চিরিয়াখানার এই লীলা-ক্ষেত্রে কত রকম লোক যে কত রকম মতলবে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে—তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য!

আর্জ অর্দ্ধোদয় যোগ; প্রাতঃকাল হইতেই কালীঘাট মনুষ্য-পদভরে টলমল করিতেছে, মায়ের মন্দিরে কত সাধন, ভজন, যোগ, পুরশ্চরণ হইতেছে; কত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইতেছে; গঙ্গার ঘাটে কত স্ত্রী পুরুষ ছোট ছোট পুত্র কোলে করিয়া স্নান করিতেছে; শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ প্রহরীর অভাব নাই। যখন ঘাটে খুব ভিড় হইয়াছে, ঘেষাঘেষি, ঠেলাঠেলিতে প্রাণ যায়; শ্যামানন্দ স্নান সমাপন করিয়া মন্দিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক জননী-ক্রোড়স্থিত একটী বালকের গলার হার কাটিয়া লইয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জননী পুত্রের গলার হার দেখিতে না পাইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পুলিশ আসিল—পুলিশের কীর্ত্তি চিরদিন অব্যাহত—তাহারা অনেক সময়ে ঠিক দোষীকে

ধরিতে না পারিয়া নির্দ্দোষীকে ধরিয়া প্রহার করে, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আনিয়া লোকের মনোকষ্টের কারণ হয়। এ ক্ষেত্রেও হইল তাই! নিকটে একটা হাবা-গবা স্ত্রীলোক বসিয়াছিল—ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ভেবাচেকা লাগিয়া গিয়াছিল, একটু ভিড় কমিলেই সে স্নান করিয়া চলিয়া যাইবে। স্ত্রীলোকটী অতি দরিদ্রা প্রায় পাগলের মত, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়—খুব ভদ্রঘরের মেয়ে—অবস্থা-বৈগুণ্যে এমন হইয়াছে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত অথবা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তাহার তেজ দেখিলে তাহাকে খুব ভালঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়। পুলিশ আসিয়া তাহাকেই জুলুম করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী বড়ই বিব্রত হইয়া সকলের শরণাপন্ন হইল কিন্তু এ জগতে দরিদ্রের সহায় কয়জন হয়! তাহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ বেশী; দরিদ্র ত চুরি করে—যাহার কিছু নাই সেই ত চোর—মানুষের ইহাই ধারণা; কাজেই পুলিশের সহিত তাহারা যোগদান করিয়া নিরপরাধিনীর উপর জোর জুলুম করিতে লাগিল। আর সে কেবল কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—বাবা! আমি কিছু জানি না—আমি চুরি করিতে আসি নাই—তোমরা কেন আমাকে বৃথা সন্দেহ করছো!

সে কথা শুনেই বা কে, আর বুঝিবার শক্তিই বা কার আছে। দরিদ্র যেমন চিরদিন লাঞ্ছিত হইয়া থাকে এ স্ত্রীলোকটীও সেইরূপ হইল, এইবার পুলিশ বুঝি সকলকে সাক্ষী রাখিয়া তাহার হাত ধরে! শ্যামানন্দ কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন—সমস্ত দেখিয়াছেন—

কাজেই অন্যায় অত্যাচার তাঁহার সহ্য হইল না তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন—তোমরা কেন ঐ ভদ্রলোকের মেয়েকে বৃথা কষ্ট দিতেছ, চোর ঐ পালাইতেছে দেখ; সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পাহারাওয়ালা দৌড়িয়া গিয়া যথার্থ দোষীকে ধরিল—ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকটী ঘোমটায় বদন আবৃত করিয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাণে তাহার কিছুমাত্র ভয় নাই—তবে দশটাকা মাহিনার পাহারাওয়ালা,—তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই—এই বা ভয়!

চোর-স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া ঘটনাস্থলে আনা হইলে শ্যামানন্দ দেখিয়া অবাক হইলেন—এঁ্যা, এ কে—এ যে দাদার বাড়ীর ঝি ক্ষীরোদা; হুঁ হতভাগী, এখনও এ স্বভাব ছাড়িতে পারে নাই! মহাজনেরা যে বলেন—"স্বভাব মলেও যায় না," তা ঠিক, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—হতভাগী ক্ষীরি, তুই বুড়ো হয়ে মর্ত্তে যাস্ তবু সে স্বভাব ছাড়তে পারলিনি! ধরপাকড় করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে বামাল বাহির হইয়া পড়িল। পুলিশ আর তাহাকে ছাড়িল না, হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিল। সুন্দর কাপড়ে চোপড়ে সজ্জিতা হইয়া বড়লোকের স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া চুরি করতঃ শেষে হাতকড়ি পরিয়া তাহাকে জেলে যাইতে হইল। অনেক অভদ্র এইরূপ ভাবে ভদ্রবেশে লোকের সর্ব্বনাশ করে—বেশ ভূষায় ভদ্রলোক দেখিয়া কেহ কখন অপরিচিতকে বিশ্বাস করিও না।

স্ত্রীলোকটী বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—প্রভু! আপনি না থাকিলে আজ

এ অনাথিনীর কি দুর্গতি হইত; আমার আর গঙ্গাস্নানে কাজ নাই—আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে এই জনতা পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়! আমার কেহ নাই—আমি একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী থাকি, তাঁহাদের গিন্নী আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

রমণীর নম্রতা, তাহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া শ্যামানন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ স্ত্রীলোককে এমন স্থানে রাখা উচিত নয়! তিনি তাহার কথায় ভিড় ঠেলিয়া কালীঘাটের বাহির করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। রমণী সাধুর পরোপকারিতা দেখিয়া চরণে প্রণিপাত করিবার সময় মুখের আবরণ খুলিয়া গেল। শ্যামানন্দ সে বদন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ বদন যে চিরদিনের পরিচিত—এ বদন চন্দ্রিমা যে তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত—তবে কি এ আমার সাবিত্রী! না না, তাহা কেমন করিয়া হইবে—সে স্বর্ণ-প্রতিমা যে আমি স্বহস্তে নদীজলে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছি। সে যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে; এ সে নয়—তাহারই মত আকৃতি প্রকৃতি হইতে পারে। জগতে ত এক রকমের লোক অনেক আছে? একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—তারপর মনে করিলেন—আমি সন্ন্যাসী, পরস্ত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আমার লাভ কি? তথাপি মন যেন সে আশা ছাড়িতে পারিল না, স্ত্রীলোকটীর পরিচয় লইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। শ্যামার মার কথা কি তবে ঠিক, সাবিত্রী কি তবে জীবিতা!

শ্যামানন্দ সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগা ; তোমার কি কেহ নাই—তোমাদের বাড়ী কোথায় ছিল? স্ত্রীলোকটী কিয়ৎক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া গভীর দুঃখে ভীষণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি কি এমন ছিলাম, এক সময় আমি রাজার রাণী ছিলাম—আমাদের বাড়ী বসন্তপুরে ; অবস্থা খারাপ হয়ে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, জানি না কেন, আমি গঙ্গায় ভাসিতে ছিলাম। এই বাড়ীর গিন্নী দয়া করে—আমাকে এনে মেয়ের মত মানুষ করেছেন। আর বেশী কিছু শুনিবার দরকার হইল না, শ্যামানন্দের অনুমান সত্য, ভগবান তাঁহার প্রতি সদয়। তিনি অধীর প্রাণে, পরম পুলকিত চিত্তের বিষম আগ্রহে বলিলেন—সাবিত্রী ! সাবিত্রী !! প্রাণের সঙ্গিনী ! তুমি জীবিতা, আমার শূন্য প্রাণের আশার আলোক, হৃদয় গগনের ধ্রুবতারা, প্রাণময়ী, তুমি জীবিতা, মা তোমাকে দয়া করিয়া জীবন দান করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর দেহ ভস্ম বিলেপিত ; বদন শ্মশ্রুজাল মণ্ডিত—দেহের বৈলক্ষণ্যও অনেক হইয়াছে, তারপর বহুদিন দেখা নাই—কণ্ঠস্বরও ভারি ভারি হইয়াছে, কাজেই রমণী চিনিতে পারেন নাই ; এইবার তাহার প্রাণময়কে ভাল করিয়া দেখিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—এতদিন চিরদাসীকে ভুলে কোথায় ছিলে নাথ ! আমি যে সারা হুগলী জেলাটা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি !

শ্যামানন্দ।—সাবিত্রী ! তোমার মৃত্যুর পর দাদার দুর্ব্যবহারে আমি দেশত্যাগ করিয়াছিলাম ; আর এখানে থাকি না—জানি তুমি নাই, তবে আর কার জন্য সংসার, আমি গুরুর আদেশে গৌহাটীর
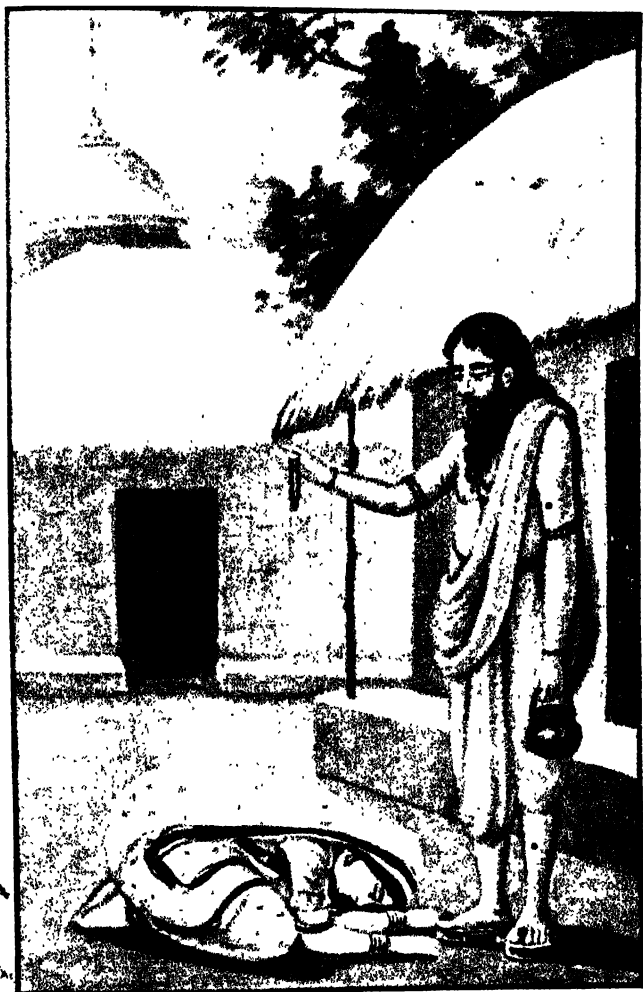
সাবিত্রী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

(৩২৬ পৃষ্ঠা

কামরূপে "সাধন-মন্দির" স্থাপন করিয়া অধিকাংশ সময় সেইখানেই অবস্থান করি—দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবনের গণাদিন কটা কাটাইয়া দিব—এই আশা, কিন্তু কিছুদিন হইল—প্রাণ অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়—কলিকাতায় মায়ের বাড়ী আসিয়াছিলাম। কিন্তু মা যে আমাকে হারানিধি হাতে দিয়া এ অভাবনীয় আনন্দ দান করিবেন, তা ভুলেও ভাবি নাই!

এমন সময় বাড়ীর কর্ত্রী আসিয়া পড়িলেন—সাবিত্রী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত্ত করিয়া জননী স্বরূপা কর্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন, কর্ত্রী সাবিত্রীর মন্দ ভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া বড় দুঃখ করিতেন—তিনিও সময়ে সময়ে অমরের জন্য যথায় তথায় লোক পাঠাইতেন কিন্তু অমর যে এখন শ্যামানন্দ হইয়াছেন, সহজে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া?

শ্যামানন্দের দেহ জ্যোতি, তাঁহার সাধন-সিদ্ধ সুন্দর বদন প্রতিভা দেখিয়া বুঝিলেন—যেমনি স্ত্রী তেমনি তার স্বামী! তিনি সাগ্রহে তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। গৃহী সন্ন্যাসীকে পাইলে এইরূপ আগ্রহই প্রকাশ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক বৃদ্ধা রমণীগণের নিকট ইঁহাদের আদর বড় বেশী; আর শ্যামানন্দ জগতের আদরণীয় বস্তু, হিন্দুব্রহ্মচারিণী বৃদ্ধার নিকট যে আদর পাইবেন—এর আর বেশী কথা কি?

ঘরের দাওয়ায় আসন প্যাতিয়া দিয়া বৃদ্ধা সমস্ত পরিচয় লইতে লাগিলেন। যাকে তাকে ত অমর বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না, সাবিত্রী যদি ভুলই করে কিন্তু তাঁহাকে ত বিশেষ বিবেচনা করিতে

হইবে? শ্যামানন্দ গ্রাম ত্যাগের পর হইতে বদরীনাথের পথে অরুণাচলে যোগানন্দের কৃপায় সিদ্ধলাভ; তারপর গৌহাটীতে আসিয়া সাধন-মন্দির স্থাপন এবং কাশীতে আসিয়া কনিষ্ঠের সন্ধান করিয়া স্বগ্রামে "অমর-নিকেতন" নামে অনাথাশ্রম স্থাপন প্রভৃতির কথা বলিলেন—তাঁহার বড়দাদা স্বর্গগত হইয়াছেন। এবং বড়বউ ও পাঁচু কামরূপে আছেন—ইত্যাদি সমস্ত কথা বলিলেন। সাবিত্রী সে পাদপদ্ম দেখিয়া—তাঁহার বাম পার্শ্বের সে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া—এবং সমস্ত পরিচয় শুনিয়া ইনি যে তাঁহার প্রাণের দেবতা সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বৃদ্ধাও একবার কেদার-বদরীর পথে যাইয়া অরুণাচলে ভগবান যোগানন্দের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সাধু মহাত্মা না হইলে অপর কেহ স্থান পায় না। অমরের মুখে এই সকল শুনিয়া তাঁহারও সন্দেহ নিরাকরণ হইল।

আজ অসীম অনন্ত আকাশতলে—কালীঘাটে শ্যামামায়ের এ সাধনপীঠে, এই শুভ অর্দ্ধোদয় যোগের দিনে স্বামী-স্ত্রীর এ অপূর্ব্ব মিলন অতি মনোহর, অতি প্রাণারাম—অতি পবিত্র, অতি মধুর, বিশ্ব-জননীর অনন্ত পৃথিবীতলে এ মঙ্গল-মিলন বাস্তবিক অপার্থিব, মধুর ভাবে পূর্ণ! স্বামী বিরহে সাবিত্রীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, তিনি পাগলিনীর ন্যায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এথা-সেথা ছুটাছুটী করিতেন, কখনও কখনও প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইতেন—বৃদ্ধা কেবল মায়ের মত তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছেন! আজ তাঁহার সেই নিস্বার্থ ভাবে সাবিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ সার্থক হইল!

অর্দ্ধোদয় যোগের পর বৃদ্ধার আদর আপ্যায়নে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দ পত্নীসহ পুনরায় বসন্তপুরে আসিলেন। সরযূ প্রাণের মেজদিদিকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন—সকল কার্য্যে তাঁহার যেন অসীম বল বৃদ্ধি হইল। মনোরমা সরযূর মুখে এ দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন—কিন্তু চক্ষে দেখেন নাই—আজ স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলেন—সাবিত্রী দেবীই বটে; সরযূর বর্ণনা সমস্তই সত্য; আকৃতি প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাবে সাবিত্রী দেবীর আসনে উপবেশন করিবার কিছুতেই অনুপযুক্তা নহেন।

(৩)

নিখিল অজীবন এই দেবীর দয়ায় প্রতিপালিত। তিনি জননীর ন্যায় ত্যাগস্বীকার করিয়া নিখিলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তথাপি এমন নিস্বার্থ ভাব যে কখন নিজের নাম করেন নাই, সব বড়দি ও বড় ভাসুর করিয়াছেন। এরূপ ভাব যে হৃদয়ে স্থান পায়—তাহা কত উচ্চ, কত মহান, কত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ! বড়বউয়ের চক্রান্তে পড়িয়া একদিন এই দেবীকে তিনি অবহেলা করিয়াছিলেন। নিখিল কত মহাপাপ করিয়াছেন—তাই আজ নিতান্ত সন্তাপিতের ন্যায় আসিয়া মেজোবউদির পদতলে পড়িয়া বলিলেন—দেবী! তোমার পুত্রসম নিখিলের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর; আমি নিতান্তই ভুল করিয়াছিলাম বলিয়া আজ মরমে মরিয়া যাইতেছি!

সাবিত্রীর প্রাণে কখন খলতা কপটতা নাই—তিনি হাতে

ধরিয়া প্রাণের নিখিলকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—ভাই, মানুষ চিরদিন ভ্রমের ভ্রমরা ; তাই সুযশ-মধু তাহারা আহরণ করিতে পারে না, দেবতারাই যখন ভ্রমে পড়িয়া আত্মহারা হন—তখন মানুষ কোন ছার ; আর তুমি নিজে ত কোন দোষ কর নাই—পরের নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে—তাহাতে তোমার প্রতি আমি কোন প্রকার অসন্তুষ্ট হই নাই—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরদুঃখিনী ভগিনী সরযূকে লইয়া সুখে সংসার কর, ভ্রম সংশোধন করে— পবিত্র শ্বশুরকুল উজ্জ্বল কর।

সাবিত্রীর জন্য প্রতিবাসী সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। বংশটী নষ্ট হইতে বসিয়াছিল—আবার ভগবানের কৃপায় তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সকলেই ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, একে একে আবার সকলেই আসিয়া জুটিতেছে ; দুঃখের সংসার আবার সুখের সংসারে পরিণত হইতেছে। চিরদুঃখিনী সাবিত্রীর জন্য সকলেই দুঃখ করিত, শ্যামার মা প্রভৃতি রমণীগণ সরযূকে লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার বিষয় আলোচনা করিত!

আজ ভগবান তাহাদের সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, সর্পাঘাতে বিগতপ্রাণ সাবিত্রী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিল। সকলেই বলিল—আহা! মা ; আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল—তোকে দেখে আমাদের যে কত আনন্দ হচ্ছে তা আর বল্‌তে পারিনা,—সাবিত্রী সকলের পায়ের ধূলা লইলেন।

রতনবাবু এখন সেবাব্রতে বেশ লাগিয়া গিয়াছেন। দশের সেবায়

তাঁহার প্রাণে একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিদিন সকল কার্য্য ছাড়িয়া অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা, আতুরাশ্রম ও চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। অর্থের যত আবশ্যক হইতেছে, অকাতরে তিনি তাহা প্রদান করিতেছেন। গ্রামবাসী তাঁহার সেই বদান্যতা দেখিয়া, পরোপকারে তাঁহার ঐকান্তিক ত্যাগস্বীকার দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মানুষ চায়—যশ, চায়—খ্যাতি-প্রতিপত্তি—সকলেই ত আর ত্যাগমূলক কার্য্যে অভ্যস্থ হইয়া জন্মায় নাই? এই জন্য দেশের বড় লোকদিগকে সাধারণ কাজে নামাইতে হইলে আগে তাঁহাদের বড় করিয়া তুলিতে হয়—সুযশ সত্বে, খ্যাতি-প্রতিপত্তির লোভ দেখাইতে হয় নতুবা কোন কাজ হয় না।

ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের জননী গৌরীদেবীর বয়স হইয়াছে। তিনি এখন আর অন্তপুরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না; অভাব হইলে রোগীগণের পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে, তাহাদের দুঃখ কষ্টে মায়ের মত সেবা করিতে বাহিরে আসেন। এতবড় ডেপুটীর গৃহিণী আজ দরিদ্রের চক্ষুজল মুছাইতে, সন্তানের ন্যায় তাহাদের সেবা করিতে ক্ষিপ্রহস্তা। আজ তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, প্রাণে সেবা-ধর্ম্মভাব জাগিয়াছে; এতদিন স্বামীর ভয়ে তিনি কিছু করিতে পারিতেন না, এখন পুত্রের অধীনে আসিয়া তিনি সে বাসনা পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। দেবেন্দ্র ইহার জন্য জননীকে কিছু বলেন না বরং উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন! মানব জীবনের ইহাই যে মোক্ষ

কর্ম্ম—বিলাত ফেরৎ দেবেন্দ্র সাধু সহবাসে থাকিয়া আজ তাহা ভাল-রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। মনোরমা এখন সরযুর সঙ্গিনী, সে খায় দায়—আর সরযুর সহিত সুতা কাটে—এই কার্য্যে তাহার হাতে বেশ দুই পয়সা হইয়াছে; অথচ নিজেদের পরিবারের কাপড় আর বাজার হইতে কিনিতে হয় না। সংসারে কত সাশ্রয় হইয়াছে—সামান্য পরিশ্রমে সংসারের একটা মহৎ খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে।

"অমর-ভবন" বেশ চলিতেছে—ইহার আর কোন অভাব হইবে না; নিখিল পরমুখাপেক্ষী না হইয়া পল্লীবাসে নিজের অবস্থা খুব সচ্ছল করিয়া লইয়াছেন। এখন অপর কেহ সাহায্য না করিলেও নিখিল নিজেই দাদার নাম রাখিতে পারিবেন—"অমর-ভবন" সমভাবে চালাইতে পারিবেন। ডাক্তার ও কবিরাজটীও ঠিক জুটিয়াছে; তাঁহারাও কেবল স্বার্থের বশবর্ত্তী না হইয়া পরার্থের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; সকলই মায়ের দয়া—এ জগতে তিনি না চালাইলে কিছু কি চলিতে পারে? তাঁহার কৃপায় অচলও সচল হয়, আবার তাঁহার দয়ার ব্যতিক্রম হইলে সচলও অচল হইয়া পড়ে। তাঁহার কৃপায় পঙ্গু যখন গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে; বোবা যখন কথা কহিতে পারে—তখন এ সামান্য বিষয় না চলিবে কেন? তাঁহাকে মনে করিয়া, তাঁহার পদে মতি রাখিয়া চেষ্টা করিলে—"অমর-ভবন" জগতে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে!

শ্যামানন্দ বহুদিন আসিয়াছেন আর এখানে বসিয়া থাকা ভাল নয়, সেখানে পাঁচু ও রামানন্দ কি করিতেছে। "সাধন-মন্দির"ও

তাঁহার প্রাণের জিনিস—হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথমে ইহার জন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, মনে করিলে এখনও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। চা-বাগানের সাহেব জমীদারগণ তাঁহাকে ইহার জন্য প্রাণে মারিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; এখানে চা-বাগান করিবে বলিয়া কতবার তাঁহার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সাধক সাধনবলে হৃদয়ের অসীম সাহসভরে—কিছুতেই পশ্চাদপদ না হইয়া—মাতৃনাম মহামন্ত্রে সকল শত্রুকে জয় করিয়াছেন। এখন সেই সাহেব জমীদারগণ শ্যামানন্দের নাম শুনিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠে; তাঁহার কোন কার্য্যে আর বাধা দিতে তাহারা সাহস করে না।

শ্যামানন্দ বহুদিন হইল—এই প্রাণের "সাধন-মন্দির" ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে কি হইতেছে না হইতেছে, দরিদ্র-নারায়ণের কোন কষ্ট হইতেছে কি না দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছে কাজেই আর এখানে থাকা যায় না।

আর কতদিন তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। জীবনের গণাদিন যে ফুরাইয়া আসিল, এইবার গুরু সন্নিধানে গিয়া—সন্ত্রীক নিজের কাজ একটু করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন—যাহার জন্য সময়ে সময়ে প্রাণ অশান্তিতে ভরিয়া যাইত, শান্তিময় ভগবান তাঁহার সেই চিরশান্তিময়ী মনোরমা পত্নী সাবিত্রীকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য পাইলে কার্য্যে আর কোন প্রকার বাধা বিপত্তি থাকে না। অসংযমীর পক্ষে স্ত্রীজাতি

পতনের মূল হইলেও সংযমীর পক্ষে রমণীসঙ্গ কোন দোষের নহে—তাহাতে পাপের দ্বার রুদ্ধ হইয়া পুণ্যের দ্বার চিরমুক্ত হইয়া থাকে! যাহারা বুঝে না; রমণীর রমণীয়তা—তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি সামর্থ অনুধাবন করিবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই স্ত্রীজাতিকে সাধন কার্য্যে পতনের মূল বলিয়া মনে করে! কিন্তু শাক্তসাধক বলেন—রমণী জননী, মাতৃশক্তি সমভাবে বিস্তৃত থাকিলে সাধন ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভের কোন প্রকার ভয়ভীতি থাকে না।

শ্যামানন্দ এইবার অরুণাচলে সস্ত্রীক যাইয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইবেন, যখন সাধন-মন্দিরে ও অমর-ভবনে তাঁহার ভাঙ্গা বাগান জোড়া লাগিয়াছে, সকল আত্মীয় একত্র মিলিয়াছেন—পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি আবার অক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? শ্যামানন্দ সস্ত্রীক গৌহাটী যাইবার ইচ্ছা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। রতনবাবু বলিলেন—অমর! তুমি চলিয়া গেলে, আমরা এ সমস্ত চালাইতে পারিব কি?

শ্যামানন্দ বলিলেন—"আমি আমার" এ সকল কথা ছাড়িয়া দিন। মায়ের কাজ মা চালাইবেন—আমরা তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস—দাসের মত থাটিব। এইভাব মনে থাকিলে—কোন কাজই আটকাইবে না। "বাস্তবিক জগতে মা না করাইলে আমরা কি কিছু করিতে পারি?" আমরা সামান্য কীটাণু এত বড় একটা মহৎ কাজ চালাইবার শক্তি আমাদের কোথায়? মহাশক্তির নিকট শক্তি প্রার্থনা কর, প্রভূত শক্তি পাইয়া অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারিবেন!

রতনবাবু আর কিছু বলিলেন না! নিখিল ও সরযু কিন্তু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই দেবদেবী সদৃশ দাদা ও বউদিকে ছাড়িয়া দিতে, তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ সাবিত্রীকে যে আর পাইবার আশা ছিল না—ভগবান যদি দয়া করিয়া এতদিনের পর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন ত এত শীঘ্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে? "এঁড়ে-লাগা" মেয়ে যেমন মাকে আঁকড়াইয়া ধরে; সরযু তেমনি করিয়া সাবিত্রীকে ধরিল। সাবিত্রী আদর করিয়া বলিলেন—ছোটবউ! তোর এক অনাছিষ্টি আবদার, আজ বই কাল ছেলের মা হবি, এখনও তোর ছেলেমানুসী গেলনা? আমি যাচ্ছি কোথা, আর ত মরতে যাচ্ছি না যে এত ভয়, তোর ভাসুরের সঙ্গে যাচ্ছি, সেখানকার সমস্ত একবার দেখে আসি; তুই পোয়াতি না হইলে সঙ্গে নিতাম! এখন আমি দেখে আসি, বড়দি ও পাঁচু কেমন আছে; তারপর তুই যাস্, আর না হয়—আমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্বো—অত ভাবছিস্ কেন?

মেজদির আশ্বাসবাণী শুনিয়া সরযু একটু আশ্বস্ত হইল। শ্যামানন্দ ছোট ভাইয়ের অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—ভাই! মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমার উপরে পতিত হইয়াছে; তুমি পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছ; আর পতনের ভয় নাই! প্রত্যহ গৃহদেবতার পূজা করিও—তাহা হইলে আর আপদ বিপদ থাকিবে না। দাদার কথা দেবতার কথা মানিয়া নিখিল আশ্বস্ত হইল!

পরদিন সকলের নিকট বিদায় লইয়া শ্যামানন্দ ও সাবিত্রী সাধন-মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

কর্ত্তা না থাকিলে স্বভাবতই কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। অধীনস্থ জনগণ তাঁহার মত আর কাহাকেও ভয় করিয়া কাজ করে না; কর্ত্তার মত সকলদিক বজায় রাখিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া আর কেহ কাজ করিতে পারে না! যদিও পাঁচু এ সকল কার্য্যে বিশেষ পরিপক্ক হইয়াছে; এবং তাহারই উপর ভার দিয়া শ্যামানন্দ দেশভ্রমণে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর হইতে পাঁচুর মাতা সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হওয়ায়—সেও আর মাকে রাখিয়া এসকল কার্য্যে তত মনোযোগ দিতে পারে নাই। সন্তানের পক্ষে মাই যে সব, তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় বিরত হইয়া পাঁচু অন্যদিকে মন দিবে কেমন করিয়া? বিশেষতঃ কাকা এখানে নাই—মায়ের কিছু ভালমন্দ হইলে যে বিষম ভাবনার বিষয়!

পাঁচুর এই বিষম ভাবনার মধ্যে শ্যামানন্দ সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পাঁচু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং তাহার জননীসমা মৃতা খুড়ীমাকে শশরীরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ চিত্তে কাকীমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বহুদিনের পর সাবিত্রী প্রাণের পাঁচুকে কোলে লইয়া জুড়াইলেন—ছোট ছেলেটী এত বড় হইয়া কাজের লায়েক হইয়াছে, দেখিয়া তিনি সোহাগ-ভরে মুখচুম্বন করতঃ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পাঁচুর মুখে বড়বউয়ের অসুস্থ সংবাদ শুনিয়া শ্যামানন্দ তাড়া-

তাড়ি ঘরে গিয়া বলিলেন—বড়বউ, একি অসুখ হয়েছে, এখন কেমন আছ?

বড়বউ সখেদে বলিলেন—আর ভাই! এখন যাইতে পারিলেই বাঁচি; আর কতদিন এমন করে থাক্‌বো, এ অসুখ আর সার্‌বে না, গ্রহিণী ধরেছে! তবে তুমি এলে ভাল হলো! সাধক, তুমি আমার শেষের একটা ব্যবস্থা করে দাও।

শ্যামানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন—শুধু আমি নয় বউদি! তোমার দাসীও এসেছে!

বড়বউ কিছু বুঝিতে পারিল না—দাসী কে ঠাকুরপো! বুঝিতে পারিলাম না।

শ্যামানন্দ বলিলেন—মেজোবউ এসেছে!

অম্বিকা ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিল না, মনে করিল—ঠাকুরপো বুঝি আবার এতদিন পরে বিবাহ করিয়া একটী বধূ আনিয়াছেন! তাই অবাক হইয়া রহিল।

বড়বউয়ের বিস্ময় দেখিয়া শ্যামানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বড়বউ! তুমি যা মনে করছো, তা নয়—মরা সাবিত্রী আবার ফিরে এসেছে; সে এতদিন জীবিতা হইয়া কালীঘাটে ছিল!

বিস্ময়-আনন্দে অম্বিকাদেবী অধীরা হইয়া অত অসুখেও বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পাঁচুর সহিত সাবিত্রী গৃহে প্রবেশ করিলেন। অম্বিকা অতীব আগ্রহের সহিত উঠিপড়ি করিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন—প্রাণের ভগিনী, সাবিত্রী, দিদিমণি আমার—একদিনের জন্যও আমি তোমাকে ভালকথা

বলি নাই, আদর করি নাই—আজ তোমাদের আশ্রয়ে আসিয়া—তোমাকে আদর করছি!

সাবিত্রী বড়বউয়ের সে জীর্ণ শীর্ণ দেহ দেখিয়া প্রাণে যারপর নাই কষ্ট অনুভব করিলেন, ইতিমধ্যে স্বামীর মুখে তাঁহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া প্রাণে ঘোর ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর সরল প্রাণ ত কাহারও দুঃখ দেখিতে পারে না, তা সে শত্রু হউক, আর মিত্র হউক, অথবা তাঁহাদের শত্রু মিত্র কেহ নাই! সাবিত্রী অতি নম্রভাবে বলিলেন—বড়দি! আমাদের আশ্রয়ে তুমি, না তোমার আশ্রয়ে আমরা! গিন্নীর আশ্রয়েই ত সংসার থাকে—যখন তুমি বড় জীবিতা আছ, তখন আমরাই তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছি—তুমি আমাদের আশ্রয়ে নও! ছোট চিরদিনই ছোট, সে বড়কে কখন আশ্রয় দিতে পারে না—আশ্রয়ে থাকিতে চায়! তুমি অমন কথা বলো না বলিয়া—সাবিত্রী বড় জায়ের পদধূলি লইলেন। শ্যামানন্দকে পাইয়া সকলেই আপ্যায়িত হইল—দরিদ্রগণ তাহাদের পিতৃসম শ্যামানন্দকে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া পুলকপূর্ণ হৃদয়ে চরণে প্রণাম করিল। তারপর আহারাদি হইয়া গেলে সকলে একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এতদিনের প্রাণের বোঝা—সুখ দুঃখের কত কথা—তাহা কি আর সহজে ফুরায়!

অম্বিকা অতি বিস্ময় সহকারে বলিলেন—আচ্ছা ঠাকুরপো! তবে মেজোবউ যে মরিয়াছিল—তুমি এমন অলক্ষুণে কথা কেন বলেছিলে। তুমি বুঝি তার কিছু খোঁজ কর্ত্তে না, কেবল ধর্ম্ম নিয়ে থাকতে?

শ্যামানন্দ।—না বড়বউ! সাবিত্রী মরেছিল ঠিক—তবে সর্প বিষে জর্জ্জরিত দেহ ত দাহ করিতে নাই—জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—তাহাতেই বোধ হয় বিষক্রিয়া নাশ হয়েছে?

অম্বিকা।—তা কি কখন হয়—মরা মানুষ কি বাঁচে,—এ সকল কেবল তোমার গাফিলাতি ভাই।

শ্যামা।—না বউ তুমি জান না; কবিরাজী শাস্ত্রে বলে—অপান বায়ু দেহে বর্ত্তমান থাক্‌লে প্রাণ ফিরে পাওয়া যায়—মরা মানুষও বাঁচে?

পাঁচু বালক, সে এত পড়িয়াছে শুনিয়াছে কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য বিষয় কোথাও দেখে নাই—তাই সে তাহার মহাপণ্ডিত সিদ্ধ-সাধক কাকার কাছে জিজ্ঞাসা করিল—সে কেমন করে হয় কাকা! বুঝিয়ে দিন না।

শ্যামা।—ত্রিগুণে সৃষ্টিস্থিতি লয় হয় জান ত?

পাঁচু।—আজ্ঞে হাঁ; তা জানি—এতে মরা বাঁচার কি আছে?

শ্যামা।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; সত্ত্ব, রজ, তম; অথবা বায়ু পিত্ত কফ। রজগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন—সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পালন করেন, আর তমোগুণে মহেশ্বর নাশ কার্য্যে ব্যস্ত। ইহা বেদের কথা! আর আয়ুর্ব্বেদ বলেন—বায়ু ব্রহ্মা—পিত্ত বিষ্ণু,—আর কফ হচ্ছেন—মহেশ্বর! বায়ুই জীবন—যতদিন বায়ুর প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন জীব মরিবে না। প্রাণই বায়ু—পঞ্চ বায়ুই জীবের জীবত্ব, ইহাতে জীবের স্থিতি—বায়ু নিশ্বেসিত হইলেই জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। পঞ্চপ্রাণরূপী বায়ুর মধ্যে

অপান বায়ু শরীরে বদ্ধ থাকিলে—জীব মরিয়াও পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়। পিত্তদ্বারা তাহা পরিপুষ্ট হয়, তারপর কালে কোন পীড়ায় কফ সংযুক্ত হইলেই নাশ হইয়া থাকে! অতএব কফের প্রাধান্য হইলেই ভয়ের কারণ! বিষক্রিয়ায় অপান বায়ু প্রায় বাহির হয় না, এজন্য প্রাণের আশা থাকে বলিয়া—ইহাতে দাহ করিতে নাই—জলে ভাসাইতে হয়! পাঁচুর এ বিষয়ে ভ্রম ছিল, কাকা তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি কথায় বার্ত্তায় কাটিয়া গেল—ভাল নিদ্রা হইল না।

প্রাতঃকালে শ্যামানন্দ সাধন-মন্দিরের সেবাকার্য্যে যে সমস্ত গলদ হইয়াছিল—সমস্ত শুধরাইয়া লইলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় সকলে সেবা পাইতে লাগিল। সাবিত্রী আসিয়া অম্বিকার ভার লইলেন। সাবিত্রী ঠিক পেটের মেয়ের মত বড়দিদির মলমূত্র পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে চিরকালই সেবাব্রতে অভ্যস্ত,-কাজেই তাঁহার একার্য্যে কোন ত্রুটী হইল না। অম্বিকা চিরদিন তাঁহাকে জ্বালাইয়া মারিয়াছে, একটী দিনের জন্য সুখী করেন নাই বলিয়া তাহার উপর যে কোন বিরক্তি ভাব—ঘুণাক্ষরেও সাবিত্রীর প্রাণে জাগিল না। নিঘৃণ্য হইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত দুইহাতে মলমূত্র পরিষ্কার করা—সময়ে পথ্য দেওয়া—প্রভৃতি প্রাণপাত যত্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কয়েকমাস রোগভোগ করিয়া ভোগের অবসানে অম্বিকা সংসার হইতে মহাযাত্রা করিলেন। সাবিত্রী বড়দিদির জন্য বুকফাটা কান্না কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত

করিলেন। পাঁচু কয়েকদিন খুব কাঁদিয়াছিল—তারপর পালনকর্ত্রী মাতা সাবিত্রী ও পিতৃসম খুল্লতাত অমরের ঐকান্তিক যত্নে সে শোক-জ্বালা বিস্মৃত হইল। খুড়া ও খুড়ীমাই যে তার সব, সে যে আজীবন তাঁহাদের নিকট প্রতিপালিত—জনক জননীর শোক তাহাকে তত অধীর করিতে পারিল না। তবে বুঝিল—জগতের সাররত্ন যা—তা চলিয়া গেল, ভুবন বিনিময়েও আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন হইল—কিন্তু সরযু আসন্ন-প্রসবা বলিয়া নিখিল সে শোকসভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এজন্য প্রাণের দুঃখ জানাইয়া মেজদাদা মেজবৌ ও প্রাণের ভ্রাতু-ষ্পুত্রকে পত্রের দ্বারা সান্ত্বনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

(৫)

মনের গুণে ধন, যার যেমন মন—তার তেমনি ধনলাভ হইয়া থাকে। নিখিল গ্রহচক্রে কিছুদিন বিপথগামী হইয়া বংশের মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদান করিলেও মন তাঁর চিরকালই পবিত্র এবং ধর্ম্মপথগামী ছিল। এখন কুগ্রহ ছাড়িয়াছে, নিখিল আবার মানুষের মত মানুষ হইয়াছেন; সহধর্ম্মিণী সরযূও পতিসোহাগিনী হইয়া দুঃখের অতলস্পর্শ হইতে সুখের কূলে উঠিয়াছেন। এই সুখের অনন্ত উৎস স্বরূপ স্বর্গীয় সুষমা সম্পন্ন একটী শিশু সন্তান প্রসব করিয়া আজ একমাস হইল—স্বামীর অসীম প্রেমের প্রতিদান দিয়াছেন। সুলক্ষণযুক্ত এই শিশু সন্তানটী সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে—ছেলেটী যেন মোমের পুতুল—বাপ মায়ের মনের গুণেই এমন সুন্দর পুত্রলাভ হইয়াছে।

গৌরীদেবী এখন ইহাদের অভিভাবিকা,—যে কোন কার্য্য হউক তিনি কন্যা মনোরমার সহিত আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। নিখিল যে এই বিপন্ন পরিবারের উদ্ধার কর্ত্তা, তিনিই যে দেবেনকে আনিয়া আবার তাঁহাদের সংসারে সুখের প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। এত কষ্টের পর দেবেন যে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাহার মূলে যে নিখিলের ঐকান্তিকতাই প্রধান সহায়; এইরূপ সাহায্যকারী বন্ধুর সুখে তাঁহারা যে অন্তরে বিশেষ সুখবোধ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গৌরীদেবী পাকা গৃহিণী, প্রসবাবস্থায় কিরূপ করিলে প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, গৌরীদেবী তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। প্রসূতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ ঔষধ ও কিরূপ পথ্য প্রদান করিলে—এ অবস্থায় প্রসূতিকে কোন প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইতে না হয়—গৌরীদেবী সেইমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। মনোরমা তাহার সাহায্যকারিণী হইয়া প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রাণপণ যত্নে সরযু অতি সামান্য দিনের মধ্যে সবল ও সুস্থকায় হইয়া উঠিলেন। শিশুটীও বেশ নিরোগ শরীরে দিন দিন শশীকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

নিখিল গৌরীদেবীর নিকট ত চিরদিনই কৃতজ্ঞ আছেন, সম্প্রতি আবার এই কার্য্যে ঠিক নিজের মত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য

করে এমন পাকা গৃহিনী কেহ এখানে নাই যদিও সাবিত্রী আছেন কিন্তু তিনি বহুদূরে, এ অবস্থায় গৌরীদেবী না থাকিলে এবং মনোরমা ভগ্নীর ন্যায় সংসারের বন্দোবস্ত না করিলে—তাঁহাকে মহাকষ্ট অনুভব করিতে হইত। অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে হইত কিন্তু কার্য্যে এমন ফল পাওয়া যাইত না; তাই নিখিল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন লোকের মা ভগ্নী থাকিলেও এ সময়ে এমন সেবা হয় না, আপনারা যাহা করিলেন—তাহার তুলনা নাই।

গৌরীদেবী বলিলেন—বাবা! তুমিও কম করিয়াছ কি? মানুষ জন্মে এ সকল করিতে হয়, পরস্পর এইরূপ সহানুভূতি নাই বলিয়াই ত আমাদের জাতিটা এমন বাঁধনহীন হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিল পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছে। স্বর্গীয় বামনদাস রায়ের বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া গৌরীদেবী শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভাল লোকের ভাল হউক—ইহা কাহার না ইচ্ছা! নিখিল মেজদা ও মেজো বউদিকে সংবাদ দিলেন—তাঁহারা শুনিয়া খুব সুখী হইলেন। সুপুত্র হইয়া বংশের শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি হওয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়! সাবিত্রীর আর পুত্রাদি হইবার আশা নাই—আর না হইলেই বা ক্ষতি কি? ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত থাকিলে ত বংশ রক্ষা হইবে—দেবর ও ভাসুর-পুত্রও কি পুত্র নয়, সৎপুত্র হইলে তাহাদের দ্বারাও উপকার হইবে—গর্ভে নাই বা হইল—এরূপ সরল চিন্তা আজ কাল কয়জন স্ত্রীলোকের প্রাণে জাগিয়া থাকে?

পুত্ররত্ন লাভ করিয়া নিখিল দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাকে মনের মত ধন দিয়াছেন—এই জন্য ভগবানের প্রিয় স্বদেশ-কার্য্যে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ প্রদান করিলেন। আজকাল যেমন কথায় আর বক্তৃতায় দেশ সেবা হয়, কার্য্যে কিছুই হয় না। পূর্ব্বে কথা ও বক্তৃতা ছিল না—কার্য্যে একাজের বিশিষ্টতা দেখান হইত। পুত্রের কল্যাণার্থ নিখিল দরিদ্র-গণকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দরিদ্ররূপী নারায়ণ—তাহাদের সুখী করিতে পারিলে—ভগবান সুখী হইবেন—তাঁহার পুত্রের দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া জীবন-পথ সুগম হইবে। নিখিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত হইয়াও এখন ধর্ম্মভাবে এইরূপ অনু-প্রাণিত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন—বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাকুক, তাহা ধর্ম্মের সহিত গাঁথা না হইলে পাকা ফল পাওয়া যায় না।

মেজোভাইয়ের ধর্ম্মময় উপদেশ লাভ করিয়া নিখিল স্বধর্ম্মে যারপর নাই মতিমান হইয়াছেন। ভক্তি ও বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম করিলে সংসারে কোন প্রকার অমঙ্গল আসিতে পারে না, আসিলেও তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই তাহার মনের প্রবল বিশ্বাস—এই বিশ্বাস-বলেই তিনি প্রত্যহ দেবসেবা—অতিথি সেবা করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

এখন "আর তিনি পরের দাসত্ব করেন না। কেহ এ বিষয়ে পরামর্শ জানিতে আসিলে তিনি বলেন—আমাদের দেশে অনেক স্বাধীন বৃত্তি রহিয়াছে—ভারতে বহু উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হইতে পারে—তবে আর পরের দাসত্ব কেন? তখন জীবনো-

পায় এত জটীল সমস্যায় পূর্ণ হয় নাই, কাজেই নিখিল যাহাকে যাহা ব'লিয়া দিতেন—তাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াই বেশ সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইত—এইজন্য গ্রামে নিখিলের খুব পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল।

প্রথমে দেবেনের প্রাণে বিদেশী ভাব জাগিয়া প্রাণটাকে কটুতিক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন নিখিলের সঙ্গে থাকিয়া তাহার হৃদয় বেশ প্রশস্ত হইয়াছে; সেও এগ্রামে পাঁচজনের একজন হইয়া উঠিয়াছে। রতনবাবু এই যুবকের উন্নতি দেখিয়া, তাহার পারিবারিক সাধন সুশৃঙ্খলা দেখিয়া, তাহার সহিত একটী আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা করিয়া নিখিলের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহার একমাত্র দুহিতা বিজলীকে এই প্রিয়দর্শন, উন্নতিশীল যুবকের করে অর্পণ করিবার বাসনা জানাইলেন।

নিখিলেন্দ্রের মনে মনেও এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল, এক্ষণে রতনবাবুকে সেই কথার অবতারণা করিতে দেখিয়া তিনি খুব আগ্রহের সহিত সম্মতি দান করিলেন। গোরাদেবার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি সাদরে তাহা সমর্থন করিলেন। রতনবাবু একমাত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই সংসারের সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া কাশীবাসী হইতে পারেন কিন্তু এতদিন উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় বিবাহ দিতে পারেন নাই। দেবেনের মত সৎপাত্র আর পাওয়া যাইবে না, বিজলী বড় হইয়াছে—হিন্দুর ঘরে এত বড় মেয়ে অবিবাহিত রাখা যায় না কিন্তু সৎপাত্র না পাইলেও যাকে তাকে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত নয়! মনুর ত

মতই আছে—কন্যা বরং অবিবাহিতা রাখিবে—তথাপি অপাত্রে দান করিবে না। এক্ষণে সৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং উভয় পক্ষের যখন মতও হইয়াছে,—তখন একদিন শুভদিন দেখিয়া রতনবাবু মহা সমারোহে কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন। একবৎসর কন্যা-জামাতাকে লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ তিনি তাঁহার চির অভিলষিত কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন, আর দেশে ফিরিলেন না।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল; বিশেষতঃ পানীয় জলের অভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইল। লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বসন্তপুরে সেবার ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ বসন্তপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহার জননী বহুদিন ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও মনোরমা জননীর মৃত্যুতে ভীষণ শোক পাইলেন।

নিখিল গ্রাম ছাড়িতে পারিলেন না। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বামী স্ত্রীতে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। নবজাত শিশুটী অকালে কালকবলিত হইল, তাহার পর তাঁহাদের যতগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল—একটীও জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন করেন নাই। প্রসূতি মৃতবৎসা দোষদুষ্ট হইল, সন্তান-সন্ততি জন্মের পরে এক একটী উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মারা যাইতে লাগিল। শোকে দুঃখে জনক জননীর অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল। এক পুত্র শোক-

শেল সহ্য করাই কত কষ্ট, আর ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয়টীর শোক ; নিখিল ও সরযু এ শেলেতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন।

চপলা চমকের ন্যায় কিছুদিন সুখভোগ করিয়া নিখিলের অদৃষ্ট গগন এমন কাল-মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল কেন? অল্প বয়সে নিখিলের চরিত্রহীনতাই—ইহার কারণ; ইহা জন্মদানের দোষ, গর্ভধারণের দোষ নহে। কিন্তু গত বিষয়ের শোচনা করিয়া আর কি হইবে—কোন উপায় ত নাই? এক একটী করিয়া ছয় পুত্রের মাথা খাইয়া নিখিল ও সরযু বিষম ভাবনাগ্রস্ত হইলেন, তার উপর জ্বরের যন্ত্রণা, কাছে কোন আত্মীয় নাই। কাজেই তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া গৌহাটীতে যাইবার মনস্থ করিলেন।

হুগলী জেলায় তখন ইংরাজ বাহাদুর নানা প্রকার উন্নতি বিধান করিবার জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকজন নিজ বাসস্থান নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। দেবেন্দ্রনাথও শ্বশুর প্রদত্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। নিখিল ও সরযু সমস্ত বিক্রয় করিয়া গৌহাটীতে "সাধন-মন্দিরের" অতিথি হইলেন। এখানকার অমর-ভবনের নাম লোপ হইল।

গৌহাটীর "সাধন-মন্দির" এখন প্রায় শূন্য পড়িয়া থাকে। মন্বন্তর ও প্লাবনের সময় যত লোক সমাগম হইয়াছিল, এখন আর তত হয় না, সকলেই স্ব স্ব স্থানে গিয়া আবার এক একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

অভাবেই লোকের স্বভাব নষ্ট হয়—যখন অভাব নাই, অন্নকষ্ট তিরোহিত হইয়া দেশ যখন আবার সুজলা হইয়াছে, সুফলা বাঙ্গালার ক্ষেত্র যখন আবার প্রতি বৎসর সমানভাবে ফল শস্য প্রদান করিতেছে—তখন আর লোকে পরের দ্বারস্থ হইবে কেন? তাই শ্যামানন্দের "সাধন-মন্দিরে" এখন অতিথি সংখ্যা খুব কম, তবে কামাখ্যা-যাত্রীর মধ্যে যাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রতি যত্নের ত্রুটী হয় না।

শ্যামানন্দ ও সাবিত্রী এখন দেবতার ধ্যান-ধারণায় ব্যস্ত, এখন আর তাঁহাদের বাহ্যিক কোন বিষয় মনঃসংযোগ করিবার তত সময় বা অভিরুচি নাই। পাঁচু এখন ইহার কর্ত্তা হইয়াছে; বঁড়বউ স্বর্গগতা হইবার পর শ্যামানন্দ ও সাবিত্রী বিবাহ করিবার জন্য পাঁচুকে জেদ করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হয় নাই, চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া এইরূপ দেশ-সেবায় কালাতিপাত করিবে বলিয়া সে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা আর কি করিবেন—সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত নয় বলিয়া আর বেশী পীড়াপীড়ি করেন নাই।

পূর্ব্বে সংবাদ প্রদান করিয়া নিখিল সরযূর সহিত তথায় আগমন করিলেন। শ্যামানন্দ খুব আনন্দের সহিত তাহাদিগকে তথায় রাখিলেন—এবং "সাধন-মন্দিরের" সমস্ত ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া এইবার যথার্থরূপে নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বামী স্ত্রীতে সমস্তদিন সাধন-মন্দিরে সাধন ভজন করিয়া আপনাদের জীবনের পথ মুক্ত করিতে লাগিলেন। আর নিখিল প্রাণের ভ্রাতুষ্পুত্র পাঁচুর সহিত

দাদার সুবিখ্যাত মন্দিরে অতিথি সৎকারে প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। এখন আর তত অতিথি নাই—তথাপি বিশ পঁচিশ জন অতিথি প্রত্যহ আহার করিতে আসে, নিখিল ও পাঁচু তাহাদের পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। সরযূ এখন নিজের পুত্র কন্যা হারাইয়া এই দরিদ্রদের জননী স্থানীয়া হইয়াছেন। আটচালায় স্থানের অভাব নাই; সময়ে সময়ে পথিক সকল এখানে আসিয়া রাত্রি যাপন করে। কোন অভাব হইলে জানাইবা মাত্র নিখিল তাহাদের অভাব মোচন করিয়া দেন—তাহারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করে।

তখন কামাক্ষ্যার পথে এই সাধন-মন্দিরে প্রায় সকলেই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিত। এই পথে এই আশ্রম একটী মহা আরামপ্রদ, শান্তিময় আশ্রম বলিয়া যত বড় সাধু সন্ন্যাসী এবং ধনী হউন না কেন—ইহার পবিত্র সুশীতল বক্ষে অন্ততঃ একদিন রাত্রি যাপন না করিয়া কেহ দেবী দর্শনে যাইতেন না। সময়ে সময়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসী শ্যামানন্দের ন্যায় জীবনমুক্ত মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য; তাঁহার সুললিত উপদেশাবলী শুনিবার জন্য সাগ্রহে এখানে উপস্থিত হইতেন; এবং কিছুদিন তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পানভোজনে আপ্যায়িত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতেন। শ্যামানন্দ এই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহাতে এই আশ্রমবাসী আত্মীয়গণের কোন অভাব না হয় এবং প্রতিদিন

অন্ততঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন আগত অভ্যাগত দরিদ্র লোক আসিলে পরিতৃপ্তির সহিত আহার ও বাসস্থান পাইতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

নিখিল খুব কার্য্যক্ষম এবং কৃষিকার্য্যে উৎসাহশীল, তিনি এখানে আসিয়া কিছুদিন পরে পাঁচুর সহিত কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিলেন। চাষবাসও খুব ভাল হইয়া আশ্রমের অভাব অভিযোগ মোচন করিতে লাগিল। তুলার চাষে সুতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র সমস্যা সমাধান করিতে লাগিলেন। তথাপি উচ্চ শিক্ষিত হইয়া পরের দাসত্বে মনোনিবেশ করিলেন না।

উপসংহার।

আমিত্ব না ঘুচিলে মুক্তি-পথের পথিক হওয়া যায় না। যখন আমিত্বের নাশ হইয়া ঈশ্বরত্বে চিত্ত স্থির হয়, তখন পার্থিব দ্রব্য, শরীর, মন, টাকা-কড়ি, ধনজন কাহারও প্রতি আর আসক্তি থাকে না। শ্যামানন্দস্বামীর এখন এইভাব—তাঁহার আমিত্ব ঘুচিয়াছে —তিনি বুঝিয়াছেন জগতে আমি বলিয়া কিছু নাই, সব তুমি— তোমাময় এই জগতে আমি তোমার তুমি আমার—ভেদাভেদ নাই। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী সাধকাগ্রগণ্য স্বামীর নিকট এই ভাবে শিক্ষিত হইয়া পরম জ্ঞানী হইয়াছেন। এখন রমণী সাবিত্রী আর শ্যামানন্দের রমণী নহেন, এখন সাধন-সঙ্গিনী জননী! শ্যামানন্দ চিরকালই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সংযমী সাধু;

সাবিত্রীর মত রমণী সংসর্গে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কখন হানী হয় নাই, এখন ত আসক্তিহীন, উভয়েই ব্রহ্মানন্দে বিভোর—পার্থিব সুখে আর তাঁহাদের চিত্তভ্রম জন্মাইতে পারে না।

বহুদিন হইতে তাঁহারা মনে করিয়াছেন—আর না, আর এ সংসারে থাকিয়া কোন ফল নাই—এইবার কেদার-বদরীর পথে অরুণাচলে শ্রীগুরুর আশ্রয়ে কিছুদিন বাস করিয়া জীবলীলা শেষ করিতে পারিলেই জন্ম সার্থক হয়। ইহার জন্য তাঁহারা অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল, পাঁচু ও সরযুর জন্য এতদিন যাইতে পারেন নাই। এখন নিখিল আসিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছেন, তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তিকে এ অঞ্চলের চা-করগণ কোন মতেই হটাইতে পারিবে না। রাজা রামেশ্বর বড়ুয়া আর ইহসংসারে নাই—তাঁহার পুত্র আর এখন "সাধন-মন্দিরের" প্রতি তত আস্থাবান না হইলেও নিখিল এই সামান্যদিনে যেরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন, তাহাতে আর তাঁহাকে কেহ ফাঁকী দিতে পারিবে না—তিনি সহজেই আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন বুঝিয়া—তাঁহারা দেশভ্রমণে যাইবার ভাণ করিয়া "সাধন-মন্দির" ত্যাগ করিলেন। দুই একবৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কথা কিন্তু সে অগস্ত্যযাত্রার পুনরাগমন হইল না। শুনা যায়—পাণ্ডবকুল-গৌরব যুধিষ্ঠিরের মত শ্যামানন্দ সশরীরেই দেবধামে পৌঁছিয়াছিলেন, আর সাবিত্রী পথেই স্বামীর পদে মাথা রাখিয়া সতীর ঈপ্সিত আরাধ্যধামে চলিয়া গিয়াছিলেন।* মন্দির হইতে সাক্ষাৎ দেবদেবী শ্যামানন্দ ও সাবিত্রীর অন্তর্ধ্যান হইয়াছে—

সাধন-পীঠ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—কাজেই সাধু ভক্ত আর বড় কেহ সেইদিকে আসিতেন না।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে নিখিল দাদা ও বৌদিকে সাক্ষাৎ দেবদেবী বলিয়াই জ্ঞান করিতেন—এইজন্য প্রাণপণে তাঁহাদের এই সাধন-পীঠের পূজা করিয়া—তাঁহাদের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ "সাধন-মন্দিরে" দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিয়া তাঁহারাও দাদা বউদির মত ধর্ম্মভাবে বিভোর হইতে লাগিলেন, জগতের নশ্বরত্ব অনুভব করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন।

পাঁচু এখন তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব—পুত্রের ন্যায় তাহাকে লালন পালন করিয়া মনুষ্য জন্মের সাধ মিটাইতে লাগিলেন।

বহুদিন তাঁহারা এই "সাধন-মন্দির" উজ্জ্বল করিয়া দাদার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় সাধকের বংশ প্রায়ই লোপ হয়—নিখিলের সন্তানাদি হইল না, আর পাঁচুও বিবাহ করিয়া সংসারী হইল না, কাজেই এ বংশের লোপ অবসম্ভাবী—কিন্তু এখনও গৌহাটীর অরণ্যে এই "সাধন-মন্দিরের" ভগ্নস্তূপ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

সম্পূর্ণ।